বিদেশী কথাসাহিত্যে

সপ্ত কিশোরী

॥ ভাষান্তরিত অনুরচন ॥

॥ কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় ॥

॥ বিশ্বভারতীর বাংলাসাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ও মহাজাতিসদনের প্রথম কর্মসচিব। ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রদর্শশালাব প্রাক্তন অধ্যক্ষ। "মানুষ রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক ॥
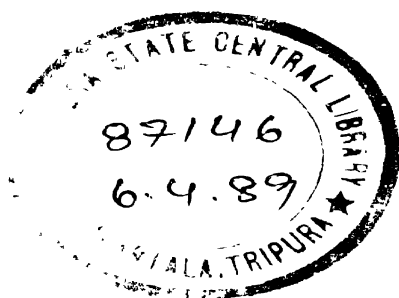
॥ জন প্রকাশনা ॥

॥ দুই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্ট্রীট। কোন্নগর ॥

॥ নিবেদন করলুম ॥

বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন-এর

চির-কিশোরী ছাত্রী,

মহান্ ভারতের

মহীয়সী মেয়ে

ইন্দিরার

অমৃতলোক-যাত্রী

প্রাণ-গঙ্গার প্রতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

॥ লেখকের লেখা ॥

॥ অন্যান্য বই ॥

। মানুষ রবীন্দ্রনাথ ।

। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা ।

। স্বামীজীর জীবনকথা ।

। যে নদী মরুপথে । উপন্যাস ।

॥ রচনা তালিকা ॥

॥ বিদেশী কথাসাহিত্যে
সপ্ত কিশোরী ॥

॥ আপেল গাছটি ॥

॥ জন গলস্‌ওয়ারদি-র লেখা ॥

[এই রচনাটি বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক জন গলস্‌ওয়ারদি র "ক্যারাভান" নামক গল্পগুচ্ছঃ প্রথম খণ্ড থেকে গৃহীত। ইংরেজী ভাষায় এর নাম "দি অ্যাপল ট্রী"। গলস্‌ওয়ারদি নাটক, উপন্যাস এবং ছোট গল্প—সব শ্রেণীর রচনা স্মষ্টিতেই খুব উচ্চস্তরের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর নাটক "জাসটিস", "স্ট্রাইফ", "দি স্কিনগেম" আর উপন্যাস "ফরসাইট সাগা" প্রভৃতি আজও বিশেষ-ভাবে আদৃত। সন্দেহ নেই, "দি অ্যাপেল ট্রী" বিশ্বের ছোট গল্প-সাহিত্যের দরবারে চির-আদরের ধন বলে সমাদৃত। সত্যিই এর তুলনা পাওয়া সহজ নয়।

কাহিনীটি মূলতঃ দুটি হৃদয়ের আপনাকে দেওয়া-নেওয়ার গল্প। একজন ছিলেন তরুণ ছাত্র, বিশেষভাবে পরিশীলিত মনের অধিকারী, আর-একজন দূর গ্রামের অশিক্ষিত কিসান পরিবারের আঙিনায় সদ্য-ফোটা প্যারিজাতের মত কিশোরী সত্তা। আমাদের ধারণা, এই ছোট গল্পের পরিকল্পনা স্মষ্টি হয়েছিল নায়ক চরিত্রকেই কাহিনীর প্রধান কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে। কিন্তু কথাকার স্মষ্টির কাজে ক্রমশঃ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, হয়ত তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর শক্তিশালী প্রতিভা এবং দরদিয়া মনের নিবিড় মাধুরীর অফুরন্ত বর্ষণে নায়িকাই হয়ে উঠেছেন কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ,—শুধু কাহিনীতে নয়, হয়ে উঠেছেন দুনিয়ার ছোট গল্পের নন্দনকাননে পরম রমণীয় একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পড়তে পড়তে আমাদের বিস্ময়-ভরা চোখে ভেসে ওঠে এক সরলা বালা—যার হৃদয় মহিমায় অফুরন্ত, ত্যাগে অনবদ্য, প্রেমে অতুলনীয়।

উচ্চশ্রেণীর ছোটগল্পের থিম সুস্পষ্ট এবং অর্থবহ হওয়া চাই। লেখক যদি কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব বা স্বপ্নালু কল্পনার লঘু আবেগের উচ্ছ্বাসের তাড়নায় সৃষ্টি কাজে হাত দেন, তাহলে নিবিড় দৃঢ়তার অভাবে থিমের প্রভাব পাঠক-পাঠিকার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিতে পারে না। "আপেল গাছটি" গল্পের থিমের মূলে আছে মানবজীবনের একটি চরম সমস্যা। এই সমস্যা হচ্ছে দুর্নিবার দ্বন্দ্বমূলক। প্রেম সাধনার একদিকে থাকে স্বপ্নের বন্যায় ভরা, নির্জলা রোমান্সের আকুলতা আর-একদিকে সংসারের সীমাবদ্ধ বাস্তবতার পরিমণ্ডলে যুক্তিপূর্ণ সুখানন্দ সম্ভোগের চরিতার্থতা। এই গল্পের নায়ক অ্যাসহারস্ট-এর বুকে একদিন হঠাৎ জেগেছিল এই দ্বন্দ্বের ব্যাকুল বন্যা। তার জীবনে সহসা উপস্থিত হয়েছিল গাঁয়ের সরলা কিসান-কুমারী মেগান তার বন্য মনের নির্মলা ভালবাসার আগ্নেয়গিরি নিয়ে। আর-একদিকে দেখা দিয়েছিল তার নিজের সমাজে প্রতিপালিতা, লণ্ডন-নিবাসিনী কিশোরী কন্যা স্টেলা —আপন মনের মাধুরীর অন্তঃসলিলা আকর্ষণ নিয়ে। সুদক্ষ কথাশিল্পী গলস্‌ওয়ারদি বড় করুণ এবং মর্মস্পর্শী রেখায় এই দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন।

আলোচ্য রচনার আর-একটি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পটি বহুপৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত চালচিত্রে আঁকা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এতবড় আকার যার, তাকে কি ছোটগল্প বলা যায়? উত্তরে জানাতে হয়, হাঁ। আকারে অতি-বিস্তৃত হলেও ছোটগল্পের মূল যে টেকনিক তার সীমা কোথাও লঙ্ঘন করা হয়নি। ছোটগল্প মাত্র একটি অথবা দুইটি চরিত্রের গল্প। গলস্‌ওয়ারদি একবারও সে নির্দেশ অমান্য করেন নি। কাহিনীর মূল দ্বন্দ্ব দুটি চরিত্র ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে,—কোথাও তা তিন চরিত্রের জটিল দ্বন্দ্বে পরিণত হয়নি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এরকম ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনা যেখানেই দেখা দিয়েছে, গলস্‌ওয়ারদি সুনিপুণ হাতে সে সম্ভাবনা এড়িয়ে গেছেন। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কা[illegible] অ্যাসহারস্ট ও মেগানের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, হৃদ[illegible]ওয়া-নেওয়া এব[illegible] প্রেমের গল্প। স্টেলার প্রেমকাহিনী [illegible] চরিত্রের প্রভাব হিসাবে কাজ করেছে, কোথাও মুখ্য হয়ে উঠ[illegible] পারে নি। ফলে "আপ[illegible]ছটি" টেকনিকের দিক-

থেকে আর বিশুদ্ধ ছোটগল্প থাকত না,—পরিণত হত বড় গল্প অথবা ছোট উপন্যাসে।]
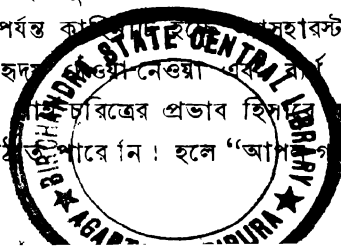
বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্তির দিনটিতে অ্যাসহারস্ট ও তার স্ত্রী বিশাল মাঠের সীমান্ত পথ দিয়ে মোটর গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদের ইচ্ছে ছিল, যেখানে ওদের দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল, সেই টারকী শহরে রাতটা কাটিয়ে মহা-উৎসাহে আজকের উৎসব শেষ করবে। পরিকল্পনাটা করেছিল স্টেলা অ্যাসহারস্ট, তার স্বভাবে ছিল বেশ একটু আবেগ-প্রবণতা। ছাব্বিশ বছর আগে তার চোখের যে নীল আভা, ফুলের মত লাবণ্য, প্রশান্ত মুখে পবিত্রতা আর ছিপ-ছিপে গড়ন, পাকা আপেলের মত গায়ের রং অ্যাসহারস্টকে চকিতে অপরূপভাবে মোহাচ্ছন্ন করেছিল—সেসব যদি আজ বহুদিন হল হারিয়ে গিয়ে থাকে, তবু এই তেতাল্লিশ বছর বয়সেও সে ছিল স্বামীর বিশ্বাসী কাছের মানুষ। ইতিমধ্যে তার গাল দুটিতে কিছু ছাপ পড়েছিল, কিন্তু নীল চোখে জেগে উঠেছিল পূর্ণতা।

যেখানে বিশাল মাঠ সোজা খাড়া হয়ে উঠে গেছে, আর বড় রাস্তা একদিকে এবং অপর দিকে উপত্যকার প্রথম উঁচু পাহাড়টির মাঝখানে সরু এক সারি লারচ ও বীচ গাছ মাঝে মাঝে দু-একটি পাইন গাছের সঙ্গে উপত্যকামুখী হয়ে এগিয়ে চলেছে, সেইখানে গাড়িটা থামিয়েছিল স্টেলাই। বসে লাঞ্চ খাওয়া যায়—এমন একটা জায়গার খোঁজ সে করছিল। স্বামীর ত কোন বিষয়ে উৎসাহ ছিল না। এপ্রিল মাসের সোনালী ফারজলতা আর লেবুর গন্ধে ভরা, সবুজ লারচের সারি; সামনে বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর উঁচু উঁচু পাহাড় শ্রেণীর দৃশ্য। স্টেলা জল রঙের স্কেচ আঁকত। এই রকম মনোরম, রোম্যানটিক স্থান ওর ভাল লাগত। তাই জায়গাটিকে উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছিল।

রঙের বাক্স নিয়ে ও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, বললে, ফ্র্যাঙ্ক, দেখত, জায়গাটা উপযুক্ত হবে কি না?

অ্যাসহারস্ট ছিল দেখতে দীঘল গড়নের, পা দুটি বড় বড়, ধূসর রঙের চোখে দূরের দৃষ্টি—কখন-কখন তা প্রাণবন্ত, সুন্দর হয়ে উঠত; নাকটি একটু একপেশে, ঠোঁটের ওপরে গোঁফ। তার বয়স হয়েছিল আটচল্লিশ বছর। সে খাবারের বাক্সটি হাতে তুলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল।

—ওমা, দেখো, দেখো, ওই যে ওখানে একটা কবর!

স্টেলা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।

যেখানে পাহাড়ী মাঠ থেকে একটা পায়ে চলার পথ নেমে এসে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে ছোট বনের মধ্যে এগিয়ে গেছল, সেই মোড়ের ধারে ছ ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া ঘাসে-ঢাকা, পাতলা মাটির ঢিবি দেখা যাচ্ছিল। এর পশ্চিম-দিকে ছিল একটি পাথরের ফলক। কে যেন এর ওপর গোটা কতক ব্লুবেল এবং ব্ল্যাকথর্ন ফুল ছড়িয়ে দিয়ে গেছল।'

অ্যাসহারস্ট চোখ চেয়ে দেখতে পেলে সেই দৃশ্য। তার মনের মধ্যেকার কবি চকিতে জেগে উঠল। সে ভাবলে, মোড়ের মাথায় কবর দেওয়া হয়েছে, এ ত নিশ্চয়ই কোন আত্মহত্যাকারীর কবর! হায়, দুর্বল মানুষের দল, আর তাদের যত কুসংস্কারের কাণ্ড! যাহোক, মাটির নীচে যে-ই শুয়ে থাকুক, সে কিন্তু কবরের মত কবর পেয়েছে! অপর-অপর বিশ্রী সমাধি স্তম্ভে যেমন নানা-কথা-খোদাই-করা স্মৃতিফলক বৃথা লাগানো থাকে, এতে তা নেই! আছে শুধু এক কোণে পোতা এক টুকরো সাধারণ খসখসে পাথর, উপরে দিগন্ত-জোড়া আকাশ আর পাশে পথ-চলা পথিকদের আশীর্বাদ।

পরিবারের লোকদের কাছে কোন তত্ত্ব আলোচনা করতে অ্যাসহারস্ট চাইত না। তাই সে কবরের সম্বন্ধে কিছুমাত্র মন্তব্য না করে পা চালিয়ে উঁচু জমির মাঠের মধ্যে উঠে এসে একটা দেওয়ালের নীচে খাবারের বাক্স রেখে দিলে; স্ত্রীর বসবার জন্য মাটির ওপর একটা কম্বল পাতলে। ভাবলে, ছবি আঁকতে-আঁকতে শেষে ক্ষিদে পেলে স্টেলা খেতে আসবেখন। তারপর মায়ের অনুবাদ-করা "হিপ্পোলাইটাস" বইখানা পকেট থেকে বার করে পড়তে লাগল। অনতিবিলম্বে 'সিপ্রিয়ান' গল্পটি পড়া শেষ হল। এমন সময় তার চোখ পড়ল আকাশের দিকে। ঘন নীল রঙের উপর রোদে-উজ্জল সাদা মেঘের দলকে ভেসে যেতে দেখে বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্তির দিনে অ্যাসহারস্টের মনে আকুলি-বিকুলি করে উঠল কি যেন এক অজানা চাওয়া! হায়, জীবনের সঙ্গে মানুষের সত্তার ঘটে কতই-না অসঙ্গতি! কোন লোকের জীবনধারা যুক্তির পথে উচ্চস্তরে বয়ে যেতে পারে। তবু সব সময়ে তার নীচের তলায় থাকে লোভ, লোলুপতা এবং ব্যর্থতা-বোধের ফল্গুধারা। মেয়েদের জীবনেও কি এমন ব্যাপার ঘটে? কে জানে? আবার যারা নতুনত্বের প্রয়াসী, যাদের হৃদয়ে থাকে নতুন জাতের উপভোগ, নতুন রকমের বিপদবরণ অথবা নতুন কীর্তি স্থাপনের উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তারাও শেষ পর্যন্ত অনাহারে মরে অথবা অতি-ভোগের অবসাদে দুঃখ পায়। এ থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই। সভ্য মানুষ হচ্ছে এক অসঙ্গতি-জর্জর জীব বিশেষ!

মানুষের মনোমত কোন নন্দনকানন—সেই চমৎকার গ্রীক নাটকের ভাষায় যা হচ্ছে 'স্বর্ণ, সংগীত ও আপেল গাছে ভরা'—তেমন কিছু পাওয়া মাটির দেশে নিতান্তই দুর্লভ। যে মানুষের মনে আছে সৌন্দর্যবোধ, তার জন্য নেই কোন সাধন লভ্য স্বর্গসুধা অথবা নিত্যদিনের সুখের আশ্রয়। কোন চিরন্তন মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য-ভরা শিল্প সামগ্রী—যা দেখলে বা পড়লে সব সময়েই মনে জাগে একই উল্লাস ও উত্তরণের অমূল্য অনুভূতি, তার সঙ্গে তুলনীয় কোন বস্তু বাস্তব জীবনে কিছুই নেই। অবশ্য, ওই জাতের সৌন্দর্য-অনুভূতি—ক্ষণস্থায়ী, অকৃত্রিম, নিবিড়-ঘন উল্লাসের মুহূর্ত কখন-কখন মানুষের জীবনেও আসে বটে, কিন্তু দুঃখ এই যে, একখণ্ড মেঘ আকাশে সূর্যের উপর দিয়ে যেভাবে চকিতে পার হয়ে যায়, ওই মুহূর্তগুলি তার চেয়ে বেশী সময়ের জন্য স্থায়ী হয় না। শিল্প যেমন সৌন্দর্য-অনুভূতিকে চিরস্থায়ী করে ধরে রাখতে পারে, জীবনের পক্ষে তেমনি তাকে চিরন্তন করে রাখা একেবারে অসম্ভব। প্রকৃতির বুকে যে অরূপ সত্তার আবছায়া অথবা জ্যোতির্ময় রূপের দেখা কখনো কখনো মেলে, এর মত জীবনে লাভ করা অনুভূতিও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। অ্যাসহারস্ট বসে বসে ভাবছিল। তার মুখের ওপর এসে পড়েছিল কড়া রোদ; অদূরে একটি থর্ন গাছের ডালে বসে একটা কোকিল ডাকছিল, বাতাসে ভেসে আসছিল ফুলের মধুগন্ধ। স্বপ্নভরা উপত্যকার পাহাড়গুলোর মাথার উপর দিয়ে দূর-আকাশে মেঘের দল নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হয়েছিল। এই মুহূর্তে এই পরিমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি এক অপরূপের অনুভূতি। দেখতে দেখতে এদৃশ্য হয়ত চকিতে মিলিয়ে যাবে। অ্যাসহারস্ট হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মন বললে, এই দৃশ্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোথায় যেন তার পরিচয় ঘটেছিল। এই বিশাল প্রান্তরের নিরালা কোণটি, এই রাঙা মাটির পথ আর পিছন দিকের ভাঙা পাঁচিল। চারিদিকে এতক্ষণ যা-কিছু ঘটছিল, তাদের প্রতি তার বিশেষ লক্ষ ছিল না। হয়ত সে ভাবছিল আনমনে স্মৃতি-থেকে-ভেসে আসা দূরের কথা, বা কিছুই ভাবে নি। কিন্তু এখন সে সচেতন হয়ে তাকিয়ে দেখলে! ছাব্বিশ বছর আগে ঠিক এমনি একদিনে আধ মাইল দূরের এক খামার বাড়ি থেকে সে টারকী শহরে একদিনের জন্য যাত্রা করেছিল, কিন্তু সে যাত্রার শেষে আর খামার-বাড়িতে ফিরে আসে নি। সহসা একটা কি-যেন যন্ত্রণায় তার বুক ভরে গেল। তার ফেলে-আসা জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললে। সেই মুহূর্তের রূপ ও উপচে-ওঠা পুলক

অনুভব সে স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখতে পারে নি,—তারা আজ অজানার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। ক্রমে একটি লুপ্ত স্মৃতির অন্ধকারে সে তলিয়ে গেল,—এক চরম সুখানুভূতি, যা সহসা বাধা পেয়ে একদিন শেষ হয়ে গেছল। অ্যাসহারস্ট হাতের ওপর ভর দিয়ে মুখখানি রেখে কবরের বুকে জন্মানো ঘাসগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

ওর মনে যে-সব কথা ভেসে আসছিল, তা হচ্ছে এই :

॥ এক ॥

ফ্রাঙ্ক অ্যাসহারস্ট আর তার বন্ধু রবার্ট গারটন একসঙ্গে কলেজে পড়ার শেষ বছর উত্তীর্ণ হলে ১লা মে তারিখে দুজনে পদযাত্রায় বার হয়েছিল। তারা সেদিনেতেই চ্যাংফোরড শহরে পৌছবার লক্ষ নিয়ে ব্রেনট থেকে পায়ে হাঁটা শুরু করেছিল। কিন্তু ফুটবল খেলোয়াড় অ্যাসহারস্ট-এর জখম-হওয়া হাঁটু মাঝপথে বাদ সাধলে। তারা ম্যাপ দেখে বুঝতে পারলে, এখনও সাত মাইল অতিক্রম করতে হবে, তবে গন্তব্যস্থলে পৌছানো যাবে। হাঁটুকে সাময়িকভাবে আরাম দেবার উদ্দেশে তারা রাস্তার পাশে এক বাঁধের ওপর বসে তরুণদের স্বভাব অনুযায়ী বিশ্বের বিচিত্র প্রসঙ্গ আলোচনা করছিল। সেই মোড় থেকে একটা পায়ে চলার পথ জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। দুই বন্ধুই ছিল লম্বায় ছ ফুট, গড়ন ছিল ছিপছিপে পাতলা। অ্যাসহারস্ট-এর গায়ের রঙ ময়লা, সে আদর্শবাদী, খুব আনমনা। আর গারটন খেয়ালী, চটপটে স্বভাবের মানুষ। দুজনেরই ছিল সাহিত্যে স্বাভাবিক ঝোঁক, কেউই মাথায় টুপি পরত না। অ্যাসহারস্ট-এর মাথার চুল ছিল মসৃণ, কালো, কোঁকড়ানো। গারটনের চুল-গুলি ছিল ঘন কালো, জটপাকানো। পদযাত্রার পথে তারা মাইলের পর মাইল কোন লোক দেখতে পায় নি।

আলোচনা প্রসঙ্গে গারটন বলছিল, দেখো বন্ধু, দরদবোধ হচ্ছে আত্ম-সচেতনতার ফল। গত পাঁচ হাজার বছরের একটা রোগ বিশেষ। মানুষের বুকে দরদ না থাকলে জগৎ ঢের বেশী সুখের স্থান হত।

অ্যাসহারস্ট মেঘ দেখতে দেখতে জবাব দিলে, যাই বল, এ যেন শুক্তির মধ্যে মুক্তো।

—বন্ধু হে, আধুনিক কালের আমাদের সব অশান্তির উৎস হচ্ছে এই দরদ-বোধ। পশুদের দিকে দেখ, রেড ইণ্ডিয়ানদের দিকে দেখ, মাঝে মাঝে যে

দুর্ভাগ্য জীবনে ঘটে, সেই দুর্ভাগ্যের বিষয়ে বোধ যাদের খুব কম; তারপর আমরা যারা অপরের দাঁতের যন্ত্রণা সম্বন্ধেও দরদী না হয়ে থাকতে পারি না, সেই তাদের দিকে লক্ষ কর। এস, যখন আমরা পরের জন্য দুঃখ বোধ করতুম না, সেই সময়ে ফিরে যাই। তাহলে আমাদের অবস্থা আরও ভাল হবে।

অ্যাসহারস্ট বললে, তুমি কখনও ওই অভ্যাসটি করো না।

গারটন বিষণ্ণ ভাবে নিজের চুলগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিলে।

—পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে গেলে মানুষকে খুঁত-খুঁতে হলে চলবে না। আবেগের দিক থেকে নিজেকে উপবাসী রাখা ভুল। সব রকম আবেগই উপকারী, তা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

—হাঁ, হাঁ, আর তা যখন নারীজাতির জন্য বীরত্ব প্রকাশের বিরুদ্ধে ছোটে।

—আঃ, এ যে খাঁটি ইংরেজের মতন কথা হল। আবেগ সম্বন্ধে কিছু বললেই ইংরেজরা সব সময়ই তা একটা দৈহিক ব্যাপার বলে মনে করে এবং মনে মনে আঘাত পায়। তারা প্রবল আবেগকে ভয় পায়, কিন্তু লালসাকে নয়—হাঁ, যতদিন অবশ্য তা গোপনে রাখতে পারে।

অ্যাসহারস্ট কোন উত্তর দিলে না। সে একটি ছোট নীল ফুল ছিঁড়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে লোফালুফি করতে লাগল। থর্ন গাছে একটা কোকিল ডাকতে শুরু করলে। আকাশ, ফুল—পাখির গান!

রবার্ট বললে, আচ্ছা একটা কাজ করা যাক। চল, এগিয়ে গিয়ে কোন একটা খামারের খোঁজ করি, যাতে আমরা রাতটা কাটাতে পারি।

এই কথা বলার সময়ে সে দেখতে পেলে, দূরে তাদের মাথার ওপরের সমতল ভূমি থেকে একটি তরুণী নেমে আসছে। তাকে মনে হচ্ছিল যেন আকাশের পটে আঁকা। হাতে একটা ঝোলানো ঝুড়ি, তার কনুই-এর ফাঁক দিয়ে যেন আকাশ দেখা যাচ্ছিল। এদিকে যে অ্যাসহারস্ট রূপ দেখে কখনো নিজের লাভের কথা ভাবে না,—সেই তারই মনে হল, মেয়েটা কি অপরূপ সুন্দরী! হাওয়ায় তার গাঢ় রঙের ঘাগরা পায়ে-পায়ে উড়ছিল। তার ছাই রঙের পুরাতন ব্লাউজ জরাজীর্ণ; পায়ের জুতো ছেঁড়া; ছোট হাত দুখানি খসখসে আর লাল; আর তার ঘাড়ের রং তামাটে। চওড়া কপালের ওপর কালো রঙের কোঁকড়ানো চুলগুলো উসকো-খুসকো। মুখখানি আকারে ছোট, ওপরের ঠোঁটটির মধ্যে দিয়ে দাঁতগুলি চকচক করছিল; নাকটি ছিল খাড়া। কিন্তু সব-চেয়ে তার ধূসর রঙের চোখদুটি ছিল অপরূপ—শিশির-ভেজা; ও দুটি যেন

সেদিনই প্রথম খোলা হয়েছিল। ও অ্যাসহারস্টের দিকে তাকিয়ে দেখলে। হয়ত অ্যাসহারস্টকে ওর মনে হল, টুপিহীন মাথায় ক্লান্তভাবে বসে-থাকা, অদ্ভুত এক তরুণ,—বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তার মাথার চুলগুলো ওলটানো। মাথায় টুপি ছিল না বলে অ্যাসহারস্ট টুপি খুলতে পারলে না। তবে হাত তুলে অভিবাদন করে বললে, রাত্রে আমরা থাকতে পারি এমন কোন খামার-বাড়ি কাছাকাছি আছে কিনা, বলতে পার? আমি খোঁড়া হয়ে পড়েছি।

মেয়েটি লজ্জা না পেয়ে চমৎকার মিষ্টি মৃদুগলায় কথা বললে, স্যার, এখানে ত একমাত্র আমাদেরই খামার আছে।

—কোথায় তোমাদের খামার?

—এর ঠিক নীচেই, স্যার।

—তোমরা কি আমাদের থাকতে দেবে?

—থাকবেন? তা আমার মনে হচ্ছে, জায়গা হয়ে যাবে।

—তুমি কি আমাদের পথ দেখিয়ে তোমাদের খামারে নিয়ে যাবে?

—হাঁ, স্যার, চলুন।

অ্যাসহারস্ট নিঃশব্দে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল। আর গারটন ওর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগল।

—তুমি কি ডিভনশায়ার-এর মেয়ে?

—না, স্যার।

—তাহলে কোথাকার?

—আমি ওয়েলস অঞ্চল থেকে এসেছি।

—আহা, আমি ভেবেছিলুম, তুমি বুঝি কেল্ট জাতীয়। তাহলে এই খামার তোমার নয়?

—আমার মাসীমার, স্যার।

—আর তোমার মেসোমশায়ের, কি বল?

—তিনি মারা গেছেন।

—তাহলে কে এখন খামারের কাজ চালান?

—আমার মাসীমা আর আমার তিনজন মাসতুতো ভাই।

—কিন্তু তোমার মেসোমশাই ডিভনশায়ার-এর লোক ছিলেন, নয় কি?

—হাঁ, স্যার।

—তুমি কি এখানে অনেকদিন রয়েছ ?

—সাত বছর আছি।

—ওয়েলস থেকে এসে এ জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে ?

—তা জানি না, স্যার।

—আমার ধারণা, ওয়েলস-এর কথা তোমার মনে নেই।

—হাঁ, খুব মনে আছে।

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি আবার বললে, কিন্তু সে ত অন্যরকমের জায়গা।

—ঠিক বলেছ, আমারও ওই বিশ্বাস।

অ্যাসহারস্ট হঠাৎ ওদের কথাবার্তার মধ্যে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বয়স কত ?

—সতের বছর, স্যার।

—তোমার নাম কি ?

—আমার নাম মেগান ডেভিড।

—ইনি হচ্ছেন রবার্ট গারটন আর আমার নাম ফ্রাঙ্ক অ্যাসহারস্ট, আমরা সোজা চ্যাংফোরড শহরে যেতে চাই।

—কিন্তু আপনার পায়ে যে লেগেছে! একথা জেনে আমার কষ্ট হচ্ছে।

অ্যাসহারস্ট একফালি হাসলে। হাসার সময় তার মুখখানি যেন খুব সুন্দর দেখতে হল।

নেমে আসতে আসতে ছোট বনের সীমা পার হতেই হঠাৎ ওরা খামারে এসে পৌঁছে গেল। খামারের মধ্যে ছিল একটি লম্বা, নীচু পাথরের-তৈরী, ছোট-ছোট জানালাওয়ালা বাড়ি; তার চারপাশে কতকগুলো শূয়োর, মুরগী, আর একটি বুড়ো ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছিল। পিছন দিকে ছোট এক খাড়া পাহাড়ের বুকে কতকগুলো সেগুন, শাল, মহুয়া গাছ শোভা পাচ্ছিল। আর সামনের দিকের আপেল ক্ষেতে সবেমাত্র গাছে গাছে জেগে উঠেছিল আপেল ফুল; ক্ষেতটি মস্ত বড—একপ্রান্তে ছোট এক টুকরো নদী বহে চলেছে; আর এক প্রান্তে লম্বা বনময় বিস্তৃত উপত্যকা। একজন ছোট্ট ছেলে একটা শূয়োর ছানা চরাচ্ছিল। বাড়িটির সামনে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল যে স্ত্রীলোকটি, সে আগন্তুকদের দেখে এগিয়ে এল। মেয়েটি পরিচয় করিয়ে দিলে, ইনি আমার মাসীমা, মিসেস নারাকোম।

মিসেস নারাকোমের কালো তীক্ষ্ণ চোখ ছিল পাতিহাঁসের মত, তাঁর ঘাড়টি ছিল সাপের মত বাঁকানো।

অ্যাসহারস্ট বললে, আপনার বোনঝির সঙ্গে পথে আমাদের দেখা হল। আমাদের কথা শুনে তার মনে হয়েছে, আপনি হয়ত আপনার খামারে আমাদের জায়গা দিতে পারেন—আজকের রাতটার মত।

মিসেস নারাকোম ওদের দুজনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলেন, তারপর জবাব দিলেন, হাঁ, পারি যদি মাত্র একখানা ঘর পেলে তোমাদের চলে। মেগান, ওই খালি ঘরটা পরিষ্কার করে ফেল ত। আর একবাটি ক্রীম তৈরী কর। —আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের নিশ্চয়ই চা চাই, কি বল?

দুটো 'ইউ' গাছের ছায়ার নীচে দিয়ে এবং ফুল-ফোটা 'কারেণ্ট' ঝোপের পাশে পাশে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটি বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—তোমরা কি সদর ঘরের ভেতরে এসে একটু বিশ্রাম করবে? মনে হচ্ছে, তোমরা কলেজের ছাত্র, তাই না?

—আমরা কয়েকদিন আগে ছাত্র ছিলুম, কিন্তু এখন আর নেই।

মিসেস নারাকোম বিজ্ঞজনের মত ঘাড নাড়লেন।

সদর ঘরটির মেঝে ইট দিয়ে তৈরী, তার মধ্যে ছিল একখানি খালি টেবিল, কয়েকখানা পালিশ-করা চেয়ার আর ঘোড়ার লাম-ভরা সোফা। ঘরখানি এত ভয়ংকরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, মনে হয়, কখনো ব্যবহার করা হয় নি। অ্যাসহারস্ট তার খোঁড়া হাঁটু দুহাতে ধরে তৎক্ষণাৎ সোফাব ওপর বসে পড়ল। মিসেস নারাকোম তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। সে ছিল রসায়ন শাস্ত্রের একজন রিটায়ার্ড অধ্যাপকের একমাত্র সন্তান। কিন্তু তার চালচলনে লোকে দেখতে পেত বেশ আভিজাত্যের পরিচয়। অথচ সে নিজে প্রায়ই নিজের এই গুণ সম্বন্ধে সজাগ থাকত না।

—মিসেস নারাকোম, আমরা স্নান করতে পারি এমন কোন নদী কি এখানে আছে?

—ফলের বাগানের নীচেতেই একটা ঝরনার মত জলের নালা আছে, কিন্তু জল এত কম যে, তোমরা বসে পড়েও সারা গা ভেজাতে পারবে না।

—কত গভীর?

—তা হয়ত প্রায় দেড় ফুট হবে।

—ওহো, ওতেই চমৎকার কাজ হবে। কোন্ দিকে ঝরনাটি?

—এই পথ দিয়ে নেবে যাও, দ্বিতীয় গেট পার হয়ে ডানদিকে, বুঝলে? তাহলেই দেখতে পাবে একটা বড় আপেল গাছের পাশ দিয়ে ঝরনাটা চলে গেছে। ওতে ছোট ছোট মাছ আছে; দেখ, যদি ওদের সুড়সুড়ি দিতে পার।

—ওরাই হয়ত আমাদের গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে পালাবে।

মিসেস নারাকোম একফালি হাসলেন, তারপর বললেন, তোমরা যখন ফিরে আসবে ততক্ষণে চা তৈরী হয়ে যাবে, মনে রেখো।

একটা পাহাড় থেকে নানা জলের ধারায় ঝরনাটি তৈরী হয়েছিল, তার তলটি ছিল বালুভরা। আর ফল-বাগিচার নীচে একেবারে শেষপ্রান্তে একটি বড় আপেল গাছ ঝরনার কিনারায় এত ঘেঁষে জন্মেছিল যে, তার ডালপালা ঝরনার বুকে ঝুঁকে পড়েছিল। এ সময়ে ডালগুলি সবুজ পাতায় ভরে গেছল, আর গোলাপী কুঁড়িগুলো ছিল প্রায় ফোটবার অপেক্ষায়। স্নানের জায়গাটি এতই সংকীর্ণ যে, এক একবারে একজন মাত্র বসে স্নান করতে পারে। তাই বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে অ্যাসহারস্ট তার হাঁটু রগড়াতে রগড়াতে অপেক্ষা করতে লাগল। সে তাকিয়ে দেখলে সামনের ঘন বন-ভরা উপত্যকাব দিকে। ছোট ছোট পাহাড় কাঁটাগাছ আর জংলা ফুলে পরিপূর্ণ। দূরে একখণ্ড উঁচু ভূমির ওপর মহুয়ার অরণ্য। বাতাসের স্পর্শে গাছে গাছে ডালপালাগুলি নড়ছিল। বসন্তকালের হরেকরকম পাখিরা গান করছিল আর বাঁকা রেখায় সূর্যকিরণ ঘাসগুলির উপর পড়ে চকচক করছিল। তার মনে পডছিল থিওক্রিটাস-এর কথা, এবং চারওয়েল নদী, আকাশে চাঁদ আর মাঠে ময়দানে ঘুরে-বেড়ানো দেবকুমারীদের জল-ভরা, ছলছল চোখের কথা। আরও কত কি যে তার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল! তবে কোন কথাটিই ঠিকঠিকভাবে চিন্তা করছিল না। তবু সে অনুভব করছিল পরিপূর্ণ সুখের শিহরণ।

॥ দুই ॥

দেরি হয়ে গেলেও চা-এব সঙ্গে প্রচুর আয়োজন ছিল—ডিম, ক্রীম, জ্যাম এবং তাজা, পাতলা, জাফরান-রাঙানো কেক। গারটন খেতে খেতে কেল্‌ট জাতের আলোচনা শুরু করল। সময়টা ছিল কেল্‌ট জাতের নবজাগরণের কাল। ও নিজেকে কেল্‌ট জাতের বংশধর বলে মনে করত। তার ওপর এই নারাকোম পরিবারের শিরায় কেল্‌ট রক্ত আছে শুনে ও উত্তেজনার সঙ্গে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। ঘোড়ার চুলের তৈরী গদিওলা একটি চেয়ারে আরাম করে

বসে সুন্দরভাবে বাঁকানো ঠোঁটের কোণে হাতে-তৈরী একটি সিগারেট লাগিয়ে মাঝে মাঝে তেরছা, ব্যঙ্গভরা চোখে অ্যাসহারস্টের দিকে তাকিয়ে ও ওয়েলস্-বাসীদের সুরুচির প্রশংসা করছিল। ওয়েলস্ দেশ থেকে ইংলণ্ডে চলে আসায় যে পরিবর্তন ঘটে, তা যেন চীন দেশ ত্যাগ করে চীনেমাটির বাসন ব্যবহার করে তুষ্ট থাকার মত। ফ্রাঙ্ক পাকা ইংরেজ, সে অবশ্য ওই ওয়েলস দেশের তরুণীটির আবেগময়তা ও চমৎকার সুরুচির কথা অনুভব করেনি। তবু গারটন মাথার ওপর ভিজে চুলের জটে সযত্নে চিরুনী বুলুতে বুলুতে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল, তরুণীটিকে দেখে মনে হয়, ও যেন ওয়েলস দেশের দ্বাদশ শতাব্দীর চারণ-কবি মরগ্যানের নায়িকার এক জীবন্ত ছবি।

অ্যাসহারস্ট ঘোড়ার চুলের তৈরী সোফার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পা ছড়িয়ে ঘন কালো রঙের একটা পাইপ টেনে আনমনে তামাক খাচ্ছিল। বন্ধুর কোন কথাই ওর কানে যাচ্ছিল না। তরুণীটি যখন কেক নিয়ে এসে পরিবেশন করছিল, তখনকার সেই মূর্তির কথা ও শুধু একমনে ভাবছিল। এ যেন ঠিক একটি ফুলের দিকে তাকিয়ে দেখা অথবা প্রাকৃতিক অন্য কোন সুন্দর বস্তুকে চোখ মেলে দেখা। মেয়েটি ওর তাকানোর কথা বুঝতে পেরে একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলে, তারপর নিজের চোখ নামিয়ে চুপিসাড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

গারটন বললে, চল, রান্নাঘরে যাওয়া যাক। ওকে আরো একটু বেশী করে দেখা যাবে।

রান্নাঘরটি ছিল চুনকাম-করা একখানি ঘর। এর মাথার ওপর ছাদের ঢালু বরগা। বরগায় ঝলসানো শূয়োর মাংসের তাল ঝোলানো; জানালার গবরাটে ফুলদানি; পেরেকে পেরেকে নানা ধরনের মগ, চায়না কাপ, ধাতুর তৈরী বিয়ার খাবার পাত্র আর রানী ভিক্টোরিয়ার ছবি। সাধারণ কাঠের তৈরী একটি লম্বা, সরু খাবার টেবিল, তার ওপরে রাখা হয়েছে প্লেট, ডিস, গামলা, গেলাস, চামচ প্রভৃতি। ভেড়া পাহারা দেবার দুটো কুকুর আর তিনটে বেড়াল এদিকে ওদিকে শুয়ে আছে। উনুনের একপাশে দুটো খুব ভাল ছোট ছেলে বসে রয়েছে। অন্য পাশে একজন গাট্টাগোট্টা, লালমুখো যুবক একটা বন্দুকের নল তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করছিল। এদের মাঝখানে মিসেস নারাকোম ঘুমচোখে একটা বড় কড়ায় 'স্টু' রান্না করছিলেন। ছোট ছেলেদুটির মতো আরো দুজন তরুণ—ট্যারা-চোখ, কালো রং, মুখে ধূর্ততার রেখা—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আর একজন বেঁটে, বয়স্ক, দাড়ি-কামানো লোক মোটা কাপড়ের

পোশাক পরে একখানা পুরাতন পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। সকলেই ছিল বসা অবস্থায়। একমাত্র চলাফেরা করে কাজ করছিল মেগান। উনুন থেকে ছাই তুলছিল ; প্লেট, জগ প্রভৃতি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছিল।

ওরা খেতে বসবার জন্য আয়োজন করছে দেখে গারটন বললে, আচ্ছা, এখন যাই। যদি তোমাদের অসুবিধে না হয়, তাহলে তোমাদের খাওয়া শেষ হলে আমরা ফের আসব।

তারপর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ওরা বাইরে এসে সদর ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু রান্নাঘরের রং, প্রাণময়তা, সুগন্ধ এবং মানুষদের মুখগুলি সব মিলে মনে যে একটা উজ্জ্বল ছাপ পড়েছিল, তার প্রভাব সদর ঘরের আলো-ঝলমলতাকে ম্রিয়মাণ করে দিলে। ওরা বিষণ্ণ মনে নিজের নিজের আসনে বসে পড়ল।

—ছেলেগুলো মনে হচ্ছে রীতিমত জিপসী জাতের। যে বন্দুক পরিষ্কার করছিল—ওই একজন মাত্র স্যাক্সন। মনে হচ্ছে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে মেয়েটা সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়।

বন্ধুর মন্তব্য শুনে অ্যাসহারস্ট ঠোঁট বাঁকালে। ঠিক সেই মুহূর্তে গারটনকে একটা গাধা বলে তার মনে হল। সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় ! হুঁঃ, ও একটা বুনো ফুল। একটা প্রাণী,—যা দেখতে ভাল লাগে। তা নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ! যতসব !

গারটন বলে চলল, আবেগময়তার দিক থেকে ও চমৎকার। ওকে জাগিয়ে দেওয়া দরকার।

—তুমি ওকে জাগিয়ে তুলবে নাকি ?

গারটন বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হাসলে। সেই বাঁকা হাসি যেন বললে, তোমার প্রশ্নটা কি স্থূল এবং ইংরেজ স্বভাব-সুলভ !

অ্যাসহারস্ট তার পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়লে। মেয়েটাকে জাগিয়ে তোলা ! এই মূর্খ নিজেকে মস্ত একজন ওস্তাদ ভেবে থাকে। সে জানালা খুলে ফেলে বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। খামারের বাড়িগুলো আর তাঁত ঘর আবছায়া ও নীলাভ দেখাচ্ছে। আপেল ক্ষেত যেন আচ্ছন্ন বনভূমি। বাতাসে রান্নাঘরের উনুন থেকে বার-হওয়া ধোঁয়ার গন্ধ। অপর পাখিদের পরে দেরিতে শুতে যাবার সময় একটি পাখি কিচিরমিচির শব্দ করছিল —যেন অন্ধকার দেখে অবাক হয়ে গেছে। আস্তাবলে ঘোড়াটাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, ওর নিঃশ্বাসের শব্দ আর পায়ের খটাখট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

সামনে আবছায়া-ভরা বিরাট মাঠ আর দূর-আকাশে গভীর নীলাভার মধ্যে উঁকি মারছিল যত লজ্জানত, আধ-ফোটা তারার দল। একটা পেঁচা কাঁপা গলায় ডাকছিল। অ্যাসহারস্টের বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পথ ভুলে বাইরে ঘুরে বেড়াবার মত কি সুন্দর রাত। পশুর নালহীন পায়ের শব্দ সামনের গলিপথে শোনা গেল, ক্রমে তিনটি আবছায়া কালো প্রাণী পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল—দল বেঁধে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরায় ব্যস্ত তিনটি টাট্টু ঘোড়া। খামারের গেটের মাথার ওপর দিয়ে তাদের কালো মাথাগুলো দেখা গেল। অ্যাসহারস্ট তার পাইপের গায়ে ঠোকা মারতে কয়েকটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ বার হয়ে এল। তা দেখে টাট্টুগুলো ভয় পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে 'চিপচিপ' শব্দ করে একটা বাদুড় আকাশে উড়ে গেল। অ্যাসহারস্ট বাইরে তার হাত বাড়িয়ে দিলে, করতলে শিশিরের স্পর্শ অনুভব করলে। হঠাৎ তার কানে এল ছোট-ছোট ছেলেদের ফিসফিস স্বর। পায়ের জুতো খুলে মেঝের ওপর ফেলাব দুমদুম শব্দ এবং আর একটি তাজা-নরম কণ্ঠস্বর—নিঃসন্দেহ, মেয়েটি ছোটদের বিছানায় শোয়াচ্ছিল। আরও শোনা গেল কয়েকটি পরিষ্কার শব্দ,—না, না, রিক, তুমি বেড়ালটাকে বিছানায় নিতে পারবে না। তারপর শোনা গেল ছোটদের দাপাদাপি, হাসি ও ঘড়ঘড় শব্দ ; একটি নরম হাতের চড, মৃদু মিষ্টি হাসি। তা শুনে অ্যাসহারস্ট অল্প শিউরে উঠল। বাতাসের ঝাপটার শব্দ, তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে যে বাতি থেকে টিমটিম করে আলো জ্বলছিল, তা নিভে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক চুপচাপ। অ্যাসহারস্ট নিজের ঘরের ভেতরে গিয়ে বসে পড়ল। তার হাঁটুতে যন্ত্রণা হচ্ছিল। ক্রমে মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সে বন্ধুকে বললে, তুমি রান্নাঘরে যাও, আমি শুতে চললুম।

॥ তিন ॥

সাধারণতঃ অ্যাসহারস্টের ঘুম আসত নিঃশব্দে, অনায়াসে এবং তাড়াতাড়ি। কিন্তু আজ তার বন্ধু যখন রান্নাঘর থেকে ফিরল, তখন তাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ জেগে ছিল। বন্ধু এই নীচু ছাদের ঘরে অপর খাটটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কান পেতে পেঁচার ডাক শুনতে লাগল। একমাত্র হাঁটুর যন্ত্রণা ছাড়া তার কাছে অস্বস্তিকর আর কিছুই ছিল না। এই তরুণ বয়সে রাতজাগা অবস্থায় তাকে কষ্ট দেবার মত জীবনের কোন দুঃখ বা দুশ্চিন্তা সে পুষে রাখেনি। সম্প্রতি ব্যারিস্টারি শুরু করার সনদ

পেয়েছিল, মনে পোষণ করত সাহিত্য সেবার উচ্চাশা; তার সামনে ছিল এক বিস্তৃত ভবিষ্যৎ; বাপ মা আগেই মারা গেছলেন; তার জন্য রেখে গেছলেন বার্ষিক চারশ পাউণ্ডের আয়। এ অবস্থায় সে কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কখন করছে—সে সব ভাবনায় কার কি এসে যাবে? মাথার গোড়াকার খোলা ছোট্ট জানালা দিয়ে রাতের যে সুগন্ধ নীচু ঘরখানির মধ্যে এসে হাজির হচ্ছিল, সে শুয়ে শুয়ে তা উপভোগ করছিল। কোন লোকের সঙ্গে তিনদিন পদব্রজে বেড়ালে তার ওপর বিরক্তি জন্মানো স্বাভাবিক। গারটনের প্রতি তেমনিভাবে বেশ বিরক্তি জাগা ছাড়া এই নিদ্রাহীন রাতে তার মনে সবকিছু ভাবনা এবং অনুভূতি মধুর ও উত্তেজনাময় ছিল। তবে অযৌক্তিক হলেও রান্নাঘরে যে যুবকটি বন্দুক পরিষ্কার করছিল, তার মুখখানা চোখের সামনে বারবার ভেসে আসছিল। যুবকটির আগ্রহভরা, দৃঢ় অথচ চমকে-ওঠা দৃষ্টি রান্নাঘরের দরজার কাছে জলের জগ-হাতে-ছুটে-যাওয়া মেয়েটির প্রতি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল। মেয়েটির সরল, কোমল মুখখানা যেমন দৃঢ়ভাবে তার স্মৃতিপটে আঁকা ছিল, তেমনি দৃঢ়ভাবে আঁকা ছিল এই ঘোর-রঙা, নীল-চোখ-ওয়ালা মুখখানাও।

ভাবতে ভাবতে পরদাহীন জানালার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ এক সময়ে সে দেখতে পেলে অন্ধকার-ভেদ-করা ভোরের প্রথম আলো। শুনতে পেলে কর্কশ সুরে কাকের প্রথম একটি ডাক। তারপর আগের মত আবার চারদিক চুপচাপ। ক্রমে আধজাগা একটা কোকিল সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে গান গেয়ে উঠল। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল-হওয়া আলোর ছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অ্যাসহারস্টের চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে গেল।

পরের দিন তাঁর হাঁটুর ব্যাথা খুব বেড়ে গেল। পদযাত্রার পরিকল্পনা স্বভাবতঃই বন্ধ হয়ে গেল। গারটন পরের দিন লণ্ডনে পৌছবার উদ্দেশে দুপুর বেলা একটা ব্যঙ্গ-ভরা হাসি হেসে যাত্রা করলে। সেই ব্যঙ্গ-ভরা হাসি বন্ধুর মনে খুব বিরক্তিকর বোধ হল। তারপর সারাদিন ধরে অ্যাসহারস্ট সরাসরি 'ইউ' গাছ দিয়ে ঘেরা, ঘাসে ভরা একখণ্ড জমির ওপর সবুজ রঙের কাঠের চেয়ার পেতে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। পরম আরামে চুরুটের পর চুরুট খেলে, বিচিত্র স্বপ্নে মশগুল হয়ে রইল। চারপাশের শোভা চোখ ভরে দেখে নিলে।

বসন্তকালে খামারবাড়ি হচ্ছে বিচিত্র বস্তুর জন্মকেন্দ্র। নানা কুঁড়ি ও খোল থেকে নবীনের দল বার হয়ে আসে; আর মানুষের দল কিছু উত্তেজনার সঙ্গে সেই জন্ম প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে; তাদের লালন-পালন করে। তরুণ অ্যাসহারস্ট বসে

দেখতে পেলে, একটা রাজহাঁস চমৎকারভাবে দুলতে দুলতে তার সঙ্গের দুটি ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এগিয়ে এল। আর তারা ছোট ছোট ঠোঁট দিয়ে ঘাসের ওপর ঠোকরাতে লাগল। মাঝে মাঝে কখন মিসেস নারাকোম, কখন-বা কিশোরী মেগান এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, সে কিছু চায় কিনা? প্রতিবার সে হেসে জবাব দিলে, না, কিছু চাই না, ধন্যবাদ, এ বেশ মনমাতানো জায়গা। চা-এর সময় হলে তারা দুজনে একসঙ্গে কালোরঙের খানিকটা জিনিস একটা বড বাটি করে নিয়ে এল এবং গম্ভীরভাবে ফোলা হাঁটু পরীক্ষা করার পরে তার ওপর পুলটিস বেঁধে দিলে। তারা চলে গেলে সে কিশোরীর করুণ দৃষ্টি, বারবার চাপা স্বরে ওঃ, ওঃ, বলা আর বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কপালে দুর্ভাবনার রেখা ওঠার কথা ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল কিশোরীটির সম্বন্ধে বন্ধুর যত বাজে মন্তব্য, আর লণ্ডনে ফিরে যাবার সময়ে তার নিজের উদ্দেশে বিরক্তি-কর ব্যঙ্গ-হাসি হাসা।

কিছু পরে মেয়েটি চা নিয়ে এলে সে জিজ্ঞাসা করলে, মেগান, আমার বন্ধুকে তোমার কেমন লাগল?

মেয়েটি তার ওপরের ঠোঁট চেপে উত্তর দিলে,—যেন এক্ষেত্রে হেসে-ফেলা ভদ্রতা হবে না। বললে, উনি বেশ আমুদে ভদ্রলোক। আমাদের খুব হাসা-চ্ছিলেন। আমার ধারণা, উনি খুব চালাক।

—তোমাকে হাসাবার জন্য উনি কিসব কথা বলছিলেন?

—উনি বলছিলেন, আমি চারণ কবিদের মেয়ে। আচ্ছা, কারা চারণ কবি?

—শতশত বছর আগে ওয়েলস দেশে ওই কবিরা বাস করতেন।

—আচ্ছা, আমি কি করে তাদের মেয়ে হলুম? অনুগ্রহ করে বলুন না।

—ও তোমাকে যা বলেছে তার মানে হচ্ছে, ঠিক তোমার মত মেয়ের কাহিনী নিয়ে তাঁরা গান করে বেড়াতেন।

মেয়েটির কপালে রেখা ফুটে উঠল, সে বললে, আমার মনে হয়, উনি তামাশা করতে ভালবাসেন।

—যদি আমি তোমাকে ঠিক কথা বলি, তুমি কি বিশ্বাস করবে?

—হাঁ, নিশ্চয়।

—দেখ, আমার ধারণা, তিনি তোমার সম্বন্ধে ঠিক কথাই বলেছেন।

মেয়েটির মুখে একফালি হাসি ফুটে উঠল।

অ্যাসহার্স্ট তা দেখে ভাবলে, বাঃ, কি চমৎকার মেয়ে!

মেগান একটু চুপ করে থেকে বললে, উনি আরও বলেছেন যে, জোকে দেখতে স্যাকসনদের মত। আচ্ছা, এর মানে কি ?

অ্যাসহারস্ট জিজ্ঞাসা করলে, জো কার নাম ? যে ছেলেটির নীল চোখ আর লাল মুখ ?

—হাঁ, আমার কাকার ভাগনে।

—তা হলে তোমার খুড়তুতো ভাই নয়।

—না।

—আমার বন্ধু তোমাকে যা বলেছেন, তার মানে হচ্ছে, জোকে দেখতে সেই সব মানুষদের মত যারা চোদ্দশ বছর আগে ইংল্যাণ্ডে এসে হাজির হয়েছিল এবং দেশটাকে জয় করেছিল।

—ওহো, আমি তাদের কথাও জানি। জো তাহলে কি তাদেব একজন ?

—গারটন এইসব প্রশ্ন নিয়ে প্রায় পাগল। তবে আমি বলতে বাধ্য, জো প্রাচীন স্যাকসনদের মত কতকটা দেখতে।

—হাঁ।

মেগানের হাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসহারস্টেব সারা অঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল। ওর হাঁ শব্দটা ছোট্ট অথচ মিষ্টি, কি দৃঢ় প্রত্যয় সূচক, অথচ যা ভালভাবে জানে না, সে বিষয়ে কত না ভদ্রভাবে স্বীকৃতি জানানো।

—উনি আরো বলেছিলেন যে, অন্যান্য ছেলেগুলো সকলেই একেবারে জিপসী। একথা ওর বলা উচিত হয় নি। আমার মাসীমা শুনে হেসে ফেলেছিলেন, তবে কথাটা তাঁর পছন্দ হয় নি। আমার মাসতুতো ভায়েরাও রাগ করেছে। আমার মেসো ত একজন কিসান ছিলেন। কিসানরা জিপসী হবে কেন ? লোকের মনে এভাবে কষ্ট দেওয়া অন্যায়।

অ্যাসহারস্টের ইচ্ছে হল, মেগানের হাতখানি টেনে নিয়ে একটা চিমটি কাটে। কিন্তু সে নিজের দরকারে শুধু বললে, ঠিক বলেছ, মেগান। আচ্ছা, কাল রাতের বেলা তুমি ছোটদের বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলে, না ? আমি শুনতে পেয়েছিলুম।

তার মুখখানা একটু রাঙা হয়ে উঠল। সে বললে, দেখুন, চা-টা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খেতে আরম্ভ করুন। নতুন করে চা তৈরী করে আনব কি ?

—তোমার নিজের জন্য কিছু করবার কখনো সময় পাও কি ?

—হাঁ, নিশ্চয়ই পাই।

—আমি ত নজর রেখেছি। কিন্তু কই, একবারও তা করতে তোমায় দেখলুম না।

সে হতবুদ্ধির মত ভ্রূকুটি করে তাকালে; কপালে রেখা ফুটে উঠল। গায়ের রং লজ্জায় ঘন দেখাল।

মেগান চলে গেলে অ্যাসহারস্ট ভাবতে লাগল, ও কি মনে করলে, আমি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলুম? ছিঃ-ছিঃ, তা আমি করিনি।

যে বয়সের গুণে কোন কোন লোক 'সুন্দরী মাত্রই একটি ফুল' কবির এই কথা সত্য বলে মনে করে এবং মেয়েদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অনুপ্রেরণা পায়, অ্যাসহারস্ট সেই বয়সে পৌঁছেছিল। চারপাশের দিকে কখনই ও বিশেষ দৃষ্টি দিত না। তবু মাত্র কিছুক্ষণ আগে ওর চোখে পড়েছিল একটি দৃশ্য। গারটন যে যুবকটিকে স্যাকসন জাতীয় বলে ঘোষণা করেছিল, সে আস্তাবলের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তার নীল কামিজ, কাদামাখা পায়ে বাঁধা পটি আর পুরোতন, বাদামী মখমলের কোমর-বন্ধ মিলে বেশ সুন্দর রঙের সমাবেশ ঘটিয়েছিল। তার মুখে হাসি ছিল না। সে দৃঢ়ভাবে অটল, অবিচলিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে অ্যাসহারস্টকে চেয়ে থাকতে দেখে সে গ্রাম্য তরুণের ভঙ্গীতে উঠোন পার হয়ে বাড়ির শেষ প্রান্তে রান্নাঘরের দরজার দিকে চলে গেল। অ্যাসহারস্টের মন বেশ দমে গেল। হায়-হায়, সকল মানুষের প্রতি শুভবুদ্ধি পোষণ করলেও সংসারে তাদের সঙ্গে বনিয়ে চলা কি দুরূহ ব্যাপার! তবু, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখ ত! ওর জুতো ছিঁড়ে গেছে, হাতগুলো খসখসে। কিন্তু তাতে কি?—গারটনের কথায় বলতে হয়, ওর কেলটিক রক্তের প্রভাবে কি ও হয়ে উঠেছে একজন জন্মগত ভদ্রঘরের মেয়ে, সত্যিকার একটি রত্ন যেন! অথচ, হয়ত ও জীবনে অক্ষর পরিচয় ছাড়া বিশেষ লেখা পড়া কিছু করতে পারে নি।

অ্যাসহারস্ট পরিষ্কারভাবে দাড়ি-কামানো, যে বয়স্ক লোকটিকে গত রাত্তিরে রান্নাঘরে দেখেছিল, আজ সে দুধ দুইবার উদ্দেশে গরুগুলোকে তাড়াতে তাড়াতে একটা কুকুর নিয়ে উঠোনে এসে হাজির হল। তার চোখে পড়ল, লোকটি খোঁড়া।

—তোমার গরুর দলে কতকগুলো বেশ ভাল গরু আছে, নিশ্চয়ই।

খোঁড়া লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বহুদিন যন্ত্রণায় ভুগলে যেমন চোখের দৃষ্টি ওপরমুখো হয়ে যায়, ওর চোখদুটি তেমনি ছিল। ও বললে, হাঁ, ওদের মধ্যে কতকগুলো দেখতে বেশ সুন্দর। খুব দুধও দেয়।

—নিশ্চয়ই। আমার তাই ধারণা।

—মাশয়, আশা করি, আপনার পা একটু ভাল আছে।

—ধন্যবাদ, অল্প অল্প করে ভাল হচ্ছে।

খোঁড়া লোকটি নিজের পায়ে হাত দিয়ে বললে, নিজে ত জানি, একি ব্যাপার! হাঁটুর যন্ত্রণা কি ভয়ংকর! আজ দশ বছর হল, আমার পা গেছে।

অ্যাসহারস্ট মুখে সহানুভূতি-ভরা শব্দ করলে। যাদের নিজস্ব স্বাধীন আয় আছে, এমন শব্দ স্বভাবতঃ তাদের কাছ থেকেই আসে।

খোঁড়া লোকটি একফালি হেসে পুনরায় কথা বললে, নালিশ অবশ্য করব না। হয়ত এককালে ভালও হয়ে যেতে পারি।

—হাঁ, বল কি?

—হাঁ, মাশয়, আমার পায়ে আগে যা হয়েছিল, তার চেয়ে এখন ত অনেক ভাল।

—ওরা আমার পায়ে চমৎকার কি জিনিস দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।

—হাঁ, ওই মেয়েটি খুঁজে পেতে ওষুধটা এনে দিয়েছে। ফুলদের সম্বন্ধে ও খুব ওয়াকিবহাল। এমন সব লোক আছে, যারা কি গাছালি থেকে কি রোগের ওষুধ পাওয়া যায়, তা জানে। আমার মা ওসব এমন জানত যে, তার সমতুল্য লোক পাওয়া মুস্কিল ছিল। মাশয়, আশা করি আপনি তাড়াতাড় ভাল হয়ে উঠবেন। এখন কাজে যাই।

অ্যাসহারস্ট হেসে ফেললে। মনে মনে বললে, মেয়েটা ত নিজেই একটা ফুল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সে ঠাণ্ডা হাঁসের মাংস, ননী-দেওয়া পায়স এবং আপেলের রস দিয়ে রাতের খাবার যখন শেষ করলে, তখন মেয়েটি সামনে এসে উপস্থিত হল। বললে, দেখুন, মাসী বললে, আপনি কি আমাদের তৈরী যে দিনের কেক খাবেন?

—খেতে পারি, যদি তা নেবার জন্য রান্নাঘরে যেতে দাও।

—হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই। তবে আপনার বন্ধু আজ সঙ্গে থাকবেন না।

—তা হোক। তুমি ঠিক জান, আমি রান্নাঘরে গেলে কেউ কিছু মনে করবে না?

—কে আবার কি মনে করবে? বরং, আমরা খুব খুশী হব।

অ্যাসহারস্ট হাঁটুতে বেদনা সত্ত্বেও চকিতে খুব তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, একটু

টলমল করে ঠিকভাবে পায়ের উপর দাঁড়াল। মেয়েটি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললে, তারপর দুখানি হাত বাড়িয়ে দিলে। অ্যাসহারস্ট সেই ছোট্ট খসখসে বাদামী হাত দুখানি ধরলে; তা একবার তুলে ধরে নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করার ইচ্ছা নিমেষে দমন করে ফেললে; তারপর এগিয়ে চলল। মেয়েটি তার পাশে আরো কাছাকাছি ঘেঁসে এল এবং নিজের কাঁধ এগিলে দিলে। অ্যাসহারস্ট সেই কাঁধের ওপর ভর করে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। তার বোধ হল, এতদিন সে যতকিছু স্পর্শ করেছে, তাদের মধ্যে এই কাঁধটির স্পর্শই সবচেয়ে সুখকর। কিন্তু তার উপস্থিত বুদ্ধি বেশ সজাগ ছিল, এগিয়ে যেতে যেতে সে র‍্যাক থেকে তার লাঠি গাছটা তুলে নিতে ভোলে নি। তাছাড়া, রান্নাঘরে পৌছবার আগে মেগানের কাঁধ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল।

সেদিন রাতে অ্যাসহারস্ট অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল—যখন জেগে উঠল, দেখলে, তার পা যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সারা সকালবেলা পুনরায় একটুকরো ঘাস-ভরা জমির ওপর চেয়ার পেতে বসে কবিতা লিখে কাটিয়ে দিলে। কিন্তু বিকেলে নিক আর রিক নামের সেই দুটো ছোট ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বার হল। সেদিনটা ছিল শনিবার, তাই ওরা আগে আগে স্কুল থেকে বাড়ি এসেছিল। চঞ্চল, লাজুক, ময়লা রঙের সাত এবং ছ-বছর বয়সের ছেলে দুটি কিছু পরেই কথা শুরু করলে। কারণ, অ্যাসহারস্ট ছোট ছেলেদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারত। ওরা জন্তু-জানোয়ার মারার যতকিছু কৌশল জানত, সব চারটে বাজার মধ্যেই তাকে দেখিয়ে দিলে। পাজামা এঁটে নদীর স্রোতের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে রইল, যেন এই খেলাতেও তারা খুব দক্ষ। অবশ্য, মাছ ধরতে পারল না। কেন না, তাদের চাপা হাসি আর চিৎকারে ভয় পেয়ে সবকিছুই ছুটে পালাল। অ্যাসহারস্ট একটি পাহাড়ের বুকে বড় গাছের ডালপালার নীচে বসে ওদের দেখছিল, আর কোকিলের ডাক শুনছিল। হঠাৎ, বড় ছেলেটি যার নাম নিক এবং যে কম অধ্যবসায়ী,—সে ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, ওই পাথরটার ওপর 'জিপসী ভূত' আছে।

—কি রকম জিপসী ভূত?

—তা জানি না, কখনো তাকে দেখতে পাইনি। মেগান বলে, ভূতটা ওখানে থাকে। বুড়ো জিম একবার দেখতে পেয়েছিল। ভূতটা তখন বেহালা বাজাচ্ছিল।

—কি সুর বাজাচ্ছিল রে?

—তা জানি না।

—হাঁরে খোকা, কি রকম দেখতে ভূতকে ?

—সে কালো। বুড়ো জিম বলে, তার সারা গায়ে লোম। সে একেবারে সত্যিকারের ভূত। কেবল রাত্তিরে আসে।

ছোট ছেলেটা বাঁকা দৃষ্টিতে চোখের কালো তারা ঘুরিয়ে বললে, তুমি কি মনে কর, সে আমাকে ধরতে চায় ? মেগান তাকে বড্ড ভয় করে।

—মেগান কি তাকে দেখেছে ?

—না, কিন্তু সে তোমাকেও ভয় করে না।

—আমার ত তাই মনে হয়। তবে সে আমাকে ভয় করবে কেন রে ?

—সে তোমার জন্যে রোজ প্রার্থনা করে।

—আরে দুষ্টু, তুমি একথা কেমন করে জানলে ?

—আমি যখন ঘুমুচ্ছিলুম সে বলছিল, ভগবান তুমি আমাদের সকলের ভাল কর, মিঃ অ্যাস-এরও ভাল কর। আমি তাকে একথা চুপিচুপি বলতে শুনেছি।

—তুমি দেখছি একটি ছোট্ট শয়তান ! যে কথা তোমার শোনার নয়, তাও তুমি শুনেছ, বলছ !

ছোট ছেলেটি চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, আমি ইঁদুরের ছাল ছাড়াতে পারি। মেগান ছাল ছাড়ানো দেখা সহ্য করতে পারে না। আমি রক্ত ভালবাসি।

—ওঃ, তুমি রক্ত ভালবাস ? তুমি একটি ছোট্ট খোক্কস দেখছি !

—খোক্কস কাকে বলে ?

—খোক্কস একটা জানোয়ার যে সবাইকে মারতে ভালবাসে।

ছোট ছেলেটি ভ্রূকুটি করে বললে, সেগুলো ত মরা ইঁদুর। আমরা তা খাই ত।

—বহুত আচ্ছা, নিক। আমি মাপ চাইছি।

—আমি ব্যাঙদেরও ছাল ছাড়াতে পারি।

অ্যাসহারস্ট ইতিমধ্যে আনমনা হয়ে ভাবছিল, "ভগবান আমাদের সকলের ভাল কর—মিঃ অ্যাস-এরও ভাল কর।"

তার অন্যমনস্কতা ভাঙতে না পেরে নিক ছুটে নদীতে নেমে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তখনি হাসি আর চিৎকার শুরু হয়ে গেল।

যখন মেগান তার জন্য চা নিয়ে এল, অ্যাসহারস্ট জিজ্ঞাসা করলে, মেগান, জিপসী ভূত কি বস্তু ?

সে চমকে উঠে ওপরের দিকে চাইলে, তারপর বললে, ও যত খারাপ জিনিস নিয়ে আসে।

—তুমি নিশ্চয়ই ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করো না ?

—আমার ধারণা, ভূত কখনো দেখা যায় না।

—নিশ্চয়ই দেখা যায় না। পৃথিবীতে ভূত বলে কিছু নেই। বুড়ো জিম যা দেখতে পেয়েছিল, তা হচ্ছে একটা ছোট্ট ঘোড়া।

—না, না, পাহাড়গুলোতে ভূত আছে। অনেকদিন আগে ওই মানুষগুলো ওখানে বসবাস করত।

—যাই হোক না কেন, তারা কিন্তু জিপসী নয়। জিপসীরা আসার অনেক আগে ওই বুড়ো লোকগুলো মরে গেছল।

মেগান শুধু বললে, ওরা সকলেই খারাপ লোক।

—তা কেন ? যদি সত্যিই ওখানে কিছু বসবাস করে, তা হচ্ছে ইঁদুরের দলের মত বনের প্রাণী। ফুলেরা ত বনে ফোটে, সেজন্য তারা খারাপ নয়। বড় বড় কাঁটা-গাছগুলো ত কেউ পোঁতে না, তারা বনে আপনি জন্মায়। তাদের ত তুমি খারাপ বল না। বেশ, আমি রাত্তিরে ওখানে গিয়ে তোমার ভূতের খোঁজ করব। ওর সঙ্গে কথা বলব।

—না, না, তা করবেন না।

—নিশ্চয়ই করব। আমি ভূতের পাহাড়ে গিয়ে বসে থাকব।

মেগান নিজের হাতদুটি একসঙ্গে মুঠি করে আটকে বললে, ওঃ, দয়া করুন। আপনি যাবেন না।

—কেন ? আমার যদি-বা কিছু ঘটে যায়, তাতে তোমার কি এসে যাবে ?

মেগান কোন উত্তর দিলে না।

অ্যাসহারস্ট আদর করার স্বরে বললে, দেখো, আমি জোরের সঙ্গে বলছি, আমি তোমার ভূতের দেখা পাব না। কারণ, আমি হয়ত খুব শিগগির এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

—শিগগির ?

—তোমার মাসীমা আমাকে আর এখানে রাখতে চাইবেন না।

—হাঁ, তা ঠিক। আমরা সবসময়ে গরমকালে ঘর ভাড়া দিই।

—তুমি কি চাও, আমি থেকে যাই ?

—হাঁ।

—আমি আজ রাত্তিরে তোমার জন্য প্রার্থনা জানাব, মেগান।

মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, ওর ভ্রূ একটু কোঁচকাল। শেষে ও ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অ্যাসহারস্ট চা খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ওখানে বসে বসে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল। ও যেন নীলমণি-লতার একটা ঝাড় ওর মোটা বুট জুতো দিয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে দিয়েছে। ও রকম বাজে কথা ওর মুখ দিয়ে বার হল কেন? ও কি রবার্ট গারটনের মত শহুরে কলেজে-পড়া একটা গাধা, তাই মেয়েটির মন আদৌ বুঝতে পারে নি।

॥ চার ॥

পরের সপ্তাহ অ্যাসহারস্টের কাটল পায়ের শুশ্রূষা করে আর কাছাকাছি যত গ্রামাঞ্চল ঘুরে বেড়িয়ে। এ বছরে ওর চোখে যেন এক নতুন মূর্তিতে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটল। নীল আকাশের নীচে শেষ ফলনের কয়েকটা বীচ গাছের ডালে ডালে লালাভ সাদা ফুলের কুঁড়ি সূর্যকিরণে জ্বলজ্বল করতে লাগল। কয়েকটা স্কচ জাতীয় দেবদারু গাছের মোটামোটা গুঁড়ি আর ডালগুলি কড়া রোদে তামাটে হয়ে গেল। একটা কি যেন উত্তেজনায় মাতোয়ারা হয়ে ও এসব দৃশ্যের পরিবর্তন লক্ষ করত। কখন-বা নদীর তীরে শুয়ে শুয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত গন্ধহীন বেগুনী রঙের থলো থলো ফুলের দিকে অথবা পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাতাওলা, মরা ফার্ন-এর ঝাড়ের পানে। তখন গাছে গাছে কোকিল ডাকত, কাঠঠোকরা শব্দ করত অথবা সুদূর আকাশের কোণ থেকে ঝরত কোন ভরতপাখির সুরের ঝংকার। এতদিন যতগুলো বসন্ত ঋতু ও দেখেছিল, এ বসন্ত-ঋতু ছিল তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের। কারণ, এবারের ঋতুর আবির্ভাব ঘটেছিল ওর মনের গোপন তলে—বাইরের প্রকৃতির কোলে নয়।

দিনেরবেলা পরিবারের লোকেদের সঙ্গে অ্যাসহারস্ট খুব কম দেখা করত। আর মেগান যখন তার জন্য খাবার আনত, তখন বাড়ির ভেতরের কাজে অথবা বাইরের উঠোনে ছোট ছোট ছেলেগুলোর সঙ্গে এতই ব্যস্ত থাকত যে, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কোন কথাবার্তা বলবার ফুরসত পেত না। তবে রোজ সন্ধ্যেবেলা রান্নাঘরের জানালার ধারে নিশ্চিন্তে স্থিরভাবে বসে অ্যাসহারস্ট চুরুট খেতে খেতে খোঁড়া জিম অথবা মিসেস নারাকোমের সঙ্গে গল্প করত। তখন মেয়েটি

সেলাই-এর কাজ করত বা এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে রাতের খাবারের বাসনগুলো পরিষ্কার করে ফেলত। কখন-কখন-বা ওর সারা দেহে একটা পুলকের ছোঁয়া লাগত, যখন সে বুঝতে পারত, মেগান ওর শিশির-ভেজা, ধূসর রঙের চোখ দুটি দিয়ে তার দিকে কেমন-যেন একটা বেদনাভরা, কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সপ্তাহখানেক পরে রবিবার সন্ধ্যেবেলা যখন সে ফলের বাগানের ধারে শুয়ে শুয়ে কোকিলের ডাক শুনছিল আর একটি ভালবাসার কবিতা রচনা করছিল, হঠাৎ এক সময় গেট খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর দেখতে পেলে, মেয়েটি গাছের সারির পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে আর লালমুখো গোঁয়ার জো ওর পেছনে পেছনে ধাওয়া করেছে। প্রায় বিশ গজ দূরে এসে এই ছোটাছুটি বন্ধ হল, দুজনে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউই লক্ষ করলে না যে, খুব কাছে ঘাসের ওপর অ্যাসহারস্ট বসে আছে। সে দেখতে পেলে মেয়েটির মুখখানা রাগে লাল আর অশান্তিতে ভরা আর যুবকটার মুখখানা—কে জানত, ওই লালমুখো গেঁয়ো লোকটা উত্তেজনায় এমন উন্মাদের মত হতে পারে! এদৃশ্য দেখে কাতর হয়ে সে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তখন দুজনেই তাকে দেখতে পেলে। মেগান তোলা হাত দুটি নামিয়ে লজ্জায় একটা গাছের গুঁড়ির পেছনে লুকিয়ে পড়ল। যুবকটি রাগে ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ করতে করতে ঝরনার তীরের দিকে ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অ্যাসহারস্ট তখন ধীরে ধীরে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল। ও ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে নিথর হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়েছিল। ওর সুশ্রী, কালো চুলগুলো মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অ্যাসহারস্ট বললে, আমি ক্ষমা চাইছি।

ও বড়-হওয়া চোখ দুটি থেকে ওপরের দিকে দৃষ্টি ফেলে তার দিকে চাইলে, তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চলে যেতে লাগল।

সে ওর পেছনে পেছনে গিয়ে ডাকলে, মেগান, শোন।

ডাক শুনতে পেয়েও মেগান কিন্তু এগিয়ে যেতে লাগল। শেষে ওর একখানা হাত ধরে ফেলে সে ওর মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে বললে, দাঁড়াও। আমার সঙ্গে কথা বলে যাও।

—আপনি কেন আমার কাছে মাপ চাইলেন? আমার মত মানুষের সঙ্গে আপনার ঐ রকম কথা বলা উচিত নয়।

—তাহলে কি জো-র সঙ্গে ওই ভাবে কথা বলা উচিত?

—বলুন, কি সাহসে ও আমার পিছনে তাড়া করে আসে!

—আমার মনে হয় ও তোমাকে ভালবাসে।

ও মাটির ওপর সজোরে পদাঘাত করলে।

অ্যাসহারস্ট ছোট্ট একটা হাসি হেসে বললে, আমি ওর মাথায় একটা ঘুঁষি মারলে তোমার ভাল লাগবে?

ও হঠাৎ উত্তেজনার সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, আপনি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন,—আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন?

সে ওর হাত দুটি জোর করে ধরে ফেললে। কিন্তু ও সংকুচিত হয়ে পেছনে হাঁটতে লাগল—যতক্ষণ না ওর উত্তেজনা-ভরা ছোট্ট মুখখানি এবং খোলা কালো চুলের রাশি গোছাগোছা ফাকাশে লাল রঙের আপেল ফুলের মধ্যে জড়িয়ে গেল। অ্যাসহারস্ট ওর একখানি বন্দী হাত নিজের মুখের কাছে তুলে নিয়ে চুমু খেলে। সে অনুভব করলে, সে কত সিভ্যালরাস এবং মূর্খ গোঁয়ার জো-র তুলনায় কত উচ্চস্তরের মানুষ। সঙ্গেসঙ্গে ওর খসখসে, ছোট্ট হাতখানির ওপর নিজের মুখ বুলতে লাগল। মেগান হঠাৎ পেছন-হাঁটা বন্ধ করলে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে তার দিকে এগিয়ে এল। অ্যাসহারস্টের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা দেহে একটা মধুর উত্তাপের শিহরণ খেলে গেল। তার ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে ছিপছিপে, সরল, সুশ্রী, সুরূপা মেয়েটি খুশী হয়ে উঠেছিল। কি যেন এক চকিত আবেগের বশে ওকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে সজোরে আলিঙ্গন করে ওর কপালে চুমু দিলে। তারপর ওর মুখখানা কালো হয়ে গেল, চোখ দুটি বুজে এল, চোখের পাতার ঘন কালো লোমগুলি বিবর্ণ গালের ওপর লেগে রইল। ওর হাত দুখানি নিশ্চল হয়ে পাশে ঝুলতে লাগল। এদিকে ওর বুকের স্পর্শে অ্যাসহারস্টের সারা দেহে বিদ্যুতের কাঁপন খেলে গেল।

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাঙা গলায় ডাকলে, মেগান। তারপর ওকে ছেড়ে দিলে। চারিদিকের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা কোকিল হঠাৎ ডেকে উঠল। মেয়েটি তখন তার হাতখানি তুলে ধরে নিজের গালের ওপর, বুকে, ঠোঁটে রাখলে এবং আগ্রহভরে তার ওপর চুমু দিলে। শেষে আপেল গাছগুলির শ্যাওলা-ঢাকা গুঁড়ির পাশ দিয়ে ছুটে পালাতে পালাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অ্যাসহারস্ট একটি বুড়ো, জট-পাকানো গাছের গুঁড়ির নীচে বসে পড়ল। তার বুকের মধ্যে স্পন্দন, মনে বিহ্বলতা। গাছে গাছে আপেলের গোছা গোছা ফুলগুলির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও ভাবতে লাগল, একি কাজ সে করে

ফেলল! সৌন্দর্যের প্রলোভন অথবা বসন্তের আকর্ষণের কাছে সে কেমন করে নিজেকে পরাজিত হতে দিলে! তবে এই অনুতাপের মধ্যেও সে এক অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করলে। সুখী এবং বিজয়া! অঙ্গে অঙ্গে শিরায় শিরায় কিসের যেন একটা কম্পন এবং অকারণ আতঙ্কের স্পন্দন! এই ত হল আরম্ভ—কিন্তু কিসের? বসে-থাকা অ্যাসহারস্টকে যত রাজ্যের ডাঁশ কামড়াতে লাগল, উড়ে-বেড়ানো বড় বড় মশা মুখের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। তবু তার চারদিকে বসন্ত যেন উত্তরোত্তর বেশি করে অপরূপ ও জীবন্ত হয়ে উঠল। কোকিল ও শ্যামার গান, উজ্জ্বল সূর্য কিরণ, ঝাঁক ঝাঁক আপেলের ফুল—। সে বুড়ো গাছের গুঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে হাঁটতে ফল বাগানের বাইরে চলে এল। নতুন জাতের অনুভবগুলোকে ভোগ করার জন্য তার মন চাইছিল খোলা হাওয়া আর মুক্ত আকাশ। সে খোলা মাঠের দিকে যাত্রা করলে। বেড়ার ধারের একটি অ্যাশ গাছ থেকে একটা ম্যাগপাই পাখি যেন তার আগমন ঘোষণা করে সামনে দিয়ে উড়ে গেল।

পাঁচ বছর বয়স ছেড়ে দিলে তারপর থেকে যে কোন বয়সের মানুষের সম্বন্ধে কে বলতে পারে যে, সে কখনো ভালবাসায় পড়েনি। অ্যাসহারস্ট তার নাচের ক্লাসের অংশীদারের প্রেমে পড়েছিল; শৈশবে তার ধাই মাকে ভালবেসেছিল। স্কুলের ছুটির দিনে সঙ্গিনী মেয়ের প্রেমে পড়েছিল; হয়ত কারো প্রতি ভালবাসা ছাড়া কখনও তার দিন কাটেনি। এছাড়া, সবসময়ই কোন কাছের বা দূরের কোন না কোন মেয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত। কিন্তু আজকের এই অনুভূতি ত সম্পূর্ণ আলাদা! আদৌ দূরবর্তী নয়। একেবারে নতুন ধরনের অনুভূতি—ভয়ংকরভাবে তৃপ্তিকর! এ এনে দিয়েছে নিজের মনে নিজের সম্বন্ধে একটা পুরুষের পূর্ণতা-বোধ। হাতের আঙুলের মধ্যে একটা বনফুল ধরা, তা ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে স্পর্শ করতে পারা এবং আনন্দের কাঁপনের সঙ্গে সবকিছু ভোগ করা! কি মাদকতা, এবং কি বিহ্বলতা! এ নিয়ে কি করা যায় এখন? এর পরের বারে ওর সঙ্গে কিভাবে দেখা করা যায়? প্রথম যেভাবে সে আদর করেছিল, তা ছিল তাপহীন, দরদ-ভরা। কিন্তু পরের বার ত আর তেমন করা চলবে না। এখন যে সে ভোগ করেছে তার হাতের ওপর ওর তপ্ত, ছোট্ট চুমু; তার হাতটি নিয়ে ওর বুকের ওপর সজোরে চেপে ধরা, অর্থাৎ ও যে তাকে ভালবেসেছে—অ্যাসহারস্টের তা জানা হয়ে গেছে। ভালবাসা লাভ করে কতকগুলো মানুষের স্বভাব স্থূল হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাসহারস্টের মত লোকেরা ভালবাসাকে এক

রহস্যময় ব্যাপার বলে অনুভব করে; ভালবাসা লাভ করে মুগ্ধ হয়, উষ্ণ হয়, মধুর হয়। তাদের মন উধাও হয়ে পড়ে,—এমন-কি মহিমায় হয়ে ওঠে উজ্জ্বল।

পাহাড়ের ওপর বসে বসে নিজের মধ্যে সে এক তীব্র দ্বন্দ্ব অনুভব করতে লাগল। একদিকে ছিল তার জীবনে বসন্ত ঋতুর পরিপূর্ণতা লাভের নতুন অনুভূতি পরমানন্দে ভোগ করার প্রচণ্ড আগ্রহ, আর একদিকে এক অস্পষ্ট অথচ খুব বাস্তব অশান্তির চাঞ্চল্য। একবার সে এই সুন্দরী এই শিশির-ভেজা চোখ দুটির অধিকারিনীকে জয় করার গর্বে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করছিল। কিন্তু পরের মুহূর্তে তার মন কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলছিল, হাঁ, হাঁ, ব্যস! কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি কি করছ! তুমি কি জান, এর পরিণাম কি!

সন্ধ্যার আবছায়া তার অলক্ষ্যে নেমে এল। তখন সে যেন প্রকৃতির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, "তোমার পক্ষে এ এক নতুন জগৎ।" যখন কোন মানুষ চারটের সময় বিছানা থেকে উঠে গ্রীষ্মকালের ভোরবেলায় বাইরে বেরিয়ে পড়ে আর যত পশু-পাখি ও গাছের সারির দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন তার মনে হয়, এরা সব যেন সবেমাত্র নতুন সৃষ্টি হয়েছে। অ্যাসহারস্টের পক্ষে এও যেন সেই রকমের এক অভিজ্ঞতা।

সে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে কাটিয়ে দিলে। যখন বেশ ঠাণ্ডা পড়ল, তখন অন্ধকারে যত পাথর-ভাঙা আর বন-তুলসার গোড়ার ওপর দিয়ে পা ফেলতে ফেলতে বড় রাস্তায় উঠে পরিচিত গলিটায় পৌছল; তারপর জঙ্গল-ভরা মাঠ পার হয়ে ফল বাগানে ফিরে এল। দেশলাই জ্বেলে হাতের ঘড়ি দেখলে রাত প্রায় বারটা। এখন চারদিক ঘন কালো আর নিথর,—নিস্তব্ধ! পাখির ডাকে মুখর, যাই-যাই করেও থেকে যাওয়া সেই ছঘণ্টা আগেকার শেষ-বিকালের আলো—তা থেকে এ দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা! সহসা তার মনের মধ্যে কল্পনায় ভেসে উঠল এই কবিত্বভরা দৃশ্যের পাশে সংসারীর দৃষ্টি দিয়ে দেখা বাইরের জীবনের ছবিগুলি—মিসেস নারাকোমের সাপের মত ঘাড় ফেরানো, কালো তীক্ষ্ণ চোখ ফেলে সবকিছু বুঝে নেওয়া, ওর চতুর মুখের ওপর কঠিন-কঠোর রেখাপাত; তারপর জিপসী ছেলেগুলোর স্থূল ঠাট্টা-তামাশা আর অবিশ্বাস; প্রচণ্ড রাগী গাঁট্টাগোট্টা জো! শুধু চোখের রোগে-কষ্ট-পাওয়া, খোঁড়া জিম হচ্ছে একমাত্র লোক, যাকে সহ্য করা যায়। পথ চলতে চলতে সে পার হয়ে গেল গ্রামের মদের দোকান। মনে ভেসে উঠল, দশ দিন আগে সকালে ফিরে যাবার

আগে একান্ত বন্ধু রবার্ট গারটনের মুখের হাসি, কি ব্যঙ্গভরা! দারুণ বিরক্তিকর! ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, এক মুহূর্তের জন্য এই পার্থিব, সংশয়মনা জীবনের ওপর তার ভিতরটা ঘৃণায় ভরে গেল। ফল বাগানের যে গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল তা পুরনো, ছাইরঙের হয়ে গেছল। তার চোখের ওপর হঠাৎ এক ফালি কাঁপা আলো এসে পড়ল, তারপর তা নীলাভ অন্ধকারের বুকে ছড়িয়ে পড়ল। আকাশে যে চাঁদ উঠেছে রে! পেছনের দিকের নদীর তীরের ঠিক ওপরে —সে দেখতে পেলে রঙে লাল, আকারে প্রায় গোল—এ যেন এক অদ্ভুত চাঁদ! ঘুরে দাঁড়িয়ে সে গলির মধ্যে এগিয়ে চলল। গলিটা রাতের গন্ধে ভরা আর তার সঙ্গে রয়েছে গোবর ও কচি-পাতার গন্ধ। গোয়ালের উঠোনে পৌঁছে চোখে পড়ল কালো রঙে ঢাকা গরু ভেড়ার ছায়া মূর্তি। সে চুপিচুপি খামারের গেটে চাবি লাগিয়ে খুলে ফেললে। বাড়িটার সর্বত্র ঘোর অন্ধকার। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে গাড়ি বারান্দায় উপস্থিত হল। মেগানের ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলে। জানালা খোলা ছিল। ও কি ঘুমুচ্ছে, না জেগে আছে? হয়ত আমি বাড়ি ফিরিনি বলে দুর্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে! অ্যাসহারস্ট যখন উঁকি মেরে দেখছিল, তখন একটা পেঁচা ডেকে উঠল। সেই শব্দে সমস্ত রাতটা যেন ভরে গেল,—চারিদিকে ছিল এমনই নিস্তব্ধতা! শুধু ফলের বাগানের নীচেকার পাশ দিয়ে নদী কুলকুল শব্দে বহে যাচ্ছিল। দিনের বেলা কোকিলের দল আর রাত্তিরে পেঁচার দল—তার হৃদয়ের উন্মাদনা কি চমৎকারভাবে এরা প্রকাশ করছে। এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল, মেগান জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সে ইউ গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে একটু সরে এসে ফিসফিস করে ডাকলে, মেগান।

মেগান পেছন হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল, পর মুহূর্তে পুনরায় এসে জানালার বাইরে অনেক নীচে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ল। সে ঘাসের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গেল। সবুজ রঙ-করা চেয়ারে তার পায়ের ধাক্কা লাগল আর সেই শব্দ শুনে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকল। ওর বাড়িয়ে-দেওয়া হাত আর মুখের কালো-ছায়া একটুও নড়ল না। সে চেয়ারখানা সরিয়ে এনে নিঃশব্দে তার ওপর দাঁড়াল। তার হাত তুলে ধরতে প্রায় ওর হাতের কাছাকাছি ছুঁই-ছুঁই হয়ে পৌঁছল। মেগানের হাতে ছিল বাড়ির সামনের দরজার মস্ত বড় চাবিটা। সেই চাবি-সুদ্ধ সে ওর তপ্ত হাতখানা জোরে আঁকড়ে ধরলে। ওর মুখখানা, ঠোঁটের মধ্যে চকচকে দাঁত এবং উসকো-খুসকো মাথার চুল মাত্র দেখা যাচ্ছিল। ও তখনও

দিনের বেলার বেশভূষা পরেছিল। অ্যাসহারস্ট ভাবলে, আহা, নিঃসন্দেহে আমার জন্যে অপেক্ষা করেই এতক্ষণ বসেছিল! আমার মিষ্টি মেগান!

ওর তপ্ত খসখসে হাতের আঙুলগুলো তখনো তার আঙুলে জড়ানো ছিল। মুখে ছিল একটা অদ্ভুত বেদনা-ক্লিষ্ট ভাব। যা হোক, হাত দিয়ে অন্ততঃ ওর নাগালও পাওয়া গেছে! পেঁচাটা এই সময়ে আবার ডেকে উঠল। তার নাকে এল গোলাপফুলের গন্ধ। খামারের একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। মেগানের হাত আলগা হয়ে গেল, চকিতে ও পেছনে সরে গেল।

—মেগান, শুভ রাত্রি।

—শুভরাত্রি, স্যর।

মেগান চলে গেল। অ্যাসহারস্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুনরায় পৃথিবীর বাস্তবতার পরিমণ্ডলে ফিরে এল। চেয়ারটায় বসে পড়ে মাথার টুপি খুলে ফেললে। যা হোক কবে ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। তবু মেগানের একফালি হাসিভরা বেদনা-ক্লিষ্ট মুখ, ঠাণ্ডা চাবিটা হাতে গুঁজে দেবার সময় ওর আঙুলের জলন্ত স্পর্শ—এই সব ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল, শিশিরের স্পর্শে তার পা কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে উঠল।

॥ পাঁচ ॥

পরের দিন যখন সে ঘুম থেকে জেগে উঠল, তার বোধ হল, গত রাত্তিরে খুব 'গুরু ভোজন' যেন করেছিল—যদিও আদৌ কোন খাবার খায়নি আর কালকের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলো যেন বহুদূরের যত অবাস্তব রূপকথা!

তবু সকালবেলাটা ছিল আলো ঝলমল। অবশেষে ভরা বসন্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল তার পূর্ণ পসরা নিয়ে। সে নীচেয় নেমে গেল মেগানের সঙ্গে দেখা করতে তার কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল। অথচ যখন মেগানের বদলে মিসেস নারাকোম তাকে ব্রেকফাস্ট এনে দিলেন সে আশাভঙ্গের বিরক্তি বোধ করলে। আজ সকালে মিসেস-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সাপের মত ঘাড়ে যেন জেগেছে নতুন ধরনের তৎপরতা। ও কি সব লক্ষ করছে নাকি?

—মিঃ অ্যাসহারস্ট, তাহলে আপনি আর আকাশের চাঁদ দুজনে একসঙ্গে কাল রাত্তিরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, কি বলেন? অন্য কোথাও কি রাতের খাবার খাওয়া হয়েছিল?

অ্যাসহারস্ট মাথা নাড়লে।

—আমরা আপনার জন্যে খাবার চাপা দিয়ে রেখেছিলুম। আমার বোধ হচ্ছে, আপনার মস্তিষ্ক এতই কর্মব্যস্ত ছিল যে, খাবার কথা ভাববার ফুরসত মেলেনি।

মেয়ে-মানুষটা কি তাকে ব্যঙ্গ করছে? —ওর গলার স্বরে এখনও রয়েছে কতকটা ওয়েলস জাতির স্বরের ঢেউ-খেলানো ভাব। একথা ওকি জানে! সেই মুহূর্তে তার মনে হল, না, না, আমি এখান থেকে চলে যাব। এখানে একটা বিশ্রী মিথ্যার চক্রে নিজেকে আর জড়িয়ে ফেলব না।

কিন্তু প্রাতরাশ শেষ হবার পর মেগানকে দেখার তীব্র আগ্রহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মিনিটে মিনিটে আগ্রহের বেগ বাড়তে লাগল, সঙ্গে এই ভয়ও হতে লাগল, যদি বে-চাল কোন কথা বলে বসি, যার ফলে সবকিছু মাটি হয়ে যায়! ও যে এখনো সামনে এসে হাজির হয়নি—এমন-কি চকিতের দেখাও দেয় নি, এটাই ত বেশ অশুভ লক্ষণ! আর যে প্রেমের কবিতাটি প্রস্তুত করার কাজে কাল বিকালবেলা মাতোয়ারা হয়ে কেটেছিল, এখন তা নিতান্ত ছেলেখেলা বলে তার মনে হল। সে লেখাটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেললে। মেয়েটা তার হাত-খানা ধরে তাতে চুমু খাবার আগে ভালবাসার সম্বন্ধে তার কি জ্ঞান ছিল! আর এখন,—ভালবাসার সম্বন্ধে কি সে না জানে? কিন্তু সে অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখালিখি করা ত নিতান্ত নীরস কাজ!

সে একখানা বই নিতে শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার বুকের মধ্যে কি যেন তোলপাড় করে উঠল, সে দেখতে পেলে মেগান ভেতরে তার বিছানাটা ঝেড়ে দিচ্ছে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখতে লাগল, মাথার বালিশে কাল রাত্তিরে মাথা রাখার জন্য গালের চাপে যেখানে একটা গর্ত হয়েছিল, হঠাৎ মুখ নীচু করে ও সেখানটায় চুমু খেলে। সে দৃশ্য দেখে আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে গেল। সে যে ওর এই ভক্তি-সুন্দর কাজটি দেখতে পেয়েছে, কেমন করে সে কথা ওকে জানানো যায়? আবার যদি ও তার চুপিসাড়ে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পায়—তাহলে ব্যাপারটা আরো বিশ্রী হবে। ইতিমধ্যে ও বালিশটা দুহাতে তুলে ধরলে, কিন্তু টেপাটিপি করে গালের দাগটা লোপ করতে যেন অনিচ্ছুক, তাই বালিশটা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

—মেগান!

ও গালের ওপর দুহাত চেপে মুখ ঢেকে ফেললে, কিন্তু ওর চোখ দুটি যেন সোজা তার দিকে চেয়ে রইল। ওই শিশিরভেজা, জলজলে চোখ দুটিতে যে

গভীরতা, পবিত্রতা এবং মর্মস্পর্শী বিশ্বাসপরায়ণতা ফুটে উঠেছিল, অ্যাসহার্স্ট তা জীবনে কখনো অনুভব করেনি। সে তোতলামি করতে করতে বললে, কাল রাত্তিরে আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিলে, কি মিষ্টি মেয়ে তুমি!

তবু ও কোন কথা বললে না। সে তোতলামি করে বলে যেতে লাগল, আমি মাঠে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। কাল রাতটা কি চমৎকার ছিল! আ-আ, আমি একটা বই নেবার জন্যে এদিকে এসে পড়েছি, জানলে?

এমন সময় মনে পড়ে গেল বালিশের ওপর ওর চুমু খাওয়ার কথা। সে হঠাৎ প্রচণ্ড আবেগে ওর কাছে গিয়ে ওর চোখ দুটিতে চুমু দিলে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সঙ্গে সে মনে মনে ভাবলে, একি, এ যে চকিতে এক অঘটন আমি করে ফেললুম। গতকাল যা কিছু হয়েছিল, তা ছিল অকস্মাতের খেলা। কিন্তু এখন ত তা নয়, অঘটন নিজেই করে ফেলেছি! মেয়েটি তার ঠোঁটের ওপর কপাল চেপে দিলে। তার ঠোঁট দুটি ক্রমশঃ নামতে নামতে ওর ঠোঁটের কাছে এসে পৌঁছল! তারপর প্রেমের সত্যিকার প্রথম চুম্বন—অদ্ভুত অথচ চমৎকার; এখনো প্রায় নিবাহ এবং নিষ্পাপ।

—শোন, আজ রাত্তিরে ওরা সব ঘুমিয়ে পড়লে বড় আপেল গাছটার কাছে আসবে। —মেগান, ঠিক ত? প্রতিজ্ঞা কর।

ও ফিসফিস করে উত্তর দিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

তারপর ওর মুখের ফ্যাকাশে রঙ দেখে ভয় পেয়ে অ্যাসহার্স্ট ওকে ছেড়ে দিলে। তাড়াতাড়ি নীচেয় নেমে এল। হাঁ, হাঁ, এখন ও বেপরোয়া কববার তা ত চুকিয়ে ফেলেছে! ওর ভালবাসা গ্রহণ করেছে আর নিজের ভালবাসা ওকে জানিয়েও দিয়েছে।

সে কোন বইপত্র হাতে না নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সবুজ চেয়ারটার কাছে গেল। তার ওপর বসে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল—সে দৃষ্টিতে ছিল একসঙ্গে জয়ের আনন্দ আর জড়িয়ে পড়ার বিষণ্ণতা। তার পেছনে সারা খামারের বিচিত্র কাজ চলতে লাগল। কতক্ষণ যে এই শূন্যতা-ভরা মনের অদ্ভুত অবস্থায় সে ওখানে বসেছিল, তা বুঝতে পারে নি। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, তার পেছনে ডানদিক ঘেঁষে জো দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্টতঃই জোয়ান ছেলেটা মাঠে কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা নাড়ছিল, সশব্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, মুখের ওপর সূর্যাস্তের ম্লান আভা, নীল কামিজের গুটোন আস্তিনের নীচেয় দেখা যাচ্ছিল দুটো পীচ রঙের লোম-ভরা হাত। তার লাল ঠোঁট দুটো

খোলা। আর নীলাভ চোখদুটি এক-দৃষ্টিতে অ্যাসহারস্টের দিকে আবদ্ধ ছিল।

অ্যাসহারস্ট ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলে, কি জো, তোমার জন্যে কিছু কি করতে পারি?

—হাঁ।

—কি সে কাজ বল ত।

—আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারেন। আমরা আপনাকে চাই না।

অ্যাসহারস্টের মুখে সব সময়ই থাকত আভিজাত্য। এখন তা সবচেয়ে প্রখর-হয়ে উঠল, উত্তর দিলে, খুব ভাল কথা। কিন্তু জো, তুমি কি জান, অপরে শুধু নিজেদের সম্বন্ধেই কথা বলুক—এটাই আমি পছন্দ করি?

জোয়ান ছেলেটা দু-এক পা এগিয়ে এল। তার গায়ের ঘামের গন্ধ অ্যাসহারস্টের বিশ্রী লাগল।

ও বললে, আপনি এখানে কেন রয়েছেন?

—আমার ভাল লাগছে, তাই আছি।

—ভাল আর লাগবে না—যখন আমি আপনার মুণ্ডু গুঁড়িয়ে দেব!

—বটে, তা কবে সে কাজ শুরু করবার ইচ্ছে হচ্ছে?

জো-র উত্তর প্রকাশ পেল ওর জোরালো নিঃশ্বাসের শব্দে। তবে রাগে উন্মত্ত, কম-বয়সী ষাঁড়ের চোখের মত ওর চোখ দুটি জ্বলতে লাগল। তারপর মাংস-পেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপে ওর মুখ মণ্ডলের ওপর আলোড়ন খেলে গেল।

বললে, মেগান আপনাকে চায় না।

ঈর্ষা, ঘৃণা ও রাগের প্রচণ্ড আবেগে অ্যাসহারস্ট তার আত্মসংযম হারিয়ে ফেললে। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা পেছনে হটিয়ে দিয়ে বলে উঠল, তুমি জাহান্নমে যাও, হতভাগা!

এই সাধারণ কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে ওর চোখে পড়ল, বাড়িতে ঢোকবার পথে মেগান একটি বাদামী রঙের ছোট্ট স্প্যানিয়েল কুকুর কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে। ও তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে বললে, দেখুন, এর চোখগুলো কেমন নীল।

জো চলে গেল। ওর ঘাড়ের পিছনটা একেবারে টকটকে লাল দেখাচ্ছিল।

অ্যাসহারস্ট মেগানের কোলের ছোট বাদামী রঙের জীবটির মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিলে। পপীটা ওর বুকে ঠেস দিয়ে কি আরামে না রয়েছে।

—ওটা ত ইতিমধ্যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে, দেখছি। আঃ, মেগান, সবাই তোমাকে ভালবাসে।

মেগান ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে, কিছু মনে করবেন না, জো আপনাকে কি বলছিল ?

—আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছিল। কারণ, তুমি নাকি চাওনা, আমি এখানে থাকি।

ও ঘৃণায় মাটিতে পা ঠুকলে। তারপর অ্যাসহারস্টের মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলে। সে মেয়েটির আদর-ভরা দৃষ্টির প্রভাবে তার শিরায় শিরায় একটা শিহরণ অনুভব করলে, যেন একটা প্রজাপতি আগুনের শিখার মধ্যে তার ডানা পোড়াচ্ছে।

সে বললে, আজ রাতের বেলা। ভুলে যেওনা যেন।

—না।

ও পপীটার ছোট্ট বাদামী, মাংসল গায়ে নিজের গাল ঘসতে ঘসতে চুপিসাড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

অ্যাসহারস্ট গলিপথে বেড়াতে লাগল। মাঠে যাবার গেটের ধারে পৌছলে খোঁড়া জিম আর তার গরুগুলোকে দেখতে পেলে।

—জিম, আজকের দিনটা কি চমৎকার !

—আঃ, যা বলেছেন, ঘাসের পক্ষে খুব ভাল আবহাওয়া।

সে আলস্যের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, জিম, জিপসী ভূতটাকে যখন দেখতে পেয়েছিলে, তখন তুমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলে ?

—আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন, তখন বলি হয়ত এই বড আপেল গাছটির তলাতে দাঁড়িয়েছিলুম।

—সত্যিই তুমি বিশ্বাস করো যে, গাছটা ওইখানে দাঁড়িয়েছিল ?

জিম সতর্কতার সঙ্গে উত্তর দিলে, একথা বলা আমার উচিত নয় যে, গাছটা যথার্থই ওখানে দাঁড়িয়েছিল। বরং বলি, সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে, গাছটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

—এ দৃশ্য দেখে তোমার কি ধারণা হয়েছিল ?

খোঁড়া লোকটি গলার স্বর নীচু করে বললে, লোকে বলে, পুরোতন মনিব মিঃ নারাকোমের শরীরে জিপসী জাতের রক্ত ছিল। অবশ্য এটা গুজব। তবে লোক হিসেবে ওরা খুব ভাল। জানলেন ? হয়ত মনিব মিঃ নারাকোম মারা যাবেন

জানতে পেরে ওঁর লোকেরা সঙ্গী হবার জন্য ভূতটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ত এই রকম ভেবে রেখেছি।

—ভূতটাকে কি রকম দেখতে ছিল ?

—ওর মুখের সর্বত্র লোম ছিল। আর এমনিভাবে থপ থপ করে হাঁটছিলেন। লোকে বলে, ভূত বলে কিছু নেই। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি, একদিন ঘোর অন্ধকার রাত্তিরে এই কুকুরটার গায়ের লোমগুলো সোজা খাড়া হয়ে উঠেছিল। অবশ্য, আমি নিজে কারোকে দেখতে পাইনি।

—তখন আকাশে চাঁদ ছিল ?

—হাঁ, বলা যেতে পারে পুবন-চন্দব। তবে সবেমাত্র উঠেছিল, সোনার মত—ওই গাছগুলোর পেছনে।

—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, ভূত দেখা মানেই কিছু-না-কিছু বিপদ ঘটার সম্ভাবনা ?

খোঁড়া লোকটি মাথার টুপিটা ঠেলে ওপরে তুলে দিলে। উঁচু-হওয়া চোখ দুটি খুব আগ্রহের সঙ্গে অ্যাসহারস্টের দিকে তুলে ধরলে; তারপর বললে, আমার মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয়। জগতের কত জিনিস আছে, আমরা বুঝতে পারি না। একথা নিশ্চয়,—একথা খুব সত্যি। আবার সংসারে এমন লোক আছে, যারা নানা জিনিস দেখতে পায়, আর এমন লোকও আছে, যারা কিছুই দেখতে পায় না। এখন, এই যে আমাদের জো,—আপনি তার চোখের সামনে কিছু তুলে ধরুন, ও মোটেই দেখতে পাবে না। আবার, ওই যে ছোট-ছোট ছেলেগুলো,—ওরাও অমনি কানা। কিন্তু আপনি মেগানকে নিয়ে যান, যেখানে কোন জিনিস আছে, ও তা ঠিক দেখতে পাবে, বরং বেশী কিছু দেখবে।

—ওর বেশ বোধশক্তি আছে, তাই সবকিছু দেখতে পায়।

—তার মানে কি ?

—তার মানে, ওর মনটা এত তাজা যে, ও সব জিনিস সহজে বুঝতে পারে।

—আঃ, কি বলব, ভালবাসায় ওর বুক ভরা, মাশয়।

অ্যাসহারস্ট বুঝতে পারলে, একথা শুনে তার গাল লালাভ হয়ে উঠছে। শেষে তামাক পাতার ছোট থলিটা হাতে নিয়ে বললে, এই নাও, তামাক দিয়ে তোমার চুরুট তৈরি করে খাও, জিম।

—ধন্যবাদ, মাশয়। ওর মত মমতাময়ী শতকে একটা মেলে কিনা সন্দেহ, এই আমার ধারণা।

অ্যাসহারস্ট ছোট্ট জবাব দিয়ে বললে, আমিও তাই মনে করি।

সে তার তামাক পাতার থলির মুখ বন্ধ করে পায়চারি করতে লাগল।

'ভালবাসায় ওর বুক-ভরা'! আর সে নিজে কি করছে? এই ভালবাসায় বুক-ভরা মেয়েটির সম্বন্ধে নিজে কি করছে? তার মনের ইচ্ছেগুলো কি? এই প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে অ্যাসহারস্টের মনকে উতলা করতে লাগল। আকাশে দোয়েল পাখিগুলো খুব উঁচুতে উড়ছিল। ফোটা বাটারকাপ ফুলে উজ্জ্বল মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে এগিয়ে চলল। হাঁ, ওক গাছগুলো অ্যাশ গাছের আগেই বাদামী সোনার রঙে রঙিন হয়ে গেছে। প্রত্যেক গাছটি দেখতে যেন ভিন্ন ভিন্ন আকারের, ভিন্ন ভিন্ন রঙের। কোকিল আর নানাজাতীয় পাখির গানে চারিদিক মুখর। ছোট ছোট নালা আর ঝরনাগুলোকে বেশ আলো-ঝলমল দেখাচ্ছে। প্রাচীনকালের লোকেরা বিশ্বাস করত, হেসপরাইডিসের বাগানে আবির্ভাব হত স্বর্ণযুগ। ইতিমধ্যে একটি রানী বোলতা তার জামার হাতায় এসে বসল। রানী বোলতাটিকে মেরে ফেলা মানে দু-হাজার সাধারণ বোলতা মারার সমান। আর এই বোলতারা আপেল বাগানে মুকুল নষ্ট করে বেড়ায়। কিন্তু আজকের দিনের মত দিনে ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে কার মন প্রাণীহত্যা করতে চায়? একটা কম-বয়সী ষাঁড় যে ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছিল, সেখানে অ্যাসহারস্ট এসে উপস্থিত হল। তার বোধ হল, ষাঁড়টা যেন জো-র মত গাঁট্টাগোট্টা দেখতে। কিন্তু সেই কম-বয়সী ষাঁড়টা আগন্তুককে আদৌ লক্ষ করলে না। অ্যাসহারস্ট ওকে এড়িয়ে ছোট নদীর অপর পারে পাহাড়ী অঞ্চলে পার হয়ে এল। ঢালু জমি থেকে সোজা একটা পাহাড়ের চূড়ো অন্যান্য পাহাড়-গুলোর মাথার ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের নীচের জমি নীল অপরাজিতায় ভরে গেছল। পাশের বুনো আপেলের গাছগুলোয় ছিল ভরা মুকুলের হিল্লোল।

অ্যাসহারস্ট মাটির ওপর সোজা শুয়ে পড়ল। সোনালী ওক আর বাটারকাপ ফুলের শোভায় ভরা মাঠ থেকে পাহাড়ী চূড়োর এই স্বর্গীয় রূপময়তায় ওর মন-প্রাণ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রকৃতির এই দু-জাতের রূপসজ্জার মধ্যে কোন মিল ছিল না,—স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি ও কোকিলের কূজন ছাড়া আর কোন মিল ছিল না। সে অনেকক্ষণ ধরে ওখানে শুয়ে রইল। দেখতে লাগল রোদের খেলা—যতক্ষণ পর্যন্ত না বুনো-আপেল বনের ছায়া অপরাজিতা ফুলগুলোর মাথায় মাথায় এসে পড়ল; এখন কয়েকটা বুনো মৌমাছি কেবলমাত্র তার সঙ্গী।

অ্যাসহারস্টের মনে ছিল কিসের যেন এক মাতন! সেদিন সকালের আর আজকের রাতের চুমু খাওয়ার স্মৃতির হিল্লোলে তার মন ভরে উঠেছিল। নিশ্চয়, এইরকম স্থানেই পুরাকালের বনদেবতারা আর বৃক্ষ দেবতারা বাস করতেন, বুনো আপেলের মঞ্জরীর মত সাদা-ধবধবে বন-কুমারীরা এই রকম সবুজের মহিমার মধ্যে প্রমোদ ভ্রমণে বার হতেন। আর বাদামী রঙের বন-দেবতারা তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে লুকিয়ে থাকতেন। অ্যাসহারস্টের যখন ঘুম ভাঙল, তখনও জল-স্রোতের কলধ্বনি আর কোকিলের ডাকে চারিদিক মুখর ছিল, কিন্তু পাহাড়-চূড়োর পরপারে সূর্য ডুবে গিয়েছিল। পাহাড়ের আশপাশটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছল আর কতকগুলো খরগোস বাইরে বার হয়ে এসেছিল। হঠাৎ তার মন বলে উঠল, আজ রাতের বেলা! এক অজ্ঞাত শক্তির নিত্য-চঞ্চল আঙুলের ইঙ্গিতে যেন মাটির বুকে সব কিছুই প্রবল তাগিদে আত্মপ্রকাশ করছিল, তেমনি ভাবে ওর হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়গুলি যেন কিসের প্রেরণায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল। সে সোজা উঠে দাঁড়াল এবং একটি বুনো আপেল গাছ থেকে এক গোছা ফুল ছিঁড়ে নিলে। ফুলগুলি ছিল মেগানের মত দেখতে। বুনো, তাজা,—ফিকে লাল সে ফুলের গোছাটি কোটের পকেটে রাখল। তার হৃদয়ের গোপন-তলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বসন্তের যে চাঞ্চল্য, তার পরিচয় একটি দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে প্রকাশ পেল। ইতিমধ্যে খরগোসগুলো কিন্তু ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

॥ ছয় ॥

তখন প্রায় রাত এগারটা। অ্যাসহারস্ট 'ওডিসি' কাব্যের যে পকেট সংস্করণটা প্রায় আধঘণ্টা না পড়ে হাতে ধরে রেখেছিল, তা সঙ্গে নিয়ে খামারের উঠোন পার হয়ে চুপিচুপি ফল বাগানে বার হয়ে এল। সবেমাত্র পাহাড়ের মাথার ওপর সোনালী রঙের চাঁদ উঠেছিল, যেন এক উজ্জ্বল শক্তিমান সত্তা একটা অ্যাশ গাছের ডাপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল। আপেল গাছের ক্ষেতে তখনও অন্ধকার রয়েছে। সে কোন্ দিকে যাবে ঠিক করার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। মাটির ওপর ঘাসগুলো পা দিয়ে স্পর্শ করে দেখল। ওর ঠিক পেছন দিকে একটা কালো রঙের বস্তু ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে নড়ে উঠল; তার মধ্যে তিনটি বড় বড় শূয়োর ছানা নড়েচড়ে আবার পরস্পরকে জড়িয়ে দেওয়ালের নীচেয় কুণ্ডুলি পাকালে। ও কান পেতে রইল। চারিদিকে আর কোন আওয়াজ ছিল না, শুধু জলধারার কল্লোল দিনের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে শোনা যাচ্ছিল। ওর অজানা এক

পাখি এক ঘেঁয়ে ডাক ডেকে উঠল, পিপ—পিপ, পিপ—পিপ। শুনতে পেলে দূরে চরকার ঘড় ঘড় আওয়াজ। একটা পেঁচা ডেকে উঠল। অ্যাসহারস্ট দু-এক পা এগিয়ে গিয়ে আবার থেমে পড়ল। ও অনুভব করলে, মাথার ওপরে চারিদিক ঘিরে এক আবছায়া, প্রাণবন্ত সাদা রঙের বিপুল বিস্তৃতি। আঁধারে আচ্ছন্ন নিথর গাছের সারির বুকে অগুনতি রেশমী-কোমল, কালো ফুল ও কুঁড়ি জ্যোৎস্নার ইন্দ্রজালে প্রাণবন্ত হয়ে জেগে আলোয় আলো হয়ে রয়েছে। তার মনে অদ্ভুত এক অনুভূতি জাগল। সে যেন সত্যি-সত্যি লক্ষ লক্ষ সাদা পতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গী হয়ে গেছে। অন্ধকার-ভরা আকাশ এবং আরো বেশী অন্ধকার ভরা পায়েব জমি—এই দুয়ের মধ্যিখানের ফাঁকটুকু ভবে এরা তার চোখের সঙ্গে সমতলে তাদেব ডানা মেলে ধরছিল অথবা বন্ধ করছিল। এই গন্ধহীন সৌন্দর্যের পরিমণ্ডলে, এই বিহ্বলতার মধ্যে সে প্রায় ভুলতে বসেছিল, কি উদ্দেশে সে এই ফলের বাগানে এসে হাজির হয়েছিল। বাতাসের চাকচিক্য যা সারাদিন ধরে পৃথিবীর মাটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তা রাত্রি শুরু হলেও লুপ্ত হয়নি বটে, কেবল এই নতুন আকারে রূপান্তর ঘটেছিল। সে প্রাণবন্ত সাদা রঙে আচ্ছন্ন জঙ্গল ও গাছের শাখাপ্রশাখার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। শেষে এসে পৌঁছল সেই বড় আপেল গাছটির তলায়। গাছটি সম্বন্ধে তার একটুও ভুল হয়নি, অপর আপেল গাছের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী উঁচু এবং আকারে বড়। তাছাড়া, ফাঁকা মাঠে এবং নদীর দিকে হেলানো ছিল গাছটি। এই অন্ধকারেও সে গাছটিকে অনায়াসে চিনতে পেরেছিল। ঘন শাখা-প্রশাখার মধ্যে আবার সে কান পেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কানে এল ঠিক সেই আগেকার শব্দগুলিই। সেই ঘুমন্ত শূয়োর ছানাদের ক্ষীণ ঘোঁত ঘোঁত শব্দ। সে শুকনো, গরম গাছটির গুঁড়ির খসখসে শ্যাওলা-ভরা গায়ে হাত দিলে। নাকে এল একরকম বিশেষ ভিজে গন্ধ।

ক্রমে মনে সন্দেহ জাগল, সে কি আসবে-সত্যিই আসবে? এই বাতাসে কাঁপা, জ্যোৎস্নার মায়া-ভরা গাছগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে সংসারের সব বিষয়ের ওপর অবিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে উঠল। ওর চারপাশে যা কিছু ছিল, সব মিলে ত সৃষ্টি হয়েছিল এক অপার্থিব পরিমণ্ডল! এ ত পার্থিব প্রেমিকদের আদৌ যোগ্য নয়। শুধু স্বর্গের দেবদেবী অথবা বনকুমার বনকুমারীদের যোগ্য। অ্যাসহারস্ট কিংবা সেই ছোট্ট, গ্রাম্য বালিকার জন্য ত নয়! ও ভাবলে, সে যদি আজ না এসে উপস্থিত হয়, তাহলে হয়ত ভাল হয়। তবু সব সময়ই নিজের অজ্ঞাতে একটি বিশেষ শব্দ শোনার জন্য সে কান পেতে রেখেছিল। কিন্তু হায়,

সেই অজানা পাখিটাই মাত্র পুনরায় ডেকে উঠল, পিপ—পিপ, পিপ—পিপ। আর শোনা গেল জলধারার কুলুকুলু শব্দ। জলধারার বুকের ওপর আকাশের চাঁদ গাছের সারির বন্দীশালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছিল। অ্যাসহারস্টের চোখের সামনে ফুলের গুচ্ছগুলি প্রতি মুহূর্তে আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল। সে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে চোখের কাছে ধরলে,—তাতে তিনটি ফুলের গোছা ছিল। ফলের গাছেব মঞ্জরী কচি, নরম, পবিত্র,—তা ডাল থেকে ছেঁড়া এক রকমের পাপ কাজ।

এই সময়ে হঠাৎ শোনা গেল গেট বন্ধ করার আওয়াজ, সঙ্গেসঙ্গে শূয়োর ছানাদের ঘোঁত-ঘোঁত শব্দও। আপেল গাছেব গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সে দুখানি হাত বাড়িয়ে শ্যাওলা-ভরা পেছন দিকটা চেপে ধরলে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। ক্রমে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে কার যেন পা ফেলে চলে আসার শব্দ কানে এল। তা শুনে ওর মনে হল, আগন্তুক যেন এক স্বর্গীয় সত্তা।

তারপর খুব কাছে দেখতে পেলে সেই মূর্তি। চুপিসাড়ে ডাকলে, মেগান। শেয়ে বাড়িয়ে দিলে হাত দুটি। মূর্তি ছুটে এসে একেবারে তার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নিজের বুকের ওপর ওর বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ যখন অ্যাসহারস্ট শুনতে পেলে, তখন গভীরভাবে বুঝতে পারলে প্রেমাবেগের পূর্ণতা। মেগান ত তাব জগতের মানুষ ছিল না ; ও মনে এত সরল, বয়সে এত কাঁচা, আবেগে এত উদ্দাম ও আত্মরক্ষায় উদাসীন যে, এই অন্ধকারের রাজ্যে ওকে রক্ষা করার দায়িত্বও অ্যাসহারস্টেরই। চারিদিকে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মত ও সহজ-সরল, ও যেন এই বসন্ত রাতের এই প্রাণময়ী ফুলবনের একটি অংশ বিশেষ। এই অবস্থায় ও আজ তাকে যা দেবে, কেন সে তা পরিপূর্ণভাবে না গ্রহণ করবে! কেন আজ দুজনের দেহে মনে বসন্তের আবির্ভাবকে সার্থক করে না তুলবে!

এই দুই আবেগের বন্যাধারায় দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হয়ে সে ওকে আরো দৃঢ় করে জড়িয়ে ধরে মাথার চুলে চুমু খেতে লাগল। কতক্ষণ যে এইভাবে দুজনে দাঁড়িয়ে থেকে কাটিয়ে দিয়েছিল, তা সে জানতে পারে নি। এদিকে জলধারা কল্লোল তুলে বহে চলেছিল, পেঁচা ডেকে যাচ্ছিল, আকাশের চাঁদ ক্রমশঃ সাদাটে হয়ে পড়ছিল, চারিদিকে আপেলের মঞ্জরী প্রাণবন্ত সৌন্দর্যে ফুটে ওঠার আশায় প্রতীক্ষা করছিল।

ওদের দুজনের মুখে কোন কথা ছিল না, মধুর খোঁজে একের ঠোঁট কেবলই

কেড়ে নিচ্ছিল অপরের ঠোঁট। কথা শুরু হলেই সব হয়ে যাবে অবাস্তব। বসন্ত ঋতুর মুখে কি কোন ভাষণ আছে? আজ শুধু তার বাতাসে ফিসফিসানি আর গাছের পাতায়-পাতায় মর্মর ধ্বনি।

ডালে ডালে কচি পাতার আবির্ভাবে, শাখায় শাখায় ফুলের পাপড়ি মেলায়, নদী-নালার কল্লোলিত স্রোতধারায় আর চারিদিকে কি যেন এক নিত্য খোঁজার মধুর চঞ্চলতার মধ্যে যে 'না বলা বাণী' থাকে, তা যে বলার চেয়ে অনেক বেশী তাৎপর্যে ভরা!

কখন-কখন বসন্ত আসে প্রাণময়ী মূর্তি ধরে—যেন এক রহস্যময় সত্তা প্রেমিক-প্রেমিকাদের বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাদের অঙ্গে-অঙ্গে মোহময় আঙুল বুলিয়ে দেয়; তার ফলে ঠোঁটে ঠোঁটে আবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকারা শুধু একটি চুম্বন ছাড়া চারপাশের আর সব কিছু ভুলে যায়। যখন তার বুকের ওপর মেগানের বুক ধুকধুক করছিল এবং একের ঠোঁটের ওপর আর একের ঠোঁট কাঁপছিল, সেই অবস্থায় অ্যাসহারস্ট একমাত্র পরম উল্লাস ছাড়া আর কিছু অনুভব করতে পারল না। ভাগ্যের বিধানে যে তার বাহুর বন্ধনে ধরা পড়ার জন্যই মেগানের সৃষ্টি! প্রেমের দেবতাকে কে উপেক্ষা করতে পারে! নিঃশ্বাস নেবার জন্য যখন তাদের ঠোঁটগুলি মুক্ত হল, তখন মাত্র এই বোধ ফিরে এল যে, তারা এক নয়—দুটি আলাদা সত্তা। এর ফলে আসক্তি প্রবলতর হয়ে উঠল, অ্যাসহারস্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবেগে ব্যাকুল হয়ে বললে, ওঃ! মেগান তুমি কেন এলে?

মেয়েটি ওপরের দিকে তাকাল। ও মর্মাহত, বিস্মিত! বললে, স্যার, আপনি যে আমাকে আসতে বলেছিলেন।

—আমাকে 'স্যার' বলে ডেকোনা, তুমি যে আমার ছোট্ট, মিষ্টি মায়াবিনী।

—তাহলে আমি আপনাকে কি বলে ডাকব?

—তুমি আমাকে ফ্রাঙ্ক বলে ডাকবে।

—না, না, তা আমি পারব না।

—কিন্তু তুমি যে আমাকে ভালবাস, মেগান,—বাস না?

—আমি আপনাকে ভাল না বেসে যে থাকতে পারি না। আপনার কাছাকাছি আমি শুধু থাকতে চাই। ব্যাস, তাহলেই সব পাওয়া হবে।

—তাহলেই সব পাওয়া হবে?

প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না এমন নীচু গলায় মেয়েটি ফিসফিস করে বললে, আপনার কাছে থাকতে না পেলে আমি যে মারা যাব।

অ্যাসহারস্টের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সে বললে, তাহলে এস, আমার কাছেই থাক।

—আঃ !

'আঃ' শব্দ শুনে বিস্ময় এবং উল্লাসে উন্মাদনার বশে সে কানে কানে বললে, মেগান, শোন, আমরা লণ্ডনে চলে যাব। আমি তোমাকে জগত সংসার দেখাব, মেগান। প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তোমার সব ভার নেব। তোমার সঙ্গে কখনো জানোয়ারের মতো ব্যবহার করব না।

—তোমার কাছে শুধু থাকতে পেলেই আমার সব পাওয়া হবে।

অ্যাসহারস্ট ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললে, মেগান, কাল আমি টারকী শহরে যাব। কিছু টাকার জোগাড় করব। আর তোমার জন্য কিছু কাপড়-জামা কিনে আনব, যা পরে তুমি সহজভাবে শহর অঞ্চলে যেতে পারবে। তারপর আমরা পালাব। আর লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছলে, তুমি যদি সত্যি আমায় ভালবাস আমরা বিয়ে করব।

সে অনুভব করল, মেয়েটির হাতের সঙ্গে সঙ্গে তার চুলের মধ্যে যেন কাঁপন দেখা দিল। মেয়েটি বললে, না, না, ও আমি করতে পারব না। আমি শুধু তোমার কাছে থাকতে চাই।

প্রেম মাধুর্যের আবেগে মত্ত অ্যাসহারস্ট আধো-আধো স্বরে বলতে লাগল, সে কি! আমিই ত তোমার যোগ্য নই, মেগান। আচ্ছা, তুমি আমাকে কখন ভালবাসতে শুরু করেছিলে ?

—যখন আপনাকে রাস্তায় প্রথম দেখেছিলুম। আপনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর সেই রাত্তিরে ভালবাসায় আমার বুক ভরে ওঠে। কিন্তু সেদিন একবারও ভাবিনি, আপনি আমাকে পেতে চাইবেন।

ও হঠাৎ তার পায়ের পাতায় চুমু দেবার উদ্দেশ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

অ্যাসহারস্টের সারা দেহে আতঙ্কের এক ফালি কাঁপন খেলে গেল। সে ওকে জোর করে তুলে ধরলে, তারপর বুকে চেপে রাখলে। আবেগের প্রবলতায় তার মুখ দিয়ে কথা বার হল না।

ও চুপি সাড়ে আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি আমাকে কেন চুমু দিতে দিলেন না ? আপনি কেন··· ?

—মেগান, আমিই ত তোমার পায়ে চুমু খাব।

ওর মুখে খেলে গেল যে মধুর হাসির টুকরো, তা দেখে তার চোখে জল

উপচে পড়ল। তার বুকের ওপর রাখা, জ্যোৎস্নার আলোয় ভরা ওর মুখখানি আর ওর খোলা ঠোঁট দুটির দিকে লাল রঙের ওপর সৃষ্টি হয়েছিল যেন আপেল মঞ্জরীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য।

একটু পরে ও সহসা ওর বিস্ময়ে-বড়-হওয়া চোখ দুটি দিয়ে অ্যাসহারস্টের পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে; তার হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ও চুপিচুপি বললে, চেয়ে দেখুন,—ওদিকে!

অ্যাসহারস্ট মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলে আর কিছু নয়, শুধু জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল জলস্রোত, হালকা সোনালী রঙে অপরূপ ফার্জলতার কুঞ্জ, বীচ গাছগুলির চাকচিক্য; সবশেষে এদের পেছনে জ্যোৎস্না-পুলকিত পাহাড়টির বহুদূর-ছড়ানো আবছায়া।

সে পেছন থেকে আবার শুনতে পেলে মেগানের আতঙ্ক-জড়ানো গলার ফিসফিসানি, ওই যে, ওই জিপ্‌সী ভূত!

—কোথায়?

—ওই-ত ওইখানে,—পাথরের পাশে গাছগুলোর তলায়।

অ্যাসহারস্ট রাগের মাথায় একলাফে নদীস্রোত পার হয়ে বীচগাছের বনের দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল। আঃ, এত জ্যোৎস্নার মেলা! কোথাও ত কিছু নেই। বিরক্তির জ্বালায় মুখে বকবক করতে করতে, বুকের মধ্যে কতকটা ভয়ের ধুকপুকুনি নিয়ে মাথা-তোলা পাহাড়ের ওপরে ঠোকর খেতে খেতে সে কাঁটাগাছের ঝোপজঙ্গলে ছুটে বেড়াল। অসম্ভব! পাগলামি ছাড়া আর কি! তারপর সে আপেল গাছের তলায় ফিরে এল। কিন্তু এ কি, মেগান ত নেই! ও চলে গেছে। সে কান পেতে শুনতে পেলে শুকনো পাতার মৃদু মর্মর-ধ্বনি, শুয়োর বাচ্চাদের ঘোঁত-ঘোঁতানি আর গেট বন্ধ করার এক টুকরো আওয়াজ। মেগানের বদলে এখানে শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বুড়ো আপেল গাছটি।

সে তার লম্বা লম্বা হাত দুটি সজোরে ছুঁড়ে আপেল গাছের গুঁড়িটি জড়িয়ে ধরলে। মেগানের কোমল মধুর স্পর্শের পরিবর্তে একি কঠিনের আলিঙ্গন। তার মুখের ওপর গাছের খসখসে শ্যাওলা লেগেছিল। মেগানের তুলতুলে গাল দুটির বদলে একি কদর্যতা! কেবল বনের গন্ধটি যেন ওরই গায়ের গন্ধ। আর তার মাথার ওপরে, আশে-পাশে আপেল মঞ্জরীর দল যেন আগের চেয়ে আরো প্রাণোজ্জ্বল, আরো জ্যোৎস্না-সুন্দর হয়ে বাতাসের দোলায় দুলছে।

॥ সাত ॥

অ্যাসহারস্ট টরকী স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে সামনের পথে অনিশ্চিতভাবে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। কারণ, ইংলণ্ডের জলসরবরাহকারী কেন্দ্রগুলির মধ্যে মহাকেন্দ্র এই শহরটি তার অপরিচিত ছিল। তার গায়ের জামা-কাপড় সম্বন্ধে তার বিশেষ হুঁশ ছিল না। সে শহরবাসীদের চোখে যে একজন নতুন, অদ্ভুত আগন্তুক হিসেবে আকৃষ্ট হচ্ছে, তা বুঝতে পারে নি। তার গায়ে ছিল মোটা নরফোক কোট, পায়ে ধুলোভরা বুটজুতো, মাথায় পুরনো টুপি, এমনি পোশাকে সে পায়চারি করছিল। তার চোখে পড়েনি যে, পথ-চলা লোকেরা অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে। সে শহরের মধ্যে লণ্ডন ব্যাঙ্কের শাখা দপ্তরের খোঁজ করছিল। যখন খোঁজ পাওয়া গেল, তখন আবার তাকে আর এক বাধার সম্মুখীন হতে হল। টরকী শহরের কারোকে সে কি চেনে?

—না।

সে যদি তার লণ্ডন ব্যাঙ্কের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে উত্তর আনিয়ে দিতে পারে, তাহলে স্থানীয় ব্যাঙ্কের লোকেরা খুশির সঙ্গে তার কাজ করিয়ে দিতে পারবে। বাস্তব জগতের এই সংশয়ভরা পরিমণ্ডলে তার মনের স্বপ্নময়তা ম্লান হয়ে পড়ল। তবু সে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলে।

ব্যাঙ্ক-বাড়ির প্রায় উল্টোদিকে মেয়েদের জামা-কাপড়ের একটি দোকান তার চোখে পড়ল। সে জানালায় লাগানো শো-কেসগুলো অদ্ভুত এক আবেগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগল। গ্রাম্য প্রণয়িনীর উপযুক্ত বেশভূষা পছন্দ করার কাজটা তার পক্ষে একটু বিরক্তিকর বোধ হল। সে দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ল। একজন তরুণী এগিয়ে এল। তার চোখ দুটি নীল এবং কপালে ভাবনার হালকা রেখা। অ্যাসহারস্ট কোন কথা না বলে তার দিকে তাকালে।

—বলুন, স্যার।

—একজন তরুণী মেয়ের জন্য পোশাক চাই।

দোকানের তরুণীটি একফালি হাসলে।

অ্যাসহারস্ট তা দেখে ভ্রূ কোঁচকালে, তার অনুরোধ করার অদ্ভুত ধরন সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠল। মেয়েটি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, কি স্টাইল আপনার পছন্দ? আধুনিক ফ্যাশানের কিছু?

—না, না। এই সাদাসিধে ধরনের আর-কি।

—মেয়েটির মাপ কি রকম?

—ঠিক-ঠিক জানি না। তবে হাঁ, আমার বলা উচিত, এই আপনার চেয়ে দু-ইঞ্চি বেঁটে হবে আর-কি।

—তার কোমরের মাপ কি আমাকে দিতে পারবেন?

অ্যাসহারস্ট আনমনা হয়ে ভাবলে, মেগানের কোমরের মাপ! তারপর বললে, ওহো, এই সাধারণ স্ট্যানডারড মাপ।

—আচ্ছা, বেশ।

তরুণীটি ভিতরে চলে গেলে সে একটি শো-কেসের মধ্যে নানা মডেলের পোশাকের দিকে চোখ ফেলতে ফেলতে অশান্ত মনে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হল, মেগানকে—তার ভালবাসার ধন মেগানকে—এখন সচরাচর যে পোশাক পরে থাকতে দেখা যায়, তা ছাড়া, অন্য পোশাকে কি ওকে মানাবে? ইতিমধ্যে তরুণীটি হাতের ওপরে কতকগুলি পোশাক সাজিয়ে নিয়ে ফিরে এল। তারপর একে একে সেগুলো দেখাতে লাগল। ঘুঘু-রঙা একটি পোশাকের রঙ অ্যাসহারস্টের ভাল লাগল। কিন্তু সে পোশাকে মেগানকে কেমন দেখাবে—তা কল্পনা করতে পারলে না। তরুণী আবার ভেতরে চলে গিয়ে আরো কতকগুলি পোশাক আনলে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার মনে জেগে উঠেছিল একটা বিহ্বলতার ভাব। কি করে মানান-সই জিনিসটা পছন্দ করা যায়! আবার শুধু পোশাক ত নয়, আরো চাই একটা টুপি, একজোড়া জুতো, একজোড়া দস্তানা।

ও ভাবলে, আচ্ছা, যে পোশাক এখন মেগান পরে, সেই পোশাক পরিয়ে ট্রেনে নিয়ে যেতে দোষ কি?—আঃ, তা কি হয়? ও পোশাক গায়ে থাকলে সহজে ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে! তার ফলে হাঙ্গামা বাঁধবার সম্ভাবনা থাকবে বেশী। গোপনে পালিয়ে যাওয়া ত সবদিক থেকে গুরুতর ব্যাপার! অ্যাসহারস্ট সামনে-দাঁড়িয়ে-থাকা তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলে, ইনি কি আমাদের ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছেন এবং আমাকে শয়তান ভাবছেন,—কে জানে?

ও শেষকালে বেপরোয়া ভাবে বললে, আপনি কি ওই ধূসর রঙের পোশাকটা আমার জন্য আলাদা করে রেখে দেবেন? আমি এখনি মন স্থির করতে পারছি না। আজ বিকালে আবার আসব।

তরুণীটি ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে, তারপর বললে, বেশ, আসবেন। তবে এটা খুবই পছন্দসই পোশাক। আমার বিশ্বাস, আপনার যা প্রয়োজন তার উপযুক্ত এর চেয়ে ভাল কিছু বাজারে পাবেন না।

—আমারও তাই মনে হয়।

অ্যাসহারস্ট এই কথা মৃদুস্বরে বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এল।

বাস্তব জগতে সংশয়ের পরিমণ্ডল থেকে মুক্তি পেয়ে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, তারপর তার স্বপ্নের জগতে পুনরায় ডুবে গেল।

একান্ত বিশ্বাসবশে যে সুন্দরী মেয়েটি তার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে, কল্পনায় তার মূর্তি দেখতে পেলে। কল্পনায় ভেসে উঠল আরো এক মধুর ছবি। সে নিজে আর মেগান দুজনে রাত্তিরে চুপিচুপি বাইরে এসে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশের নীচেয় মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, সে নিজের হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ওর নতুন বেশভূষাগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে কোন্ এক দূরের বনের প্রান্তে ভোরবেলা মেগান ওর অঙ্গ থেকে পুরোতন পোশাক ছেড়ে ফেলে এই নতুনগুলো পরবে; তারপর খুব সকালের কোন এক ট্রেনে চড়ে দূরের একটি স্টেশনে 'হনি-মুন'-বাস শেষ করে, ওরা লণ্ডনে ফিরে বিরাট জনারণ্যে মিলিয়ে যাবে। এইভাবে তার ভালবাসার স্বপ্নগুলো একে একে সফল হয়ে উঠবে।

—ওহে ফ্রাঙ্ক অ্যাসহারস্ট, ব্যাপার কি?—রাগবির পরে তোমাকে কতদিন দেখিনি বলত, বন্ধু।

অ্যাসহারস্টের মুখে বিরক্তি-ভরা রেখা মিলিয়ে গেল। ওর মুখের সঙ্গে নতুন লোকটির মুখের বেশ মিল ছিল, রোদে-পোড়া নীল চোখ। ও জবাব দিলে, আরে, আরে, এ যে ফিল হ্যালিডে!

—এখানে তুমি কি করছ?

—ওঃ বিশেষ কিছু না। চারপাশটা ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। কিছু টাকা সংগ্রহ করার চেষ্টায় রয়েছি। আমি পাশের ডাঙা অঞ্চলে কয়েকটা দিন কাটাচ্ছি।

—তুমি কি লাঞ্চ খাবার জন্যে ইতিমধ্যে কোথাও ঠিক করেছ? না করে থাক, এস আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে। আমার সঙ্গে এখানে এসেছে আমার ছোট বোনেরা। তাদের হাম হয়েছিল।

বন্ধুর জড়ানো হাতের বাঁধনে বাঁধা পড়ে অ্যাসহারস্ট পথ ধরে এগিয়ে চলল,—একে একে একটা পাহাড়ের চূড়ো পার হয়ে তারপর একটা পাহাড়তলির মধ্য দিয়ে শহরের শেষ প্রান্ত পার হয়ে এল, হ্যালিডের মুখ যেমন রোদের মতন খুশি-ভরা, তেমনি তার আদর্শবাদী মনের মধুর কথাগুলো এসে বন্ধুর কানে বাজছিল। হ্যালিডে বলছিল, এই অঞ্চলে একমাত্র নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে স্নান করা আর বাচখেলা।

হঠাৎ ওরা এসে পৌছল সমুদ্রের পেছনে একটু উঁচু জমিতে তৈরী করা এক সারি বাড়ির কাছে—এদের একটিতে ছিল হোটেল। ওরা সেই হোটেলে গিয়ে ঢুকল।

—আমার কামরায় এসে স্নান করে নাও। এখনই লাঞ্চের ডাক পড়বে।

অ্যাসহারস্ট সামনের আয়নায় নিজের মুখখানা দেখতে দেখতে ভাবতে লাগল। ফার্ম-হাউসে ওর শোবার ঘরে আছে একমাত্র চিরুণী, দু সপ্তাহের পরা একটা কামিজ, আর এই ঘরে কাপড-জামা, ব্রাশ-চিরুণী ঝকমক করছে! সে ভাবলে, কি আশ্চর্য মানুষ জাত, মোটে ভেবে দেখে না—। কিন্তু কি যে ভেবে দেখে না—তা সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

যখন স্নানের পর বন্ধু হ্যালিডের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার জন্য বসবার ঘরে এসে বসল, তখন বন্ধু বললে, এই আমাদের ফ্রাঙ্ক অ্যাসহারস্ট।

তিনজন কমবয়সী বোন—খুব সুন্দরী নীল-নয়না হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখলে।

দুজন ত সত্যিই খুব কম বয়সী ছিল,—মাত্র এগার আর দশ। তৃতীয় জনের বয়স হয়ত সতেরো, লম্বা, সুশ্রী মাথার চুল, মুখে রোদ পডার ফলে হালকা লাল আর সাদা রঙে অপরূপ হয়ে উঠেছিল গালদুটি, মাথাব চুলের চেয়ে কালো রঙের ভ্রূ নাকের চেয়ে একটু ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দাদার মত তিন বোনেরই গলার স্বর ছিল উঁচু, ডগমগে-খুশি-ভরা। ওরা সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বেশ জোরের সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করলে, তারপর তাড়াতাড়ি বসে পড়ে বিকালে কি কি করা হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। এ যেন রীতিমত ডায়না আর তার সখীরা। ক্ষেতি বাড়িতে এক নাগাড়ে এতদিন থাকার পর এই ছোট ছোট কথাবার্তা, এই শান্ত, শিষ্ট, অকৃত্রিম ভদ্রতাকে প্রথমে মনে হল নিতান্ত অদ্ভুত; তারপর কিছুক্ষণ পরে এত স্বাভাবিক লাগল যে, যে-পরিমণ্ডল থেকে ও এসেছিল, তা যেন খুব দূরের এক অভিজ্ঞতা বলে বোধ হতে শুরু হল। ছোট দুজনের নাম ছিল সাবিনা আর ফ্রেডা; বড়র নাম স্টেলা।

সাবিনা হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করে উঠল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে আসবেন? কি ভয়ানক যে মজা,—তা কি বলব!

এই অপ্রত্যাশিত অন্তরঙ্গতার সুরে অভিভূত হয়ে অ্যাসহারস্ট মৃদু স্বরে বললে, আমাকে যে আজ বিকালেই ফিরে যেতে হবে!

সাবিনা নিরুৎসাহ হল, বললে, ওঃ!

স্টেলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি আজ ফিরে যাওয়া বন্ধ রাখতে পারেন না ?

অ্যাসহারস্ট স্টেলার প্রশ্ন শুনে তার দিকে তাকিয়ে একফালি হেসে মাথা নাড়লে। তার মনে হল, ও সত্যিই সুন্দরী !

সাবিনা দুঃখের সঙ্গে জানালে, আপনি কিন্তু পারেন।

তারপর ওদের কথাবার্তা গুহা ও সাঁতার-কাটা প্রসঙ্গে চলে গেল।

—আপনি কি অনেকদূর সাঁতার কাটতে পারেন ?

—প্রায় দু মাইল পর্যন্ত যেতে পারি।

—ওঃ !

—কি মজার কথা !

তিন জোড়া নীল চোখ তার দিকে তাকিয়ে রইল। এদের তার প্রতি নতুন আকর্ষণের বিষয়ে অ্যাসহারস্ট বেশ সচেতন হয়ে উঠল। তার মন নিজেকে বললে, এই উত্তেজনাটা মন্দ কি !

এমন সময়ে হ্যালিডে বললে, দেখো ফ্রাঙ্ক, আমি বলছি, তুমি কোন রকম আপত্তি না করে তোমার ফিরে যাওয়াটা আজ স্থগিত রাখবে এবং স্নান করতে যাবে।

—হাঁ, আপনাকে তাই করতে হবে।

কিন্তু অ্যাসহারস্ট হেসে পুনরায় মাথা নাড়লে। তারপর হঠাৎ নিজের নানা দৈহিক কীর্তির কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে গেল। কলেজে পড়ার সময় সে ত নৌকা বাইত, ফুটবল খেলত, এক মাইলের দৌড়ে বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন টেবিল থেকে উঠে পড়ল, তখন অপরদের কাছে মনে হল, যেন সে একজন দস্তুরমত 'হিরো'। ছোট মেয়ে দুটি ওদের গুহা দেখতে যাবার জন্য তার হাত ধরে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। সে রাজী হলে ওরা বকবক করে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল; পরের সারিতে অ্যাসহারস্ট আর একটু পিছনে স্টেলা ও হ্যালিডে। স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রধান জিনিস ছিল একটি 'পুল', যার জলের মধ্যে হয়ত ছোট ছোট এমন প্রাণী ছিল, যা ধরে বোতলে পুরে ফেলা যেত। সাবিনা আর ফ্রেডার সুন্দর, সুঠাম পায়ে মোজা পরা ছিল না। ওরা সোজা পুলের মধ্যে নেমে অ্যাসহারস্টকে ডাকলে, ওদের সঙ্গে জল ছেঁচে ফেলার কাজে সাহায্য করার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগল। শেষে সেও জুতো মোজা খুলে জলে নেমে পড়ল।

ও শিল্পী মনের মানুষ। পুলের জলের মধ্যে দুজন শিশু আর তীরের ওপর একজন তরুণী সুন্দরী যদি অনবরত ওর মাছ ধরার তারিফ করতে থাকে, তাহলে ওর মত মানুষের সময়জ্ঞান থাকতে পারে না। অবশ্য, সময় সম্বন্ধে ও কখনই বিশেষ হুঁশিয়ার ছিল না। ফলে অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর ও যখন ঘড়ি দেখলে, তখন তিনটে বেজে গেছে। সেদিন আর চেক ভাঙাবার সম্ভাবনা নেই! ব্যাঙ্কে পৌছবার আগেই ত অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। তার মুখের ওপর দুর্ভাবনার ছায়া দেখে ছোট মেয়ে দুটি খুশিতে চিৎকার করে উঠল, বাঃ, বাঃ, কি মজা! আজ রাতটা এখানে আপনাকে থাকতেই হবে!

অ্যাসহারস্ট কোন উত্তর দিলে না। আবার তার মনে ভেসে উঠল মেগানের মুখখানা। সকালে চা খাবার সময় সে ওর কানে কানে জানিয়েছিল, আমি টরকী শহরে সবকিছু কিনে আনতে যাচ্ছি। আজ সন্ধ্যার সময় ফিরে আসব। যদি সবদিক ঠিক থাকে, তাহলে আজ রাত্রেই যাত্রা করা যাবে। তুমি প্রস্তুত থেকো। তার এই কথা শুনে ও কিভাবে কেঁপে উঠেছিল আর শেষ পর্যন্ত তা কত নিবিষ্ট মনে শুনছিল—সেই দৃশ্য কল্পনায় দেখতে পেলে। হায়—, আজ রাত্রে আমাকে দেখতে না পেলে ও কি ভাববে,—ওর কি দশা হবে!

কিছুক্ষণ পরে আবার নিজেকে একটু চাঙ্গা করে তুলতেই সে নতুন সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। পুলের মধ্যে তার পাশে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে ছোট মেয়েটি, ওর মুখে ফুটে উঠেছে অ্যাসহারস্টের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। আর তীরের ওপর দেবী ডায়ানার মত অপর-একজন দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী তরুণী অনবরত নীল চোখ ফেলে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখছে। ছিঃ-ছিঃ, যদি এরা তার মনের গোপন কথাগুলো জেনে ফেলত,—যদি জানতে পারত যে, আজই রাতের বেলা সম্বন্ধে সে পরিকল্পনা করে রেখেছিল—। তাহলে এরা নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্পর্শ ত্যাগ করে চলে যেত! যাহোক রাগ, বিরক্তি এবং লজ্জা একসঙ্গে বুকে নিয়ে সে ছোট ঘড়িটা পকেটের মধ্যে রেখে দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল, হাঁ, শেষ পর্যন্ত আজ আমি তোমাদের কাছেই আটকে পড়লুম।

—বাঃ, বাঃ, তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে স্নান করতে যেতে পারবেন।

স্টেলার ঠোঁটের ওপর ফুটে-ওঠা একফালি হাসি বা এই শিশু দুটির ঐকান্তিক আগ্রহের কাছে পরাজয় স্বীকার না করে থাকা অসম্ভব! ইতিমধ্যে হ্যালিডে বলে

উঠল, বহুত আচ্ছা, বন্ধু, বহুত আচ্ছা'। আমি তোমাকে দরকারী জিনিসপত্র ধার দিতে পারব। ভয় নেই।

কিন্তু ফিরে যাবার জন্য আগ্রহের একটা প্রচণ্ড আবেগ এবং না যেতে পারার চরম বিষণ্নতা আবার তার বুক তোলপাড় করে তুললে। সে ভাবের ঘোরে বললে, আমাকে যে একটা টেলিগ্রাম করতেই হবে।

শেষে পুলের আকর্ষণ ত্যাগ করে সকলে হোটেলে ফিরে গেল। অ্যাসহারস্ট মিসেস নারাকোমের নামে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলে : 'দুঃখিত, আজ রাতের মত আটকে পড়েছি, আগামীকাল ফিরে যাব।' সে ভাবলে, মেগান নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, কাজের চাপে তার ফেরা হল না। এরপর তার বুকের উদ্বেগ কিছু কমল।

সেদিন বিকালটা ছিল বড় চমৎকার। ঠাণ্ডা কম, নীল সমুদ্র শান্ত। আর, সাঁতার কাটা ত তার অতি-প্রিয় শখ। একে ত হাসিখুশী শিশুদুটির আগ্রহ তার মন ভুলিয়েছিল। তার ওপর স্টেলার দিকে তাকিয়ে দেখার পুলক আর হ্যালিডের আনন্দময় সঙ্গ! কিছু পরিমাণ অবাস্তব হলেও এই সবকিছুই চরম স্বাভাবিকতা! মেগানের সঙ্গে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে শেষবারের এই যে পরিচিত জীবনের পাত্র থেকে সহজ আনন্দ-ভোগ! মন্দ কি এই সব অভিজ্ঞতা!

সে ধার-করা স্নানের পোশাক নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। একটা পাহাড়ের আড়ালে হ্যালিডে এবং সে জামাকাপড় ছাড়লে। তিন বোন আর একটা পাহাড়ের আড়ালে। অ্যাসহারস্টই প্রথম জলে নামল, সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কেটে সমুদ্রের বুকে অনেকটা এগিয়ে গেল—তার নিজের মুখে ঘোষণা করা দক্ষতার সঙ্গে। যখন সে পিছনে ফিরে তাকালে, দেখতে পেলে, হ্যালিডে তীরের কাছাকাছি থেকে সাঁতার দিচ্ছে, আর মেয়েরা তীরের কাছাকাছি থেকে ছোট ছোট ঢেউয়ের বুকে ডুব দিচ্ছে, ধুপধাপ করে হাত-পা ছুঁড়ে জলখেলা করছে। আগে এসব দৃশ্য দেখলে তার বিশ্রী লাগত, কিন্তু আজ এদের বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক বলে বোধ হল। তীরের দিকে ফিরে আসতে আসতে সে ভাবলে, মেয়েদের জল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলায় ওর মত একজন অপরিচিত লোক যদি যোগ দেয়, তা ওরা পছন্দ করবে কিনা! বিশেষতঃ তন্বী-তরুণী স্টেলার কাছে আসতে তার লজ্জা হতে লাগল। এমন সময় সাবিনা ওকে জলে ভেসে থাকা শেখাবার জন্য ডাক দিলে। তারপর থেকে ছোট মেয়ে দুটি তাকে নানা অছিলায় এমন

ব্যস্ত রাখলে যে, স্টেলা কি করছে—তা তাকিয়ে দেখার সময় পর্যন্ত পেলে না। হঠাৎ এক সময়ে স্টেলার চিৎকার শুনে সে চমকে উঠল। পেছন ফিরে দেখতে পেলে, কোমর পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে স্টেলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখ ঝুঁকিয়ে পাতলা, ধবধবে হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে তাকে উদ্দেশ করে বলছে, এই যে, ফিলের দিকে চেয়ে দেখুন! ওর কি কিছু হয়েছে, না, ঠিক আছে? ওঃ হো, এদিকে একবার দেখুন না।

অ্যাসহারস্ট তাকিয়ে দেখেই বুঝতে পারলে, ফিল প্রায় একশ গজ দূরে ডুবে যাচ্ছে। একবার মুখ তুলে দুহাতে জল ছুঁড়ে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে আবার ডুব দিলে। চকিতে সে একটা চিৎকার করে হাত দুটো উঁচু করে ধরে সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল। স্টেলাকে তার পেছনে পেছনে আসতে দেখে বলে উঠল, স্টেলা, তুমি ফিরে যাও, ফিরে যাও। সে এত জোরে আর কখনো সাঁতার কাটেনি, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বন্ধুর কাছে পৌঁছে গেল। ঠিক সেই সময়ে ফিল দ্বিতীয়বার জলের ওপরে মাথা তুললে। তখন ওর শরীরের খেঁচুনি শুরু হয়ে গেছে। তবে ওকে টেনে নিয়ে এসে তীরে তোলা দুঃসাধ্য ছিল না। অ্যাসহারস্ট স্টেলাকে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল, ও সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে যখন ফিলকে টানতে টানতে তার বুক জলের কাছে এনে উপস্থিত হল, তখন স্টেলা যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করতে লাগল। তারপর তীরে উঠে এলে দুজনে দুপাশে বসে ফিলের হাত পা টিপে দিতে লাগল। ভয়ার্ত অপর দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যে অনড় হ্যালিডের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে বললে, ছিঃ-ছিঃ, কি বিশ্রী ব্যাপার! ফ্রাঙ্ক, তোমার হাতটা আমায় ধরতে দাও, তাহলে উঠে ঠিকভাবে কাপড়জামা পরে নিতে পারব।

অ্যাসহারস্ট হাত বাড়িয়ে দিলে, সে সময়ে অজান্তে চোখ পড়ল স্টেলার দিকে। ওর শান্ত মুখখানা কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছিল। সে ভাবলে, আমি যখন ওকে স্টেলা বলে ডেকেছিলুম, ও কিছু মনে করেছে কিনা—কে জানে!

যখন মেয়েরা পোশাক পরছিল, হ্যালিডে শান্তভাবে বললে, বন্ধু, তুমি আজ আমার প্রাণ রক্ষা করলে।

বন্ধু উত্তর দিলে, বাজে বকো না, বুঝলে?

পোশাক বদলানো হয়ে গেল, তবু স্টেলাদের মন তখনো স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে নি, এমনি অবস্থায় ওরা সকলে মিলে হোটেলে গিয়ে চা খেতে বসল। শুধু হ্যালিডে ওর ঘরের মধ্যে বিছানার ওপর শুয়ে রইল।

কয়েক পিস রুটি আর জ্যাম খাবার পর সাবিনা বললে, আমি বলছি, তুমি একজন মহাপুরুষ।

ফ্রেডা সেই স্বরে স্বর মিলিয়ে বললে, খুব সত্যি কথা!

অ্যাসহারস্ট দেখতে পেলে স্টেলা নীচের দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে রয়েছে। সে বিহ্বল হয়ে উঠে পড়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে শুনতে পেলে, সাবিনা আস্তে আস্তে বলছে যে, আমি বলি কি, রক্ত অক্ষরে লিখে সম্পর্কের শপথ নেওয়া হোক। ফ্রেডা, তোমার ছুরিটা কোথায়?

তারপর সে আড়চোখে দেখতে পেলে, তিন বোন হলপ করে এক এক ফোঁটা রক্ত বার করে একটুকরো কাগজের ওপর রাখলে। সে ফিরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

—পালাবেন না। ফিরে আসুন।

এই বলে ছোট মেয়ে দুটি তার হাতের মধ্যে নিজেদের হাত জড়িয়ে তাকে বন্দী করে পুনরায় চায়ের টেবিলে ফিরিয়ে আনলে। টেবিলের ওপর রাখা একটুকরো কাগজে প্রতিমূর্তি এঁকে রক্তাক্ষরে তিনটি নাম লেখা ছিল, স্টেলা হ্যালিডে, সাবিনা হ্যালিডে এবং ফ্রেডা হ্যালিডে। সাবিনা বললে, এই নিন, আপনি ত জানেন, রীতি অনুযায়ী এখন আপনাকে আমাদের চুমু দেওয়া দরকার।

ফ্রেডা ওর কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, ওহো, হাঁ, তাই ত।

অ্যাসহারস্ট পালাবার চেষ্টা করবার আগেই কতকগুলো ভিজে চুল তার মুখের ওপর এসে পড়ল, নাকের ওপর একটা কামড়ের স্পর্শ পৌঁছল। সে অনুভব করলে, তার বাঁ হাতে একটা চিমটি কাটার সঙ্গেসঙ্গে আর-একজনের নরম ঠোঁট দুটি তার গালে ছোঁয়া দেবার চেষ্টা করছে। এরপর সে মুক্তি পেলে। তখন ফ্রেডা বললে, এবার স্টেলার পালা।

অ্যাসহারস্ট লজ্জায় লাল আর কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে টেবিলের বিপরীত দিকে স্টেলাকে দেখতে পেলে, তারও মুখখানি লজ্জায় লাল আর কঠিন হয়ে উঠেছিল।

সাবিনা ফিকফিক করে হাসছিল। ফ্রেডা চিৎকার করে বললে, জলদি কর, স্টেলা, সবকিছু যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

একটা অজানা লজ্জানত আগ্রহ অ্যাসহারস্টের বুকে জেগে উঠল। সে শান্তভাবে বললে, ছোট্ট পেত্নীরা, চুপ করো।

সাবিনা আবার হেসে ফেললে, বললে, আচ্ছা, আর একটা কাজ করা যেতে পারে। স্টেলা নিজের হাতে চুমু খাবে, আর আপনি আপনার নাকে সেই হাত ঠেকাবেন। অবশ্য, এটা হবে এক পক্ষের কাজ।

সে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে, স্টেলা নিজের হাতে চুমু দিয়ে হাতখানি তার দিকে বাড়িয়ে দিলে। তখন সে সযত্নে স্টেলার পাতলা ঠাণ্ডা হাতখানি তার গালে ছোঁয়ালে। ছোট মেয়েদুটি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। ফ্রেডা বললে, তাহলে, এটা পাকা কথা হল যে, এবার আপনার জীবন আমাদের রক্ষা করতে হবে। স্টেলা, আর এক কাপ চা আমাকে দেবে? তবে আগের মত বিশ্রী জলো চা করো না যেন।

আবার চা খাওয়া আরম্ভ হল। অ্যাসহারস্ট কাগজখানি ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে দিলে। কথাবার্তা শুরু হল—সংক্রামক রোগ, কমলালেবু, চামচে করে মধু খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে। অ্যাসহারস্ট চুপ করে বসে সব শুনতে লাগল, মাঝে মাঝে স্টেলার চোখের সঙ্গে তার চোখের বন্ধুত্বে-মধুর দৃষ্টি বিনিময় হতে লাগল। ইতিমধ্যে স্টেলার মুখে পুনরায় স্বাভাবিক রঙ ফিরে এসেছিল।

এই হাসিখুশী পরিবারের লোকেদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় অ্যাসহারস্টের মন আবেগে ভরে উঠছিল। আর মেয়েগুলির মুখের দিকে চোখ ফেলে দেখার মধ্যে একটা আকর্ষণ অনুভব করছিল। চা খাওয়া শেষ হলে সে জানালার ধারে চেয়ারে বসে স্টেলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলে এবং ওর আঁকা জলরঙা ছবি দেখতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে একটা সুখময় স্বপ্নের মত মনে হল। সময়ের বোধ এবং হাতের কাজ, প্রয়োজনের তাগিদ এবং বাস্তবের চেতনা—সবকিছু স্থগিত হয়ে রইল। পরের দিন নিশ্চয়ই সে মেগানের কাছে ফিরে যাবে; তখন এসব কিছুরই সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। শুধু তার পকেটে থাকবে তিনটি মেয়ের হাতের রক্ত-লেখা এক টুকরো কাগজ। আহা, এরা ত শিশুর দল। স্টেলা এখনও মেগানের মত তেমন বড়সড় হয় নি।

অ্যাসহারস্ট বেশী সময় চুপ করে থাকছিল। সেই ফাঁকে স্টেলার লজ্জা-নম্র অথচ বন্ধুত্বে-মধুর কথাবার্তা বেশ জমে উঠছিল। এদিকে ওর চারিদিকে ছিল একটা শান্ত, পবিত্র ভাব—ও যেন ফুলের কুঞ্জে একজন কুমারী মেয়ে।

রাতের খাবার সময় হ্যালিডে খেতে এল না। ও ডুবে যেতে যেতে অনেক সমুদ্রের জল খেয়ে ফেলেছিল। এক সময় ডিনার খেতে খেতে সাবিনা বললে, আমি আপনাকে ফ্রাঙ্ক বলে ডাকব।

ফ্রেডা সঙ্গেসঙ্গে প্রতিধ্বনি করে বললে, ফ্রাঙ্ক, ফ্রাঙ্ক, ফ্রাঙ্কি !

অ্যাসহারস্ট একটু ভ্রূকুটি করে ঘাড় নাড়লে ।

—এবার থেকে স্টেলা যতবার আপনাকে মিঃ অ্যাসহারস্ট বলে ডাকবে, ততবার ওকে ফাইন দিতে হবে। মিঃ অ্যাসহারস্ট বলে ডাকাটা খুব বিশ্রী শোনায় । নয় কি ?

অ্যাসহারস্ট স্টেলার দিকে তাকালে ; ওর মুখখানা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছিল । সাবিনা ফিকফিক করে হাসতে লাগল । ফ্রেডা চেঁচিয়ে বললে, ওঃ, ও যে ধোঁয়া ছাড়ছে ।

অ্যাসহারস্ট ডাইনে বাঁয়ে হাত চালিয়ে ছোট মেয়ে দুটোর একমুঠো করে সুন্দর চুল পাকড়ে ধরলে । তারপর বললে, দেখ, তোমরা দুজন দুষ্টু মেয়ে ! স্টেলাকে একলা রেখে এখান থেকে পালাও, না হলে আমি তোমাদের দুজনের চুলের মুঠি একসঙ্গে বেঁধে দেব ।

ফ্রেডা গলগল শব্দ করে বললে, আপনি দেখছি যেন একটা পশু !

সাবিনা হুঁশিয়ার হয়ে আস্তেআস্তে বললে, বাঃ-বাঃ, আপনি কিন্তু ওকে স্টেলা বলে ডেকে ফেলেছেন ।

—কেন ডাকব না, শুনি । নামটা যে ওর চমৎকার ।

—বেশ, বেশ । তাহলে আমরাও স্টেলাকে নাম ধরে ডাকবার অনুমতি আপনাকে দিচ্ছি ।

অ্যাসহারস্ট চুলের মুঠি ছেড়ে দিলে । তারপর ভাবলে, স্টেলা ! আচ্ছা, দেখা যাক, এবার ও আমাকে কি বলে ডাকে !

কিন্তু স্টেলা ওকে মোটে একবারও ডাকলে না ।

যখন শুতে যাবার সময় হল, ও তখন সুযোগ পেয়ে ইচ্ছে করেই নাম ধরে বললে, শুভ রাত্রি, স্টেলা ।

স্টেলা ইতস্ততঃ করে উত্তর দিলে, শুভরাত্রি মিঃ—, শুভরাত্রি ফ্রাঙ্ক ।

'হ্যাণ্ডসেক' করতে গিয়ে স্টেলার হাতখানি হঠাৎ সোজা শক্ত হয়ে উঠল এবং পর মুহূর্তেই আবার নরম হয়ে গেল ।

অ্যাসহারস্ট ওকে বিদায় দেবার পর শূন্য বসবার ঘরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

মাত্র গত রাত্রে আপেল গাছের জীবন্ত মঞ্জরীর নীচেয় সে মেগানকে জড়িয়ে ধরে ওর চোখে আর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল । তার বুকের মধ্যে স্মৃতির দুঃসহ

বন্যার আবেগ উপছে উঠল। সে শুধু চেয়েছিল তার সঙ্গে থাকবার অধিকার, ওকে নিয়ে ত তার নতুন জীবন আজ রাত্রে শুরু হওয়া উচিত ছিল! অথচ এখন এক-এক করে চব্বিশ ঘণ্টা বা কিছু বেশী সময় পার হয়ে গেছে! এই নির্দোষ পরিবারের সংস্পর্শে এসে কেন সে বন্ধুত্বের বাঁধন পরলে—যখন আর একটি নির্দোষ, সরলা মেয়ের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিতে তাকে বাধ্য হতে হচ্ছে!—শেষে সে নিজের মনে এই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে যে, এখানে যাই হোক না কেন, আমি ত ওকেই বিয়ে করতে চাই; সেই কথা ত ওকে বলে এসেছি।

একটা বাতি জ্বেলে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে যাত্রা করলে। পাশেই ছিল হ্যালিডের ঘর। যেতে যেতে বন্ধুর গলার ডাক শুনতে পেলে, কে যায়? বন্ধু, তুমি যাচ্ছ ত? আমি বলি, একবার আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়।

হ্যালিডে হঠাৎ শুরু করলে, জানো, আজকের বিকেল বেলার ব্যাপারটা ভাবছিলুম। ওরা বলছিল, তোমার অতীতের সব গল্প বল, আমরা শুনি। আমি বলি নি।

—কি সম্বন্ধে তুমি ভাবছিলে?

হ্যালিডে একটু চুপচাপ থেকে তারপর বললে, আমি একটা জিনিসের কথা ভাবছিলুম, অদ্ভুত অবশ্য। কেমব্রিজের একটি মেয়ে, যাকে আমি—যাকগে তার গল্প! আমি খুশী যে আমার মনের মধ্যে সে বিশেষ স্থান পায় নি! তবে যাই বল, বন্ধু, আমি যে এখানে এখন বসে আছি, সে তোমার অনুগ্রহের জন্যে। নাহলে এখন আমি বিরাট অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে থাকতুম! তুমি কি মনে কর? তবে এসব ভাবনা বড় অবসাদজনক।—আচ্ছা, আমি আশাকরি, আমার ছোট বোনেরা তোমার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করছে।

—ওঃ, ওরা ভীষণ ভাল ব্যবহার করছে।

হ্যালিডে ওর মুখের পাইপ নামিয়ে ঘাড় জানালার দিকে ফেরালে, তারপর শুয়ে পড়ে বললে, ওরা দুষ্টু নয়। সত্যি, ওরা খুব ভাল।

শোয়া অবস্থায় বন্ধুর দিকে হঠাৎ অ্যাসহারস্টের চোখ পড়ল। বন্ধুর মুখে হাসি ছিল, তার ওপর বাতির আলো পড়েছিল। সেই দৃশ্য দেখে তার বুক কেঁপে উঠল। ভাবলে, ও যা বলেছে, খুব সত্যি কথা। ও এখানে শুয়ে থাকত বটে, তবে মুখের ওপর এই হাসি থাকত না; চেহারার উজ্জ্বলতাও চিরদিনের জন্য লোপ পেত। হয়ত এখানে শুয়ে থাকতেও হত না, এতক্ষণ সমুদ্রের তলায় বালির রাশির মধ্যে আটকে পড়ে থাকত—পুনরুত্থানের অপেক্ষায়! নবম দিনে

না করে কি জানি ? তার মনে হল, হ্যালিডের মুখে যে হাসি এখন ফুটে রয়েছে, তা যেন এক চমৎকার বস্তু, —এর মধ্যেই যেন পাওয়া যাচ্ছে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর চরম পার্থক্যের পরিচয়। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে নরম স্বরে বললে, দেখো, তোমার কিন্তু ঘুমনো উচিত। বাতিটা কি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়ে যাব ?

হ্যালিডে তার হাত ধরে ফেললে, বললে, যাই বল, মরণ হওয়া একটা বিশ্রী ব্যাপার ! আচ্ছা, বন্ধু, রাতটার জন্য বিদায় জানাচ্ছি, শুভরাত্রি।

কথাটা অ্যাসহারস্টের মনে লাগল। সে আবেগের সঙ্গে নিজের হাত দুখানা মুচড়ে নিয়ে নীচেয় চলে গেল। হল ঘরের দরজা তখনো খোলা ছিল। হল ঘরের মধ্যে দিয়ে বাইরের বাগানে গিয়ে উপস্থিত হল। ঘন নীল আকাশের বুকে তারাগুলি জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। সেই আলোকে কতকগুলো লাইল্যাক ফুল বর্ণনা-করা-যায়-না এমন অদ্ভুত রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল। অ্যাসহারস্ট একটি কচি পল্লব তার গালে চেপে ধরলে। সঙ্গেসঙ্গে তার বোজা চোখদুটির সামনে মেগানের মূর্তি ভেসে উঠল, ওর বুকে রয়েছে ছোট্ট বাদামী রঙের সেই স্প্যানিয়েল কুকুরছানা। তার মনে পড়ল বন্ধু হ্যালিডের কথা, 'আমি একটি মেয়ের কথা ভাবছিলুম। কেমব্রিজের একটি মেয়ে—যাকৃগে ! আমি খুশী যে, ও আমার মন অধিকার করতে পারে নি।' সে লাইল্যাক গাছের ডাল থেকে মাথা টেনে নিয়ে ঘাসের ওপর পায়চারি করতে লাগল। দুটো ল্যাম্পপোস্টের আলোয় মুহূর্তের জন্য একটা ছায়া যেন মানুষের মূর্তি ধারণ করলে। বাতাসে-দোলা একগুচ্ছ প্রাণবন্ত সাদা ফুলের নীচেয় সে মেগানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে। তখনো ঝরনাটি কলকল করে বয়ে যাচ্ছিল। স্নানের পুলের বুকে চাঁদ 'স্টীল নীল' রঙে প্রতিবিম্বিত। সে যেন ফিরে পেয়েছে সেই নির্দোষ, সরলা বালার ওপর দিকে তোলা মুখখানিতে চুমুর পর চুমু খাওয়ার উন্মাদনা,—যেন ফিরে পেয়েছে সেই অপরূপ রাত্রির সৌন্দর্য ও বিহ্বলতা। সে আর একবার লাইল্যাক গাছের ছায়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে ত ঝরনার কল্লোলে নয়—সাগরের গর্জনে রূপ পেয়েছে রাত্রির কণ্ঠস্বর। এখানে কোন ছোট পাখি নেই, কোন পেঁচা নেই। কোন রাতের বেলার কর্কশ আওয়াজ নেই। আছে পিয়ানো বাজার মধুর ধ্বনি, দিগন্তে সার সার সাদা বাড়িগুলির বাঁকা রেখা,— আর আছে বাতাসে লাইল্যাক ফুলের মধুগন্ধ। মাথার ওপর দিকে হোটেলের একটি খোলা জানালা থেকে আলো আসছিল। সে দেখতে পেলে, একটি ছায়ামূর্তি জানালার পাল্লার পাশে সরে গেল। সঙ্গেসঙ্গে এক অতি-অদ্ভুত অনুভূতি তার বুকের মধ্যে সাড়া জাগালে।

এই যে মেয়েটি—যে তাকে 'ফ্রাঙ্ক' বলে নাম ধরে ডেকেছে, যার হাত তার হাতে পরশমণির ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়েছে—এই যে মেয়েটি শান্ত এবং পবিত্র—ও যদি জানতে পারে মেগানের সঙ্গে তার বে-আইনী ভালবাসার কথা, তাহলে কি ভাববে? সে মাথা নীচু করে ঘাসের বুকে পা মুড়ে বসে পড়ল। হোটেলের বাড়িটা রইল পিছনের দিকে। বুদ্ধের খোদিত মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে ভাবতে লাগল, সে কি সত্যি-সত্যি নির্দোষ প্রেমকে চোরের মত উপভোগ করতে চাইছে? এক বুনো ফুলের সুগন্ধ একবার মাত্র শুঁকে নিয়ে তারপর ফুলটাকে অবজ্ঞা ভরে মাটিতে ফেলে দেবে?—এখন আমার কি করা কর্তব্য? হয়ত মেগান এখন ওর জানালার ধারে বাগানে-ফোটা ফুলের রাশির দিকে চেয়ে অ্যাসহারস্টের কথা ভাবছে! হায়, বেচারী মেগান! ওর জন্য কেন এত ভাবনা? তার মন নিজে থেকেই উত্তর দিলে, মেগানকে যে আমি ভালবাসি! সঙ্গেসঙ্গে সংশয় জাগল, আচ্ছা, সত্যিই কি ওকে আমি ভালবাসি? না, ও কত সুন্দর! তাছাড়া, আমাকে যে ও ভালবেসে ফেলেছে, তাই ওকে কাছে পেতে চাইছি মাত্র?—এখন কি করা যায়? পিয়ানো তখনো বেজে চলেছে, আকাশে তারাগুলো পিটপিট করে জ্বলছে। অ্যাসহারস্ট মোহাচ্ছন্ন ভাবে সামনে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে। শেষে ঠাণ্ডা পড়ার দরুন উঠে পড়ল। তখন হোটেলের কোন জানালায় আর আলো দেখা যাচ্ছিল না। সে ভেতরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

॥ আট ॥

স্বপ্নহীন, গভীর ঘুমের পর পরের দিন ভোরে সে জেগে উঠল। দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছিল। তীক্ষ্ণস্বরে কে যেন ডেকে উঠল, হিঃ, চা তৈরী হয়ে গেছে! সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। কোথায় রয়েছে সে—আঃ!

সে খাবার কামরায় গিয়ে দেখলে, ওরা ইতিমধ্যে মারমালেড খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। স্টেলা ও সাবিনার মাঝখানে যে খালি চেয়ার ছিল, তাতে বসে পড়ল। ওরা তার মুখখানা ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, চটপট নিন, আমরা সাড়ে নটার সময়ে যে যাত্রা করছি!

হ্যালিডে বললে, বন্ধু, আমরা 'বেরিহেড' দেখতে যাচ্ছি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে, বুঝলে?

অ্যাসহারস্ট ভাবলে, যেতে হবে! অসম্ভব। জিনিসপত্র কেনাকাটা করে আমাকে ফিরে যেতে হবে। সে স্টেলার দিকে তাকালে। স্টেলা তাড়াতাড়ি বললে, আমাদের সঙ্গে চলুন না।

সাবিনা দিদির স্বরে স্বর মেলালে, বললে, আপনাকে না সঙ্গে পেলে কোন আমোদই হবে না।

ফ্রেডা নিজের চেয়ার ছেড়ে তার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বললে, আপনাকে যেতেই হবে। না হলে আমি আপনার চুলের মুঠি ধরে টানব।

অ্যাসহারস্ট ভাবলে, যাকগে, আর-একটা দিন ত! তারপর বললে, বেশ, যাব। তোমাকে আর আমার কেশর ধরে টান মারতে হবে না।

—বাঃ, কি মজা! কি মজা!

সে রেল-স্টেশনে গিয়ে দ্বিতীয় টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য একখানি খসড়া লিখলে, তারপর ছিঁড়ে ফেললে। কি কারণে যে এদিনও খামার-বাড়িতে ফিরে যেতে পারছে না, তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলে না। তাহলে কি অজুহাত লিখে জানাবে?

ব্রিকস্‌হাম থেকে ওরা খুব ছোট একটি ওয়াগোনেট গাড়ি করে যাত্রা করলে। সাবিনা ও ফ্রেডার মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে তাকে বসতে হল, স্টেলার হাঁটুতে তার হাঁটু লাগতে লাগল। এইভাবে বসে যেতে যেতে ওরা সকলে মিলে গান গাইতে আরম্ভ করলে। ক্রমে তার মনের ভার দূর হয়ে গেল, দেখা দিল দিলখুশী রঙ-তামাশার হালকা ভাব।

আজকের দিনটিতেই ত অনেককিছু ভাবার ছিল, কিন্তু সে মোটে কোন ভাবনা ভাবতে চাইলে না। ওরা সকলে মিলে দৌড়-প্রতিযোগিতা করলে, কুস্তি লড়লে, সাইকেল রেস দিলে। আজ কেউই স্নান করতে চাইলে না। ওরা সারাদিন ধরে হাসির গান গাইলে, নানা খেলা খেললে। সঙ্গে করে যা-কিছু খাবার এনেছিল সব খেয়ে নিঃশেষ করলে। ফেরার পথে গাড়ির মধ্যে ছোট দুজন মেয়ে তার পিঠে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল; তার হাঁটু আবার স্টেলার হাঁটুর সঙ্গে লাগতে লাগল। ত্রিশ ঘণ্টা আগে এই তিনটি রেশমী মাথা যে তার অপরিচিত ছিল—একথা বিশ্বাসের অযোগ্য বলে বোধ হচ্ছিল। তারপর ট্রেনে বসে স্টেলার সঙ্গে কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা হল। সে নিজের প্রিয় কবিদের নাম জানালে, স্টেলার প্রিয় কবিদের নামও জানতে পারলে। নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে ওর চেয়ে নিজেকে বড় বলে ধারণা হওয়ায় খুশী হয়ে উঠল। একসময়ে স্টেলা হঠাৎ চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে,

ফিল বলছিল,"তুমি পরজন্মে বিশ্বাস করো না, ফ্রাঙ্ক। একথা ত আমার কাছে ভয়ংকর মনে হয়।

অ্যাসহারস্ট একটু থতমত খেয়ে বিড়বিড করে বললে, আমি বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। আমি শুধু বলি, পরজন্ম আছে কিনা জানি না।

ও তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, ও কথা মোটে সহ্য করতে পারি না। বেঁচে থাকার দরকার কি তাহলে ?

উত্তরে সুন্দর ভ্রূর বাঁকা রেখায় রাগের প্রকাশ দেখতে দেখতে অ্যাসহারস্ট বললে, একজনের মন বাখতে কোন কিছু বিশ্বাস কবব,—তাতে আমার আস্থা নেই।

—যদি পুনরায় জন্মানো না যায়, তাহলে লোকে পুনরায় জন্মাতে চায় কেন ?

কথা বলতে বলতে ও চোখ দুটি বড় কবে তাব দিকে একদৃষ্টে তাকালে। স্টেলাকে আঘাত দিতে তাব মন চাইলে না। তবু ওকে হাবিয়ে দেবার এক-টুকরো ইচ্ছেকে দমন কবতে না পেরে উত্তবে বললে, যতদিন মানুষ বেঁচে থাকে, সে সময়ে তাব পক্ষে আরো বেশী দিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। এর বেশী কিছু এই ইচ্ছের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না।

—তোমার কি তাহলে বাইবেলের ওপর একটুও বিশ্বাস নেই ?

সে ভাবলে, এবার সত্যি-সত্যি ওকে আঘাত করা ছাড়া উপায় নেই। তারপর বললে, 'সারমন অন দি মাউণ্ট'-এর উপদেশে আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, তা সব যুগের জন্য সুন্দর এবং হিতকর।

—তুমি কি ক্রাইস্টের দেবত্বে বিশ্বাস কর না ?

অ্যাসহারস্ট মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালে।

স্টেলা চকিতে দৃষ্টি জানালার দিকে ফিরিয়ে নিলে। এদিকে মুহূর্তের মধ্যে অ্যাসহারস্টের মনে পড়ে গেল নিকের মুখে শোনা মেগানের প্রার্থনার কথা: "ভগবান, আমাদের সকলকে এবং মিঃ অ্যাসেসকে আশীর্বাদ করুন।" আর কে এমন করে আমার জন্যে প্রার্থনা জানাবে? একজন ছাড়া আর কে—যে এই মুহূর্তে আমাকে দেখতে পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে ?

সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হল, আমি কি ভয়ংকর শয়তান !

সেদিন সারা সন্ধ্যেবেলা এই চিন্তা বারবার ফিরে এল। এবং স্বভাবতঃ প্রত্যেকবার যন্ত্রণার পরিমাণ কমতে লাগল। শেষে তার মনে হল, শয়তানি এমন কিছু অন্যায় নয়। আশ্চর্য এই যে, শেষদিকে সে বিহ্বল হয়ে ভাবতে

লাগল, মেগানের কাছে ফিরে গেলে শয়তানি করা হবে, না, ফিরে না গেলে শয়তানি করা হবে!

ছোট্ট তুজনকে বিছানায় শুতে পাঠাবার আগে পর্যন্ত সকলে মিলে সারাক্ষণ তাস খেললে। তারপর স্টেলা পিয়ানো বাজাতে শুরু করলে। জানালার কাছের চেয়ারে বসে অল্পঅল্প অন্ধকারে অ্যাসহারস্ট দেখতে লাগল, স্টেলার লম্বা ফরসা গলার ওপর চমৎকার মাথাটি পিয়ানোর শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে কেমন হেলছে আর তুলছে। ও বিশেষ অঙ্গভঙ্গী না করে বেশ সাবলীলভাবে পিয়ানো বাজিয়ে চলল। মৃদু সোনালী জ্যোতির একটা জাতুময় পরিমণ্ডল যেন ওকে ঘিরে সৃষ্টি হয়ে উঠল। অ্যাসহারস্ট ভাবলে, ওই দেবকুমারীর মত সাদা পোশাক পরা মেয়েটির সামনে কামজ মোহ বা অসংস্কৃত মনের বুনো বাসনা কেমন করে সৃষ্টি হতে পারে। ও শুম্যানের একটি গৎ বাজালে। তারপর হ্যালিডে বাঁশি বার করে বাজাতে শুরু করলে। জাতুময় পরিমণ্ডল লুপ্ত হয়ে গেল। শেষে ওরা জোর করে অ্যাসহারস্টকে দিয়ে গান গাওয়ালে। স্টেলা ওর সঙ্গে সংগত করতে লাগল। গানের মাঝখানে তুটি ড্রেসিং-গাউন-পরা মূর্তি চুপিসাড়ে এসে পিয়ানোব পেছনে লুকোবার চেষ্টা করলে। সন্ধ্যার মজলিশ ভেঙে গেল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অ্যাসহারস্টের মোটে ঘুম হল না। শুয়ে শুয়ে বিছানায় বার বার এপাশ ওপাশ করলে। মাথাব মধ্যে ভাবনার পর ভাবনা। তুই পরিবারের মধ্যে গত তুদিনের এই ঘরোয়া অন্তরঙ্গতা এবং হ্যালিডে পরিমণ্ডলের প্রবল আকর্ষণ তাকে এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করে ঘিরে রেখেছে যে, এমন-কি মেগানও তার কাছে অবাস্তব বলে বোধ হতে লাগল। সে কি সত্যি সত্যিই ওর কাছে ভালবাসা জানিয়েছে? তার সঙ্গে একত্রে বাস কববার উদ্দেশে তাকে নিয়ে চলে যাবার জন্য সত্যিসত্যিই কি কথা দিয়েছিল? নিশ্চয়ই বসন্ত ঋতু, সেদিনের চাঁদনি রাত আর আপেল মঞ্জরীর জাতু তাকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে-ছিল। এই মে মাসের উন্মাদনা তুজনকেই শুধু ঘোর সর্বনাশের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। যার বয়স এখনও আঠার বছর হয় নি, এমন এক সরলা মেয়েকে সে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে—এই কথাটা আজ তাকে আতঙ্কে ভরিয়ে তুললে। সে নিজের মনে বলে উঠল, এ ভয়ংকর বিশ্রী ব্যাপার, আমি কি ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি। শুম্যানের সুরের রেশ বুকের মধ্যে ধ্বনি তুললে এবং তার উত্তেজিত চিন্তার সঙ্গে মিশে গেল। সে পুনরায় চোখের সামনে দেখতে পেলে স্টেলার শান্ত ধবধবে ফরসা মূর্তি, সুন্দর চুল-ভরা মাথা, চমৎকার বাঁকানো ঘাড় ও অদ্ভুত

দেবকুমারীর মত জ্যোতি। সে ভাবলে, হয় আমি পাগল হয়ে গেছলুম, না হয়, পাগল হয়ে যাব। আমার মধ্যে কি যেন এসেছিল? আহা, বেচারী মেগান! তার মনে পড়ল মেগানের সেই প্রার্থনা, "ভগবান সকলকে আশীর্বাদ করুন আর মিঃ অ্যাসেসকেও।" আরও মনে পড়ল, "আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই—শুধু সঙ্গে থাকতে চাই"। অ্যাসহারস্ট মাথার বালিশে মুখ লুকিয়ে প্রচণ্ড কান্নার আবেগকে দমন করার চেষ্টা করতে লাগল। ফিরে না যাওয়া যে হবে জঘন্য অপরাধ! আবার, ফিরে যাওয়া হবে আরও জঘন্য।

তরুণ বয়সে হৃদয়াবেগকে প্রকাশ হতে দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। সে তাই ঘুমিয়ে পড়ল, এই কথা ভাবতে ভাবতে যে, কি আর হয়েছে—কটা চুমু দেওয়া-নেওয়া মাত্র! এক মাসের মধ্যে সবই বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাবে।

পরের দিন সকালবেলা সে তার চেক ভাঙালে, কিন্তু ঘু-ঘু রঙের পোশাক কিনতে দোকানে গেল না; তার বদলে নিজেব টুকিটাকি দরকারী জিনিস কিনে নিলে। সারাদিন সে নিজেব বিরুদ্ধে একটা বিষণ্ণ মনোভাব নিয়ে অদ্ভুত মেজাজে কাটিয়ে দিলে। গত দুদিনের তীব্র লালসার বদলে সে একটা ঘোর শূন্যতা অনুভব করলে, যেন কান্নার উত্তেজনার ফলে আকাঙ্ক্ষাব তীব্রতাব নিবৃত্তি হয়েছিল।

চা খাবার পর স্টেলা একখানি বই তার সামনে রেখে দিয়ে লজ্জানতভাবে বললে, ফ্রাঙ্ক, তুমি কি এই বইখানি পড়েছ?

বইখানা ছিল ফ্যারার-এর লেখা "লাইফ অব ক্রাইস্ট"। অ্যাসহারস্ট হেসে ফেললে। তার বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্বন্ধে স্টেলার উদ্বিগ্নতা তার কাছে হাস্যকর বোধ হলেও তবু একফালি আবেগ বুকের মধ্যে অনুভব করলে। তার মধ্যে স্টেলাকে নিজের বিশ্বাসের অনুগামী করবার চেষ্টা না করেও নিজের সম্বন্ধে সাফাই গাইবার একটা ইচ্ছা জাগল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা যখন হ্যালিডে বোনেদের সঙ্গে মাছ ধরার জাল মেবামত কবছিল, অ্যাসহাবস্ট বললে, যতদূর আমি দেখতে পাই, গোঁড়া ধর্মের পেছনে সবসময়ই পুরস্কার লাভের অর্থাৎ ভাল হবার বদলে কি লাভ করবে—এই ধারণা কাজ করে। এ এক রকমের দয়া-ভিক্ষা ছাড়া আর কি! আমার মনে হয়, এ সমস্তর উৎপত্তি ভয় থেকে।

স্টেলা সোফার ওপর বসে বসে জালের দড়ির জন্য গাঁট বাঁধছিল। সে উত্তর দিলে, আমার ধারণা, এ হচ্ছে তুমি যা বলছ, তার চেয়ে আরও গভীর স্তরের জিনিস।

অ্যাসহারস্ট প্রভাব বিস্তার করার একটা ইচ্ছা পুনরায় অনুভব করলে, তারপর উত্তর দিলে, তোমার ধারণা এই ত! কিন্তু আমাদের সকলের অন্তরেই সবচেয়ে গভীরতম আকুতির একটি হচ্ছে, কিছুর বিনিময়ে আর-কিছু পাবার ইচ্ছে। কোথা থেকে এ ইচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে, তা বুঝতে পারা বড় কঠিন। বুঝলে?

ও হতভম্ব হয়ে কপাল কুঁচকে ভ্রূকুটি করলে, তোমার কথা বুঝতে পারলুম বলে মনে হচ্ছে না।

অ্যাসহারস্ট একগুঁয়েমির বশে বলতে লাগল, আচ্ছা, ভেবে দেখ, সবচেয়ে বড় ধার্মিক লোক হচ্ছে তারাই, যারা অনুভব করে যে তারা যা যা চায়, তার সবকিছুই জীবন দিতে পারে না। অবশ্য ভাল হবার চেষ্টার ওপব আমার আস্থা আছে, কারণ, ভাল হওয়ার মধ্যেই আছে মঙ্গল।

—তাহলে ভাল হবার ওপর তোমার আস্থা আছে ত?

এখন কি চমৎকার ওর মুখখানা দেখতে হয়েছে! ওর কাছে সহজেই ভাল হওয়া যায়। এই কথা ভেবে সে মাথা নেড়ে স্টেলার কথায় সায় দিলে। তারপর বললে, এখন কেমন করে ওই গাঁটগুলো বাঁধতে হয়, তুমি আমায় শিখিয়ে দাও ত।

গাঁট বাঁধা শিখতে গিয়ে একের হাতের আঙুলগুলির সঙ্গে আর-একজনের আঙুলের স্পর্শ লাগায় অ্যাসহারস্টের বুকের মধ্যে একটুকবো তুষ্টি ও পুলক খেলে গেল। যখন সে রাত্রিবেলা বিছানায় শুতে গেল, তখন ইচ্ছে করেই স্টেলার সম্বন্ধে নানা কথা ভাবতে লাগল।

পরের দিন সে জানতে পারলে, স্টেলারা ট্রেনে করে 'টটনিস' শহরে গিয়ে "বেরী পোমরয়"প্রাসাদে পিকনিক করার আয়োজন করেছে। এ দিনেও অতীতের কথা ভুলে গিয়ে সে ওদের সঙ্গে ল্যাণ্ডোতে হ্যালিডের পাশে বসে পড়ল। তারপর সমুদ্রের তীর বরাবর রাস্তা ধরে যাবার সময় রেল স্টেশনের কাছে বাঁকের মাথায় হঠাৎ তার বুকখানা প্রচণ্ড আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল। "এ যে মেগান,—মেগানই ত!"

মেগান তখন বেশ কিছুদূরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। গায়ে তার পুরোতন ঘাগরা ও কোট, মাথায় সেই বিশেষ ধরনের টুপি। ও পথচলা পথিকদের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছিল।

সহজাত প্রবৃত্তিবশে অ্যাসহারস্ট নিজের মুখখানা ঢেকে ফেলার জন্য হাত তুললে, তারপর চোখে-পড়া ধুলা পরিষ্কার করার অছিলা করলে। তার হাতের

আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে তখনও মেগানকে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছিল। এ ত গ্রাম্য মেয়ের ভয়হীন পা ফেলা নয়, এ যে হতাশার ভারে অবসন্ন, দুঃখজর্জর মানুষের ইতস্ততঃ পা ফেলা,—এদিকে যাবে, না, ওদিকে যাবে, শেষ পর্যন্ত কোথায় যে যাবে—সে সম্বন্ধে দিশেহারা।

এমনভাবে এখানে ও কি করে এল?—কি অজুহাত দেখিয়ে খামার থেকে ছুটি পেলে? কি পাবার আশা করছে? গাড়ির চাকার এক একটা চক্রের সঙ্গে সে মেগানের কাছ থেকে ক্রমশঃ যত দূরে চলে যাচ্ছে, ততই বুকের ভেতরে তার হৃদয় বিদ্রোহ করে উঠছে আব বলছে, গাড়ি থামাও, বাইরে গিয়ে মেগানের কাছে যাও। যখন ল্যাণ্ডো স্টেশনের বাঁকের মাথায় ঘুরে গেল, তখন আর সহ্য করতে না পেরে সে দরজা খুলে ফেলে বললে, আমি একটা জিনিস ভুলে রেখে এসেছি, তোমরা চলে যাও, আমার জন্মে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমি ক্যাসেলে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবার উদ্দেশে পরের ট্রেনে যাব।

সে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। গাড়ি বিস্মিত হ্যালিডে ও তার বোনেদের নিয়ে স্টেশন চত্বরে ঢুকল।

অ্যাসহারস্ট একটা কোণ থেকে দেখতে পেলে, মেগান ইতিমধ্যে অনেক দূর চলে গেছে। কয়েক পা দৌড়ে যাবার পর নিজেকে সংযত করে নিয়ে হাঁটতে লাগল। প্রতি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে মেগানের যত কাছে এগুল, ততটা হ্যালিডেদের কাছ থেকে দূরে সরে গেল, এবং ততই তার গতি কমতে শুরু করলে। ওকে এই দেখতে পাওয়ার ফলে কোন কিছু পরিবর্তন কি হবে? তাছাড়া, ওর কাছে গিয়ে এখন হাজির হলে যে-সব ব্যাপার ঘটবে, তার পরিণাম কি কিছু কম জঘন্য হবে? একথা ত লুকোন যায় না যে, হ্যালিডেদের সঙ্গে তার দেখা হবার পর থেকে সে ক্রমশঃ মনে মনে একটা বিষয় স্থির করে ফেলেছে। সে মেগানকে বিয়ে করবে না! করলে, শুধু জড়িয়ে পড়বে একটা প্রেমের প্রমত্ততায়, একটা বিপদ-সঙ্কুল, দুঃখজনক, অসহ জীবন-যাপনায়। তারপর? তারপর সে হয়ে পড়বে ক্লান্ত, তার ভোগে জাগবে বিতৃষ্ণা। কারণ, এই সরলা, বিশ্বাসপরায়ণা, স্বভাবসুন্দরী যে ওর যা-কিছু আছে, সব একসঙ্গে অ্যাসহারস্টের ভোগে উজাড় করে দিয়ে দেবে। আর তার পরিণতি হবে, স্বভাবসৌন্দর্য অচিরে হারাবে সব আকর্ষণ।

তার চোখে পড়ল দূরে মেগানের সেই অদ্ভুত টুপি এগিয়ে যাচ্ছে। ও

প্রত্যেক লোকের মুখের দিকে চাইছে, প্রত্যেক বাড়ির জানালার ওপর চোখ ফেলছে। অ্যাসহারস্ট ভাবলে, এমন নিষ্ঠুর মুহূর্ত কি কোন মানুষের জীবনে আসে? এখন সে যা করবে, তা-ই হবে জানোয়ারের কাজ। তার মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদ বার হয়ে এল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, মেগান ইতিমধ্যে পথচলা বন্ধ করে একটা পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে। সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। হয়ত এর আগে কখনও সমুদ্র দেখেনি এবং এই দুঃসময়ের মধ্যেও সেই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়ে না তাকিয়ে থাকতে পারে নি।

হাঁ, সত্যিই ও জীবনে কিছুই দেখেনি! অ্যাসহারস্ট ভাবলে, জগতের সব-কিছুই এখনও ওর কাছে অপরিচিত, অজানা; আর, আমি শুধু কয়েক সপ্তাহের লালসা চরিতার্থতার জন্য ওর জীবনে ডেকে আনব সর্বনাশ! এ আমি কিছুতেই করব না,—বরং নিজের গলায় নিজে ফাঁসি লাগিয়ে মরব।

হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, স্টেলার শান্ত চোখ দুটি যেন তার চোখের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করছে। ওর কপালের ঢেউ-খেলানো নরম চুলগুলি বাতাসে উড়ছে। আঃ, যা-কিছু তার কাছে শ্রদ্ধার জিনিস এবং তার নিজের আত্মসম্মান—এসব ত্যাগ করা তার পক্ষে হবে উন্মাদের কাজ! সে ফিরে দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে পা ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

কিন্তু সেই বেচারা, বিহ্বল, ছোট্ট মূর্তির স্মৃতি, সেই উৎকণ্ঠিত চোখে পথ-চলা লোকেদের প্রত্যেকের মুখে তাকিয়ে অনুসন্ধান করার স্মৃতি আবার তার বুকে কঠিন আঘাত হানতে লাগল। পুনরায় সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলে। সেই বিশেষ ধরনের টুপি আর দেখতে পাওয়া গেল না। দুপুরের ভিড়ে পথযাত্রীদের স্রোতের মধ্যে সেই রঙিন ছোট্ট চিহ্নটি ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছল। যা পাওয়া সম্ভব নয়, মানুষের জীবন-যাপনার মধ্যে সেই অভাব-বোধ যে আগ্রহের প্রবল আবেগ সৃষ্টি করে, তার তাড়নায় সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু মেগানকে কোথাও দেখা গেল না। আধঘণ্টা ধরে খোঁজ করে ঘুরতে লাগল। তারপর সমুদ্রতীরে পৌঁছে মুখ বালির দিকে নীচু করে বসে পড়ল। সে বুঝতে পারলে, এখন মেগানের দেখা পেতে হলে তাকে স্টেশনে গিয়ে ওর প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে, যতক্ষণ না পথে পথে নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির শেষে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরতে মেগান স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়! অথবা, ট্রেন ধরে নিজেকে খামারে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, যাতে বাড়ি ফিরে গিয়ে মেগান তার দেখা পায়। বালুর চড়ায় বালতি-কোদাল নিয়ে একদল ছেলে

কাজ করছিল। সে ওদের কাছাকাছি বালির ওপর নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়ল। তার মনে খোঁজাখুঁজির কাজে ক্লান্ত মেগানের প্রতি যে দরদ জন্মেছিল, তা প্রায় বুকের রক্তের মধ্যে বসন্ত ঋতুর উন্মাদনার বন্যার সঙ্গে মিশে গেল। সেখানে চাওয়া-পাওয়ার তাড়না আবার জেগে উঠল,—ওর চুমু, ওর রেশম-কোমল ছোট্ট দেহটি, ওর অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণ! ওর উষ্ণ, বন্য আবেগের বিদ্যুৎ স্পর্শ! তার আবার চাই আপেল গাছের তলায় চাঁদনি রাতের অপূর্ব অভিজ্ঞতা। চাই সেই সব-কিছু আরো ঘোরতর উন্মাদনার সঙ্গে। সেই ছোট্ট জ্যোৎস্না-ভরা-ঝরনার বুকের কলকলানি, গাছে গাছে ফুলের শোভা,—সেই ভূতুড়ে পাহাড়। কোকিলের কুহু-কুহু, পেঁচার ডাক, আর রেশমী, লাল-রঙা চাঁদের আলো-পড়া ফুল গাছের মাথায় মাথায় প্রাণবন্ত সাদা রঙের খেলা। আবার চাই, জানালার ধারে ভালবাসার মোহে আনমনা মেগানের মুখ আর প্রতীক্ষায় কাতর চোখের দৃষ্টি, ওর বুকের ওপর নিজের বুকের তপ্ত স্পর্শ, ওর ঠোঁট দুটি নিজের ঠোঁটের ওপর। এসব পাওয়ার ব্যাকুলতা তাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। তবু সে নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল। কি সেই জিনিস, যা তার অন্তরে দরদবোধ এবং উত্তপ্ত লোলুপতার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল; আর সমুদ্রতীরে গরম বালুর বুকে নিথর করে তুলেছিল? তিনটি রেশমী চুল-ভরা মাথা—একটি সুন্দর মুখ, বন্ধুত্বে-ভরা নীলাভ চোখ দুটি। নিজের হাতের ওপর একটি সুশ্রী হালকা হাতের চাপ, তার নাম ধরে ডেকে তাড়াতাড়ি কথা বলা "তাহলে তুমি জীবনে ভাল হওয়া যে দরকার তা বিশ্বাস কর"? হাঁ, এবং যেন পাঁচিল দেওয়া পুরনো ইংরেজী ধরনের একটি বাগানের পরিবেশ,—যেখানে রয়েছে লবঙ্গ-গন্ধী লাল ফুল, নীল ঝুমকো ফুল ও গোলাপ ফুল। লাইল্যাক ও ল্যাভেণ্ডার ফুলের গন্ধ, সুন্দর শীতল, অ-ছোঁয়া পবিত্র যা কিছু সে পরিচ্ছন্ন ও হিতকর বলে অনুভব করতে শিখেছিল। হঠাৎ আবার সে ভাবলে, মেগান হয়ত আবার সামনের দিকে এগিয়ে আসতে পারে আর তখন আমাকে দেখতে পাবে। সে দাঁড়িয়ে উঠে দূরে পাহাড়ের কোলের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে বসে কনকনে জলকণা তার মুখের ওপর পড়তে থাকায় সে আরও শান্তভাবে ভাবনাচিন্তায় ডুব দিলে। ইতিমধ্যে সে বুঝতে পেরেছিল, খামারে ফিরে যাওয়া আর বনে বনে এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বন্য পরিমণ্ডলে মেগানের সঙ্গে ভালবাসা উপভোগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আবার, যে সম্পূর্ণ প্রকৃতির সন্তান, তাকে বন্য পরিবেশ থেকে বড় শহরের পরিবেশে তুলে এনে কোন ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে রাখার ভাবনা অ্যাসহারস্টের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কবিকে বিদ্রোহী

করে তোলে। এ ক্ষেত্রে তার ভালবাসা হবে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ, তার উত্তাপ অচিরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। লণ্ডন শহরে ওর অতি-সরলতা, ওর লেখাপড়া ও বুদ্ধি সম্বন্ধীয় সংস্পর্শের সম্পূর্ণ অভাব ওকে করে তুলবে অ্যাসহারস্টের গোপন মনের খেলার পুতুলমাত্র,—আর কিছু নয়। যত বেশীক্ষণ সে পাহাড়ের কোলে বসে রইল, তত পরিষ্কার ভাবে এই কথা সে বুঝতে পারলে। আর যেন মেগানের হাত দুটি এবং আর সবকিছু আস্তে আস্তে তার সংস্পর্শ থেকে সমুদ্রের স্রোতে গড়িয়ে পড়ল। ওর জলের ওপরে ভাসমান মুখ, সকরুণ চোখদুটি এবং ঘনকালো ভিজে চুলের রাশি তার মনকে একান্তভাবে অধিকার করে যন্ত্রণায় কাতর করে তুললে।

শেষকালে সে দাঁড়িয়ে উঠল, ছোট পাহাড়ের চূড়োটা কতটা উঁচু অনুমান করে নিলে। তারপর নীচেকার একটি ঢাকা গুহার দিকে এগিয়ে গেল। তার বোধ হল, হয়ত সমুদ্রের জলের ঠাণ্ডা স্পর্শে সে তার মনের ওপর সংযমও ফিরে পেতে পারে,—এই তপ্ত জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। সে কাপড় জামা খুলে সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটতে লাগল।

অ্যাসহারস্ট যাতে কোন কাজকর্ম, ভাবনাচিন্তা করতে না হয় সেই উদ্দেশে নিজেকে ক্লান্ত করে তুলতে চাইলে; সাঁতার কাটতে লাগল খুব জোরে, বেপরোয়া-ভাবে,—দূর থেকে দূরে। তারপর হঠাৎ অকারণে মনে ভয় জাগল। ভাবলে, যদি স্রোতের মুখে পড়ে তীরে যেতে না পারি, অথবা হ্যালিডের মত যদি হাতে পায়ে খিল ধরে যায়। সে মুখ ফিরিয়ে তীরের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। লাল পাহাড়ের মাথাগুলো বহুদূরে রয়েছে। যদি সে ডুবে যায়, লোকে তার জামা-কাপড় খুঁজে পাবে। হ্যালিডেরা মৃত্যুর খবর জানতে পারবে। কিন্তু মেগান হয়ত কখনই জানতে পারবে না, কারণ, খামারে ত খবরের কাগজ নেওয়া হয় না।

ফিল হ্যালিডের কথাগুলো তার কানে যেন বেজে উঠল, "কেমব্রিজে পড়ার সময় একটি মেয়েকে আমি—যাক, আমি খুশী যে আমার মনে আজ ওর কোন স্থান নেই।" যুক্তিহীন আতঙ্কের সেই মুহূর্তে অ্যাসহারস্ট শপথ করলে, সে-ও মেগানকে মনে কোন স্থান দেবে না। এরপরে তার ভয় ভেঙে গেল। সে স্বচ্ছন্দে সাঁতার দিয়ে তীরে ফিরে এল, রোদে কাপড়জামা শুকিয়ে নিয়ে পরে নিলে। তার মনে ঘা রয়ে গেল বটে, কিন্তু কোন যন্ত্রণা রইল না। ইতিমধ্যে তার দেহ শান্ত ও সতেজ হয়ে উঠেছিল।

অ্যাসহারস্টের মত তরুণ বয়সে মানুষের মনে মমতাবোধ খুব তীব্র হয় না।

হ্যালিডেদের বসবার ঘরে ফিরে এসে সে গোগ্রাসে চা জলখাবার খেয়ে অনুভব করলে, এতক্ষণে গা থেকে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। সবকিছু নতুন ও পরিষ্কার বোধ হল। চা, মাখন-লাগানো টোস্ট আর জ্যাম ভয়ংকর ভাল লাগল। তামাক-পাতায় এত সুন্দর গন্ধ আর কখনো পায় নি। শূন্য ঘরে পায়চারি করতে করতে এপাশে ওপাশে দাঁড়িয়ে এটা সেটা নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগল। স্টেলার কাজ করার ঝুড়িটা তুলে নিয়ে সুতোর বিলগুলো ও একটুকরো রেশমী কাপড় আঙুল দিয়ে নাড়লে। পিয়ানোর আসনে বসে একটি আঙুল দিয়ে গৎ বাজাতে বাজাতে ভাবলে, আজ রাত্তিরে স্টেলা বাজাবে। তখন তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে আমার মনটা খুশী হয়ে ওঠে। বইখানা আসহারস্টকে দেখাবার পর তার পাশে ও রেখে দিয়েছিল, তা হাতে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে। কিন্তু মেগানের ছোট বিষণ্ণ মূর্তি আবার চোখের সামনে ভেসে এল। সে উঠে পড়ে জানালার ধারে ঠেস দিয়ে 'ক্রেসেণ্ট' বাগানে বুলবুলির গান শুনতে লাগল, স্বপ্নাতুর নীল চোখ রইল সমুদ্রের বুকে। একজন চাকর এসে চায়ের বাসন তুলে নিয়ে গেল। সে তখনও সন্ধ্যেবেলাকার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে শূন্য মনে দাঁড়িয়ে রইল। একসময় দেখতে পেলে ক্রেসেণ্ট বাগানের গেট দিয়ে হ্যালিডেরা ফিরে আসছে,—ফিল ও ছোট বোনেদের কিছু আগে রয়েছে স্টেলা, তাদের হাতে বাক্স আর ঝুড়িগুলি। চকিতে সে ভেতর দিকে সরে এল। তার যন্ত্রণাকাতর, পরাজিত হৃদয় চোখাচোখি দেখা হওয়াটা এড়িয়ে গেল। অথচ ওদের একটু বন্ধুত্বপূর্ণ সান্ত্বনা চাইছিল। পিয়ানোর পেছনে দাঁড়িয়ে সে স্টেলাকে ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেখলে, হতাশের মত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার দিকে স্টেলার চোখ পড়তেই চকিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল। সে হাসি দেখে উৎসাহের সঙ্গে-সঙ্গে বিরক্তিও অনুভব করলে।

—ফ্রাঙ্ক, তুমি ত আমাদের পরে এসে হাজির হলে না?

—না, আসা সম্ভব হল না।

—এই দেখ, আমরা কেমন সুন্দর শেষ-সময়ের ফোটা ভায়োলেট ফুল তুলে এনেছি।

ও একগোছা ফুল তার মুখের সামনে তুলে ধরলে। সে সেগুলো নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলে; সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বুকের মধ্যে একটা কি যেন পাবার আগ্রহ জাগল, আবার চকিতে পথ-চলা পথিকদের দিকে তাকানো মেগানের উদ্বিগ্ন মুখখানা মনে পড়ায় সব তাপ স্তিমিত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে বলে উঠল, কি মজার ব্যাপার! সে ছোট মেয়ে দুটিকে এড়িয়ে সোজা চলার উদ্দেশে তার ঘরে গিয়ে বিছানায় নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে মুখের ওপর হাত দুখানি ঢেকে শুয়ে পড়ল। এখন পাশা সত্যি-সত্যি ফেলে দিয়েছি এবং মেগানকে পরিত্যাগ করেছি,—এই কথা ভেবে নিজের প্রতি তার ঘৃণা হল ; এমন-কি হ্যালিডেদের এবং তাদের অর্থাৎ একটি সুখী ইংরেজ পরিবারের সুস্থ পরিবেশের প্রতিও ঘৃণা জন্মাল। ওর জীবনের প্রথম প্রেমকে ধূলিসাৎ করতে ওরা কেন দৈবক্রমে এখানে এসে উপস্থিত হল? তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে যে, সে একজন সাধারণ চরিত্রহীন প্রলুব্ধকারী ছাড়া আর কিছু নয়। মেগানকে সে কখনই বিয়ে করতে পারে না—একথা নিশ্চিত করে তাকে জানাবার উদ্দেশে ওর সোনালা রঙ, লজ্জা-সুন্দর শ্রী নিয়ে স্টেলার এসে উপস্থিত হবার কি অধিকার আছে? তার বুকের মধ্যে একদিকে করুণা আর একদিকে অনুশোচনা-ভরা আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণাদায়ক দ্বন্দ্ব জাগিয়ে তুলতে কি ওর অধিকার?

হঠাৎ তার মনে হল, এতক্ষণে মেগান খামারে হয়ত ফিরে গেছে। হায়, বেচারা, দুঃখকর খোঁজাখুঁজির ক্লান্তিতে পঙ্গু, হয়ত আশা করেছিল, খামারে এসে পৌঁছলে ফিরে-আসা অ্যাসহারস্টের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সে মনস্তাপ-কাতর একটা আর্তনাদকে চাপার জন্য নিজের হাত কামড়ে ধরলে।

যখন চুপচাপ ডিনারের টেবিলে এসে হাজির হল, তখন তাকে বেশ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তার মেজাজ বুঝে ছোট মেয়েরাও চুপচাপ রইল। সকলেই বেশ ক্লান্ত ছিল, তাই সন্ধ্যেটা নিরানন্দেই কাটল। সে কয়েকবার দেখতে পেলে, স্টেলা তার দিকে ক্ষুব্ধ, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। তা লক্ষ করে তার রুক্ষ মেজাজ কিছু প্রসন্ন হল।

সে রাত্রে তার ভাল ঘুম হল না। খুব ভোরে বিছানা থেকে উঠে পড়ে বাইরে বেড়াতে গেল। ক্রমে সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হল। নীল আকাশ, আলো ঝলমল সমুদ্র—সেই বিরাটের পরিমণ্ডলে ওর হৃদয়ের জ্বালা কিছু কমল। ও নিজেকে নিজে বললে, মূর্খ দাম্ভিক, তুমি ভাবছ, মেগান ব্যাপারটাকে খুব অসহ্য মনে করবে! এক বা দু সপ্তাহের মধ্যেই ও সবকিছু প্রায় ভুলেই যাবে! আর সে?—সে বরং সৎ কাজ করার জন্য পুরস্কার পাবে। একজন সৎ তরুণ সে! যদি স্টেলা ব্যাপারটা সব জানতে পারে, শয়তানের প্রলোভন দমন করার দরুন তাকে বরং শুভেচ্ছা জানাবে। সে নিষ্ঠুর ভাবে হেসে উঠল। কিন্তু ধীরে ধীরে আকাশ ও সমুদ্রের শান্তি ও সৌন্দর্য এবং নিঃসঙ্গ শঙ্খচিলদের উড়ে

যাওয়া তার বুকে জাগিয়ে তুললে লজ্জা। সে স্নান করার পর হোটেলে ফিরে এল।

তখন ক্রেসেণ্ট বাগানে স্টেলা একটা ক্যাম্প স্টুলের ওপর বসে ছবি আঁকছিল। অ্যাসহারস্ট খুব কাছে গিয়ে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে চুরি করে আঁকার কাজ দেখতে লাগল। সুন্দরী, শ্রীময়ী ও ঘাড নীচু করে ব্রাশ হাতে কপালে রেখা জাগিয়ে আঁকার কাজ করছিল।

সে মৃদুস্বরে বললে, দুঃখিত, স্টেলা, গতরাত্রে আমি জানোয়াবের মত ব্যবহার করেছি।

ও মুখ ঘুরিয়ে চমকে উঠে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। নিজের ভঙ্গীতে বললে, ও কিছু নয়, ওতে আর মনে কবাব কি আছে? আমি জানতুম, কিছু একটা ঘটেছে। বন্ধুদের মধ্যে ওরকম ঘটলে কিছু এসে যায় না, নয় কি?

অ্যাসহারস্ট উত্তর দিলে, বন্ধুদেব মধ্যে—তাহলে আমবা হচ্ছি বন্ধু, নয় কি?

ও মুখ তুলে তার দিকে তাকালে, জোর করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। তার ওপরের দাঁতের পাটি এক উজ্জ্বল হাসির ফাঁকে চকচক করে উঠল।

তিনদিন পরে অ্যাসহারস্ট হ্যালিডেদের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে লণ্ডনে ফিবে এল সে খামার বাড়ির ঠিকানায় কিছু লিখে জানালে না। কি কাবণে জানালে না, তা সেই বলতে পারে।

পবের বছরে এপ্রিল মাসের শেষ দিনে অ্যাসহারস্ট এবং স্টেলার বিয়ে হয়ে গেল * * *।

॥ নয় ॥

বিয়ের রজত জয়ন্তী দিনে পাহাড়ী অঞ্চলের একটি পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসে বসে অ্যাসহারস্ট এই সব স্মৃতিকথা ভাবছিল। যেখানে সে আজ লাঞ্চ খাবার ব্যবস্থা করেছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা-হওয়ার প্রথম দিনে মেগান আকাশের পটে ছবি আঁকার মত দাঁড়িয়েছিল। কি অদ্ভুত মিল! খামার বাড়ি এবং ফুলের বাগান পুনরায় দেখবার আশায় এবং জিপসীভূত থাকার পাহাড়ী অঞ্চল ঘুরে আসার উদ্দেশে তার হৃদয়ে গভীর আগ্রহ জাগল। বেশীক্ষণ সময় লাগবে না; স্টেলার খেতে আসতে হয়ত এখনো এক ঘণ্টা দেরী হবে।

সব কথা কত চমৎকারভাবে না তার মনে আসছে! পাইন গাছগুলোর শোভা-ভরা মাথা, পিছন দিকে ঘাসে-ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়গুলো! সে

খামারের গেটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই নীচু, পাথরের তৈরী বাড়িটি, সারি সারি ইউ গাছের ডালপালা দিয়ে আচ্ছন্ন রয়েছে মাথার ওপরে একটানা ছাউনি —বারান্দার মত, ফুলে ফুলে ফুলময় কারেন্ট গাছ—এসব কিছুর ত একটুও পরিবর্তন হয় নি। এমন-কি জানালার নীচে সেই পুরোতন সবুজ রঙের চেয়ারটি ঘাসের ওপরে রয়েছে—মেগানের কাছ থেকে চাবি নেবার উদ্দেশে যেখানে গিয়ে সেই যে রাতের বেলা সে উপস্থিত হয়েছিল!

এরপর গলি দিয়ে এগিয়ে এসে ফলবাগানের গেটের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সেদিন যেমনটি ছিল, ছাই রঙের গেটটি আজও তেমনি জরাজীর্ণ হয়ে রয়েছে। গাছগুলোর মধ্যে এমন-কি একটা কাল শূয়োর-ছানা আজো চবে বেড়াচ্ছিল। ইতিমধ্যে ছাব্বিশটা বছর এক-এক করে পার হয়ে গেছে—একথা কি সত্য? না এতদিন তার স্বপ্ন দেখে কেটে গেছে আর আজ বড আপেল গাছের তলায় মেগানকে তার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যাবে বলে সে জেগে উঠেছে? নিজের অজ্ঞাতে ছাই রঙের দাড়িতে হাত দিতেই তার চমক ভেঙে গেল। সে চকিতে ফিরে এল বাস্তব পৃথিবীতে। গেট খুলে এগিয়ে গেল বাগানের অপর প্রান্তে এবং পুরোতন আপেল গাছের তলায় এসে পৌঁছল। কোনো পরিবর্তন হয় নি। দু-এক জায়গায় কোন কোন জিনিস বড ছোট হলেও অন্য সব জিনিস দেখে মনে হচ্ছে, যেন মাত্র গত রাত্রে মেগান ছুটে চলে যাবার সময়ে সে ওই গাছটার শ্যাওলাময় গুঁড়ি আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরেছিল এবং কাঁচা কাঠের গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে অনুভব করেছিল। তখন মাথার ওপরে ছিল জ্যোৎস্নার আলোভরা গোছা গোছা ফোটা ফুলের শোভা। এই প্রথম বসন্তের দিনে কতকগুলি কুঁড়িও ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছিল। কোকিলেরা শুরু করে দিয়েছিল তাদের গানের উৎসব। সূর্যকিরণ ছিল উজ্জ্বল এবং উষ্ণ। আশ্চর্য, এ সব যে, অবিশ্বাস্যভাবে একই দেখছি! সেই ঝরনার কলকলানি, সেই বনময় উপত্যকা, সেই পাথর খণ্ড যেখানে জিপসী ভূত এসে বসে থাকত বলে লোকেরা বিশ্বাস করত। এই সব দেখতে দেখতে হারিয়ে-যাওয়া তারুণ্য, ব্যর্থ-হওয়া প্রেমের মাধুর্য পুনরায় ভোগ করার জন্য আকাঙ্ক্ষার কাতরতা অ্যাসহারস্টের দেহমন ভরিয়ে তুললে। এই আদিমসৌন্দর্যে রূপায়িত মর্তে মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল নিশ্চয়ই এর পরমানন্দকে প্রাণভরে চিরন্তন করে ধরে রাখার জন্য—যেমন ধরে রেখেছে আকাশ আর পৃথিবী। কিন্তু, হায়, কেউ তা পারে নি।

সে ঝরনার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, যৌবন এবং বসন্ত! আশ্চর্য,

এদের পরিণতি আজ কি হয়েছে! হঠাৎ তার মনে ভয় জাগল, কোন লোক এখানে এসে পড়লে তার স্মৃতির আনন্দ নিমেষে বিস্বাদ হয়ে যাবে। তাই সে গলির পথ ধরে ফিরে গিয়ে বিষন্ন ভাবে এগোতে এগোতে রাস্তার মোড়ের মাথায় উপস্থিত হল।

তার মোটরগাড়ির পাশে একজন মাথায়-সাদা-চুল বুড়ো মজুর লাঠির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছিল। ও তখনি কথাবার্তা বন্ধ করলে। যেন মালিককে অশ্রদ্ধা জানিয়ে অপরাধ করেছে এইভাবে টুপিতে হাত দিয়ে সেলাম জানিয়ে গলির পথে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল।

অ্যাসহারস্ট ছোট সবুজ ঘাসে-ভরা ঢিবিটার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি বলতে পার, ওটা কি?

বুড়ো মানুষটি দাঁড়িয়ে পড়ল, ওর মুখে ভাবনার রেখা ফুটে উঠল; যেন নিজের মনে বললে, মাশয়, আপনি ঠিক জিনিসটি লক্ষ করেছেন। তারপর গাড়ির মালিককে জানালে, এটা একটা কবর।

—কিন্তু পথের পাশে এই ফাঁকা জায়গায় কবর দেওয়া হয়েছে কেন?

বুড়ো মানুষটি একফালি হেসে বললে, সে একটা কাহিনী, জানলেন? আর এই প্রথম সে কাহিনী আমাকে বলতে হচ্ছে না। এর আগে আরো অনেকে এই ছোট্ট ঘাসের ঢিবির সম্বন্ধে খোঁজ করেছিল। আমরা ওকে বলি 'কুমারী-কবর'।

অ্যাসহারস্ট তার তামাকপাতার থলি বার করে বললে, এই নাও, সিগারেট পাকিয়ে খাও।

বুড়ো ওর টুপিতে হাত দিয়ে পুনরায় সেলাম জানালে, তারপর একটা পোড়া মাটির পুরোতন পাইপ বার করে তামাকপাতা ভরতে লাগল। বিচিত্র রেখা-কাটা কপালের নীচেয় ওর চোখদুটি তখনো বেশ জ্বলজ্বলে ছিল।

—মাশয়, যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটু বসে পড়ছি। আজ আমার পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে।

এই কথা বলে বুড়ো লোকটি মাটির ওপর বসে পড়ল।

—এই কবরের ওপর সব সময়ে একটা না একটা ফুল দেওয়া থাকে। আর এখানটা বিশেষ জনশূন্য বা নিরালাও থাকে না। পাশের পথ দিয়ে আজকাল প্রায়ই সাহসী লোকেরা সব যাতায়াত করে—তাদের নতুন মোটরগাড়ি করে। চাল-চলন ত আর পুরোতন দিনের মত নেই। তাই মরা মেয়েটা সঙ্গী পায়। জানেন, একটা অভাগী মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

অ্যাসহারস্ট বললে, ওঃ, তাই নাকি? বোধহয়, সেই কারণেই রাস্তার মোড়ের মাথায় ওই কবর। আমি জানতুম না যে, সেই পুরোতন প্রথা এখনো চালু আছে।

—আহা, এযে অনেকদিন আগেকার ঘটনা! আমরা—এই এলাকার বাসীন্দারা আর আমাদের পুরুতমশাই সকলেই তখন খুব ধর্মভীরু ছিলুম। আচ্ছা, হিসেব করে বলছি। আমার পেনসন হয়েছে—আসছে মাইকেল মাস উৎসবের দিন এলে ছ বছর পুরো হবে। আর এ ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমার ঠিক বয়স ছিল দু কুড়ি আর দশ। জানেন, এই ঘটনার সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশী জানে—এমন কোন লোক আর এ অঞ্চলে বেঁচে নেই। ওই যে ওখানে—খুব কাছেই মেয়েটি বাস করত। যেখানে আমি কাজ করতুম—মিসেস নারাকোমের খামার,—সেখানেতেই ও-ও কাজ করত। খামারটার মালিক এখন নিক নারাকোম হয়েছে। এখনো বটে আমি তার কিছু কিছু কাজকম্ম করে দিই,—সময়ে-অসময়ে দরকার পড়লে।

—তাই নাকি?

অ্যাসহারস্ট বুঝতে পারলে, তার গলা দিয়ে অদ্ভুত এক ভাঙা আওয়াজ বার হল।

—আহা, বেচারী মেয়েটা। অমন ভাল মেয়ে শতকে একটা মেলে না, মাশয়। আমি যখনই এখান দিয়ে যাই, একটা ফুল কবরের ওপর রেখে যাই। কি আর বলব? যেমন সুন্দরী, তেমনি ভাল মেয়ে ছিল। তবু ওরা ওকে গির্জের বাগানে বা ও যেখানে ওর কবর দেবার কথা জানিয়ে গেছল,—দুয়ের কোনখানেই কবর দিলে না।

বুড়ো কিসান কথা বন্ধ করে ওর লোমভরা, চামড়া-কোঁচকানো হাতখানা কবরের বুকে নীলমণি ফুলের পাশে বুলিয়ে দিলে।

অ্যাসহারস্ট জিজ্ঞাসা করলে, তারপর?

—আমার ধারণা, এটা ছিল ভালবাসার ঘটনা। অবশ্য এমন কেউ নেই যে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারে। একজন মেয়ের মনে কি যে আছে, তা আপনিও বলতে পারবেন না। তবে আমার বিশ্বাস, এটা ভালবাসারই ব্যাপার ছিল।

বুড়ো কিসান কবরের ওপর থেকে হাত তুলে নিয়ে বলে যায়, মেয়েটিকে আমি খুব স্নেহ করতুম। ওকে স্নেহ করত না—এমন কোন লোক ছিল না। ওর বুকে কত যে ভালবাসা ছিল, কি বলব! আমার ত ধারণা এই।

ও কথা বন্ধ করে ওপর দিকে তাকালে। অ্যাসহারস্টের দাড়িতে ঢাকা-পড়া ঠোঁট দুটি তখন কাঁপছিল। সে আস্তে আস্তে পুনরায় প্রশ্ন করলে, তারপর?

—তখন ছিল বসন্তকাল। বা হয়ত এখনকার মত সময়, কিছু আগে না-হয় পিছে। ফুল-ফোটার দিন। খামারে ঠিক সেই সময়ে একজন কলেজে-পড়া, তরুণ ভদ্রলোক এসে বাস করছিল। চমৎকার ছোকরাটি,—বেশ ভাবুক মতন আর কি ? তাকে আমার খুব পছন্দ হত। ওদের দুজনের মধ্যে কিছু হতে কিন্তু আমি কখনো দেখিনি। তবে, আমার ধারণা, তাকে মেয়েটার খুব ভাল লেগেছিল।

বুড়ো কিসান মুখ থেকে পাইপ টেনে নিয়ে থুথু ফেললে, পরে বলতে লাগল, তারপর কি হল, জানেন ? সেই ছেলেটি হঠাৎ একদিন খামার ছেড়ে চলে গেল, —আর ফিরে এল না। তার কিছু কিছু জিনিসপত্তর এখনো খামারে রাখা আছে। আমার মনে কিন্তু এই কথাটার জবাব পাই নি, জানলেন ? কথাটা হচ্ছে, সে তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠায় নি কেন ? তার নাম ছিল আসেস বা ওই রকম একটা কিছু।

অ্যাসহারস্ট আর একবার জিজ্ঞাসা করলে, তারপর ?

বুড়ো কিসান ওর ঠোঁটে জিব বুলিয়ে বললে, মেয়েটি নিজের মুখে অবশ্য কখনো বলে নি, তবে সেদিন থেকে ওর দৃষ্টি যেন কেমন দিশেহারা মতন হয়ে গেল। আমার জীবনে কোন মানুষকে হঠাৎ অত বদলে যেতে দেখিনি। খামারে আর একজন তরুণ, কম বয়সী ছোঁড়া ছিল, নাম ছিল জো বিডাফোরড। আমার অনুমান, সে ওকে মাঝে-মাঝে জ্বালাতন করত। যাহোক, মেয়েটি দেখতে দেখতে পাগলের মতন হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা আমি বাছুরদের খাবার দিতুম। তখন এক একদিন দেখতে পেতুম, ও ফলবাগানের বড় আপেল গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে আছে। আমি নিজের মনে বলতুম, তোমার কি হয়েছে মেয়ে, তা আমি জানি না। কিন্তু তোমাকে দেখলে বড় কষ্ট হয়।

বুড়ো পাইপের মুখ নতুন করে জ্বালালে ; তারপর কতকিছু ভাবতে ভাবতে পাইপ টানতে লাগল।

—তারপর ?

—আমার মনে পড়ছে, একদিন আমি ওকে বললুম, তোমার ব্যাপার কি হয়েছে, বল তো মেগান। ওর নাম ছিল মেগান ডেভিড। এসেছিল ওয়েলস অঞ্চল থেকে। ওর মাসী মিসেস নারাকোমও সেখানকার মেয়ে ছিল। আমি বললুম, তুমি মনে মনে যেন বড় কষ্ট পাচ্ছ। ও বললে, না জিম। কোনও কষ্ট নেই

আমার। আমি তখন বললুম, নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছ। ও জবাব দিলে, না—না। বলতে-বলতে ওর দুচোখ দিয়ে হু-হু করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি বললুম, একি, তুমি যে কাঁদছ! তাহলে এর মানে কি? তখন ও ওর বুকের ওপর আস্তে আস্তে হাত চাপড়ে বললে, এইখানে কষ্ট হচ্ছে। তা শিগগির ভাল হয়ে যাবে। তারপর আবার বললে, কিন্তু জিম, যদি আমার কিছু ঘটে যায়, আমি চাই, এই এখানে আপেল গাছের তলায় যেন আমাকে কবর দেওয়া হয়। ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম। বললুম, তোমার আবার কি হবে, শুনি? বোকার মতন যত বাজে কথা বলো না। ও জবাব দিলে, না, না, বোকার মতন কথা বলব না।—তা, মাশয়, মেয়েরা যে কি চীজ, তা ত আমার জানা ছিল। তাই আমি ওর কথা নিয়ে আর কিছু ভাবি নি। তারপর মাত্র দু-দুটো দিন কেটেছে। এই কথাবার্তা হবার মাত্র দুদিন পরে সন্ধ্যে তখন হয়-হয়, সেই সময়ে আমি মাঠ থেকে বাছুরগুলোকে চরিয়ে ফিরে আসছিলুম, এমন সময়ে দেখতে পেলুম, ওই বড় আপেল গাছটার কাছে ঝরনার জলে কালো রঙের কি একটা পড়ে রয়েছে। নিজের মনে বলে উঠলুল, ওটা একটা শূয়োর ছানা নাকি? শূয়োর ছানার শোবার জন্যে মজার জায়গা বটে! তারপর কাছে দিয়ে দেখি, একি!

বুড়ো কিসান চুপ করলে। ওপর দিকে তোলা ওর চোখ দুটিতে ফুটে উঠল কাতর চাহনি।

—এ যে আমাদের মেগান! ঝরনার পাড়ে পাহাড়ের কোলে জলভরা একটা ছোট গর্তের মতন ছিল। সেই তরুণ ভদ্রলোককে ওই গর্তের মধ্যে একদিন দুদিন কেন—কয়েকদিন নাইতে দেখেছিলুম। সেই জলভরা পুলের মধ্যে মুখ ওপর দিকে তুলে ও শুয়েছিল। যখন আরো কাছে এসে ওর মুখের দিকে চাইলুম। আহা, কি সুন্দর, সুশ্রী, কচি বাচ্চাদের মতন শান্ত ওর মুখখানা। সত্যি, চমৎকার সুন্দর তা দেখতে হয়েছিল। ডাক্তারবাবু এসে বললে, পুলের ওইটুকু জলে ও ডুবে মরতে পারে না—যদি-না ভিরমি রোগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে থাকে। আহা, ওর মুখ দেখে মনে হল, সত্যিই হয়ত তা-ই হয়েছিল। আমি কেঁদে ফেললুম। তখন জুন মাস। তবু কোথা থেকে এক গোছা আপেল ফুল জোগাড় করে মেগান মাথার চুলে গুঁজে রেখেছিল। আমি ওদের সকলকে বললুম, ও আমাকে একদিন বলেছিল, আপেল গাছের তলায় যেন ওকে মাটি দেওয়া হয়। তা শুনে লোকে বললে, তাহলে ত ও আগে থেকে ভেবে চিন্তে

এ কাজ করেছে,—এ ত রীতিমত আত্মহত্যা। তাই সকলে মিলে শেষকালে মেগানকে এইখানে কবর দিলে। তখন যে আমাদের পুরুত ছিল, সে ছিল খুব গোঁড়া লোক। হাঁ, গোঁড়া লোকই বটে।

বুড়ো মানুষটি পুনরায় একবার কবরের ওপরকার মাটিতে হাত বুলিয়ে নিলে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল, অবাক লাগে, কুমারী মেয়েরা ভালবাসার জন্যে কি না করতে পারে! মেগানের বুক ছিল মমতায় ভরা। আমার অনুমান, কে যেন ওর বুক ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা কখনো কিছু তেমন দেখতে পাই নি।

ও ওপর দিকে চোখ তুলে তাকালে—যেন ওর অনুমানের সম্বন্ধে সমর্থন পাবার আশায়। ইতিমধ্যে অ্যাসহারস্ট ওর পাশ দিয়ে খানিকটা আগে চলে গেছল। যেখানে লাঞ্চ খাবার জায়গা করেছিল, তা ছাড়িয়ে পাহাড়ের উঁচুতে একটা নিরালা কোণে সে মুখ নীচু করে শুয়ে পড়ল। মনের দর্পণে খেলে গেল নানা ভাবনা। তাহলে ওর নিজের নিষ্পাপ পবিত্রতা পেয়েছে তার যোগ্য পুরস্কার আর ভালবাসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি—সেই 'সিপ্রিয়ান' গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রতিশোধ! সহসা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মেগানের মুখখানি। চোখ দুটি অশ্রুভরা, ভিজে কালো মাথায় গোঁজা আপেলমঞ্জরীর একটি শাখা। সে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি অন্যায় করেছিলুম?—হায়, অন্যায়টা কী করেছিলুম?

অ্যাসহারস্ট নিজের মনের মধ্যে কোন উত্তর খুঁজে পেলে না। সেদিন বসন্ত এসেছিল বাসনার বন্যা নিয়ে—তার ফুল ও গানের ডালি পরিপূর্ণ করে। বসন্ত এসেছিল তার হৃদয়ে আর মেগানের হৃদয়ে। হায়, একি শুধু ভালবাসার দেবীর শিকার খুঁজে বেড়ানো! তাহলে ত এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীকরাই সত্যবস্তুর সন্ধান পেয়েছিল। "হিপপোলাইটিস"-এ তাদের সেই বিশ্বাস যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সে কথা ত দেখছি আজও সত্য!

গ্রীকরাই ঠিক! মেগান! অভাগী কিশোরী মেয়েটি—পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে নেমে-আসা মেগান! পুরানো আপেল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে-থাকা মেগান। মুখের ওপর স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অর্ঘ নিয়ে মরণের বুকে ঢলে-পড়া মেগান!

সহসা কে যেন বলে উঠল, ওহো, তুমি এখানে! দেখ ত কেমন হল?

অ্যাসহারস্ট দাঁড়িয়ে উঠে স্ত্রীর হাত থেকে ওর আঁকা স্কেচখানা নিয়ে নীরবে দেখতে লাগল।

—ফ্রাঙ্ক, সামনের পরিবেশটা ঠিক হয়েছে ?

—হাঁ।

—তবু কিন্তু মনে হচ্ছে, কি যেন একটা নেই।

অ্যাসহারস্ট চুপ করে মাথা নেড়ে 'হাঁ' জানালে।

কি যেন নেই ? হাঁ আপেল গাছটি, গানের স্বর আর সোনার রঙের শোভা!

॥ বারলিনের অবরোধ ॥

॥ অ্যালফন্‌স দদে-র লেখা ॥

[ফরাসী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কথাকার অ্যালফন্‌স দদে। জন্ম ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে। ছোটগল্প রচনার কাজে ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর সূক্ষ্ম শিল্পী।

বিশ্বসাহিত্যে যে কয়েকটি ছোটগল্প সর্বশ্রেষ্ঠ বলে খ্যাতিলাভ করেছে, আলোচ্য রচনা তাদের মধ্যে একটি।

ফরাসীজাতির চিরশত্রু জার্মানরা প্যারিস শহর অবরোধ করেছিল—ফরাসী ইতিহাসের সে এক বিখ্যাত ঘটনা। দদে এই অবরোধকে ভিত্তি করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক চালচিত্রের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের এক অনুপম চিত্র। কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সৃষ্টি হয়েছে নায়ককে ছাড়িয়ে নায়কের নাতনীর অপরূপ চরিত্র। পরম ছলনাময়ী এক কিশোরী—মহিমার দীপ্তিময়ী মূর্তি। অন্তরে তার একদিকে স্বার্থহীন কৈশোরের ভক্তি-ভালবাসা আর একদিকে সদ্য-ফোটা প্রাণোজ্জ্বলতার প্রেরণায় রহস্যময় ত্যাগ-স্পৃহা। কাহিনী পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জাগে, এইটুকু কিশোর হৃদয়ে কোথা থেকে এল এমন অপূর্ব ছলনার পর ছলনার যত কলাকৌশল! ইতিহাসের ইঙ্গিত লঙ্ঘন করে দুটি চরিত্রই চরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে—এরা যেমন বাস্তববৎ, তেমনি প্রাণধারার বন্যাকে বুকে নিয়ে নিত্য-চঞ্চল। Illusion of reality-র মায়াচ্ছন্নতায় পাঠক ভুল করে ভাবে, এরা যেন প্রত্যক্ষ. এদের লীলা চলছে যেন আমাদের চোখের সামনে।

টেকনিকের দিক থেকে লেখনটি অসাধারণ। ক্ষুদ্র পরিসর, অল্পকথা—কাহিনী ও চরিত্র বর্ণন অতিশয়োক্তি ও অপ্রয়োজনীয় অলংকরণ বর্জিত। লেখনের সমগ্র কাঠামো থেকে একটি শব্দও যেন বাদ দেওয়া যায় না—প্রকাশ রীতিতে এমনই ঠাস বুনানির কারুকার্য।

দদে দেহত্যাগ করেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে।]

শাঁজ এলিজে দিয়ে ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছিলুম। যেতে যেতে কখন-বা গোলালাগা, ভাঙা দেওয়াল থেকে, কখন-বা গুলির টুকরো-ভরা, বাঁধানো রাস্তা থেকে এটা সেটা কুড়িয়ে নিচ্ছিলুম। সেগুলো যেন প্যারিস শহরের এক-এক টুকরো ইতিহাস। হঠাৎ আর্ক ছ ত্রিঁয়ফ-এর এক কোণে একটা বাড়ির সামনে থেমে ডাক্তার বললেন, ঐ সামনের বারান্দায় সার সার চারটে জানালা দেখতে পাচ্ছ, ওখানে ১৮৭০ সালে একদিন একজন মৃগী রোগীকে চিকিৎসা করবার জন্য একটা ডাক পেয়েছিলুম। তখন অগাস্ট মাস, সেই ইতিহাস-বিখ্যাত, ভয়ংকর অগাস্ট মাস। রোগীর নাম করনেল জুভ। তিনি ছিলেন "প্রথম সাম্রাজ্য" আমলের একজন ঘোড়সওয়ারী সেনা,—স্বদেশপ্রেম আর বীরত্বের প্রেরণায় পাগল। জার্মানদের সঙ্গে আমাদের লড়াই শুরু হতেই শাঁজ এলিজেতে এই বারান্দাওলা বাসাটি ভাড়া করেছিলেন। কি উদ্দেশ্য জান? আমাদের সৈন্যদল যুদ্ধজয় করে যখন ফিরে আসবে, তাদের সেই বিজয় যাত্রা দেখবেন বলে। আহা, বেচারীর যেমন অদৃষ্ট! সেদিন খাওয়া শেষ করে সবেমাত্র তিনি টেবিল থেকে উঠে আসছিলেন, এমন সময় এসে পৌঁছল উইসেমবুর্গের খবর। ফ্রান্সের পরাজয়ের খবরের তলায় লুই নেপোলিঅন-এর সই চোখে পড়তেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন।

আমি গিয়ে দেখলুম, বুড়ো করনেল লম্বা হয়ে মেঝের ওপরে শুয়ে আছেন —লাঠির ঘা খেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি অসাড়। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। মানুষটি শুয়েছিলেন, তবু দেখাচ্ছিল যেন কত লম্বা। দাঁড়ালে না জানি আরো কত লম্বা দেখাত! সুঠাম শরীর, দাঁতগুলি চমৎকার ধবধবে, কোঁকড়ানো চুল, আশি বছর বয়স, কিন্তু দেখতে যেন সবেমাত্র ষাটে পড়েছেন। বুড়োর পাশে তাঁর নাতনী বসেছিল, চোখ দুটি জলে-ভরা। দাদামশাই-এর সঙ্গে তার চেহারার খুব মিল। শুধু একজনের মুখখানা পুরনো, বয়সের রেখায় ভরা, আর একজনের মুখখানা পরিষ্কার, সুন্দর, দীপ্তিময়।

মেয়েটিকে দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার বাপ লড়াই-এ গেছেন আর সামনে দাদামশাই-এর এই অবস্থা! এ দেখে হয়ত বাবার জন্যও তার প্রাণটা ভয়ে কেঁদে উঠেছিল। আমি যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম, যদিও জানতুম, বুড়োর সম্বন্ধে কোন আশা নেই। কর্তব্যবোধে ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব বন্ধ করবার চিকিৎসা আমাকে করতে

হল। কিন্তু আশি বছর বয়সে এরকম রক্তস্রাব থেকে প্রাণ ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সেই অনড় অচল অবস্থায় রোগীর তিনদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে এসে পৌঁছল রাইখ্‌শোফেন এর খবর। মনে আছে তোমার সেই রহস্যময় ব্যাপারটা? সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা সকলেই জানতুম, ফ্রান্স একটা বড় রকম জয়লাভ করেছে, বিশ হাজার প্রাশিআন মরেছে আর প্রাশিআন যুবরাজ বন্দী হয়েছেন।

তিনদিন পরে রোগীকে দেখতে গিয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। গত ক-দিন ধরে চারিদিকের কোন কিছু অনুভব করবার লেশমাত্র বোধ যে মানুষের ছিল না, কোন্ জাদুকরের শক্তিতে জানি না, সেই মানুষের মনে গিয়ে পৌঁছেছিল সেদিনকার জাতীয় আনন্দের প্রতিধ্বনি। তিনি যেন একেবারে নতুন মানুষটি হয়ে গেছলেন। তাঁর ঘোলাটে চোখ দুটি পরিষ্কার হয়ে গেছল, কথা বলতে আর ততটা কষ্ট হচ্ছিল না। আমাকে দেখে একফালি হেসে আস্তে আস্তে বললেন জয় হয়েছে আমাদের।

বললুম, হাঁ। করনেল, একটা বড় রকমের জয় আমাদের হয়েছে। তারপর যখন আমাদের সেনাপতির বিজয়কীর্তির খুঁটিনাটি তাঁকে গল্প করতে লাগলুম, তাঁর মুখ আনন্দের দীপ্তিতে ভরে উঠল। তাঁর অনড় অঙ্গে অঙ্গে ফিরে এল প্রাণ।

যখন রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, দেখতে পেলুম, বুড়োর নাতনী আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। কেঁদে কেঁদে তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমি তার হাত দুটি ধরে বললুম, এ যাত্রা করনেল রক্ষা পেয়েছেন।

আবেগে মেয়েটি আমার কথার জবাব দিতে পারলে না। রাইখ্‌শোফেন-এর আসল খবরটা সবেমাত্র বেরিয়েছিল আমাদের সেনাপতি পলাতক, যুদ্ধে সমস্ত ফরাসী-বাহিনী ধ্বংস হয়েছে।

আমরা দুজনে আতঙ্কে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম। মেয়েটি তার বাবার ভাবনায় আকুল, আর আমি ভয় পাচ্ছি তার দাদামশাই-এর জন্য। এ খবর পেলে বুড়ো আর কিছুতেই বাঁচবেন না। এখন উপায়ই বা কি? যে বিজয় আনন্দের প্রেরণায় তিনি শক্তি ফিরে পেয়েছেন, সেই মিথ্যা আশার ছলনায় তাঁকে ভুলে থাকতে দেব? তাহলে কিন্তু আবার আমাদের প্রতারণা করার পাপে পড়তে হয়!

সাহসী মেয়েটি সব শুনে বললে; আচ্ছা, দাদুকে ঠকানোর ভার আমিই নিলুম। এই বলে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ও হাসিমুখে গিয়ে ঢুকল দাদামশাই-এর ঘরে।

ওর কাজটা সত্যিই ভীষণ শক্ত ছিল। প্রথম দু-একদিন অবশ্য সহজেই হল, কেন-না, বুড়োর মাথা তখনও দুর্বল ছিল। ছোট ছেলের মত যা শুনলেন, তা-ই বিশ্বাস করলেন। কিন্তু সুস্থ হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল। রোজকার খবর তাঁকে বানিয়ে বলা হত। তার জন্য বেচারী মেয়েটিকে দিনরাত জার্মানীর একটি মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে থাকতে হত। এই হয়ত সেনাপতি বারজেন বারলিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, ফ্রসার্ড ব্যাভিরিয়ায় লড়াই করছেন, ম্যাকমাহন বাল্‌টিক সাগরে ব্যস্ত,—এমনি নানা আবিষ্কারের জন্য সে ছোট ছোট নিশেন দিয়ে মানচিত্রটিতে চিহ্ন দিত। এ কাজে অবশ্য মেয়েটি আমার পরামর্শ নিত। আমি সাধ্যমত ওকে সাহায্য করতুম। কিন্তু কাল্পনিক যুদ্ধ অভিযানের ব্যাপাবে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাওয়া যেত ওর দাদামশাই-এর কাছ থেকে। প্রথম সাম্রাজ্যের আমলে তাঁরা বরাবর জার্মানী দখল করেছিলেন। তাই আগে থেকেই যুদ্ধের সব চাল তাঁর জানা ছিল। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বলতেন, এখন ওদের ঐখানে যাওয়া উচিত। এইবার ওদের এই করা দরকার। আর তাঁর এই সব ভবিষ্যৎবাণী সফল হচ্ছে দেখে তাঁর মন গর্বে ভরে উঠত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে. আমরা যত শহরই দখল করি না কেন,—যতবারই জয়লাভ করি না কেন, বুড়োর মন কিছুতেই উঠত না। কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। দেখা হলে রোজই মেয়েটি আমাকে একটি নতুন কাল্পনিক জয়লাভের খবর দিত। মুখে মর্মান্তিক এক ফালি হাসি এনে বলত, ডাক্তার, আমরা আজ অমুক শহর দখল করেছি। আর দরজার পার থেকে শুনতে পেতুম একজনের আনন্দভরা কণ্ঠস্বর, আমরা বেশ এগুচ্ছি, ডাক্তার। আর এক সপ্তার মধ্যে বারলিনে গিয়ে নিশ্চয়ই ঢুকব।

এদিকে আসল খবর হচ্ছে, সপ্তাহখানেকের মধ্যে প্রাশিআনরা প্যারিসে এসে পড়বে। প্রথমে আমরা ভাবলুম, এখান থেকে মফঃস্বলে কোথাও চলে যাব। কিন্তু বাড়ির বার হলেই দেশের অবস্থা দেখে বুড়ো আসল কথাটা ধরে ফেলবেন। অথচ তিনি এত দুর্বল যে, আসল কথাটা জানলে আর রক্ষে নেই। তাই শেষকালে ঠিক হল, এই বাড়িতেই থাকা হবে।

প্যারিস অবরোধের প্রথম দিনে রোগীকে দেখতে গেলুম। আমার বেশ মনে পড়ে সে-দিনটা। প্যারিসের গেটগুলো বন্ধ করা হয়েছে, শহরতলিতে চলছে লড়াই। গভীর উদ্বেগে শহরবাসী সকলেই উৎকণ্ঠিত। আমারও মনটা ভাল ছিল না। গিয়ে দেখি, বুড়োর গর্ব ও আনন্দের সীমা নেই। তিনি বললেন, অবরোধ যে আরম্ভ হয়েছে, ডাক্তার।

তাঁর কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। তারপরে বললুম, আপনি এ খবর কি করে জানলেন, করনেল?

তাঁর নাতনী আমার দিকে ফিরে জবাব দিলে, হাঁ ডাক্তার, একটা মস্ত খবর পাওয়া গেছে। বারলিনের অবরোধ আরম্ভ হয়ে গেছে। হাতের ছুঁচ টেনে নিয়ে ও এমন শান্তভাবে কথাগুলো বললে, বুড়োর সাধ্য কি যে সন্দেহ করেন! তিনি কামানের শব্দও কানে শুনতে পাননি। প্যারিসের সেই বিশৃঙ্খল থমথমে অবস্থাও চোখে দেখেননি। তাঁর রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে যা কিছু দেখছিলেন, তা সবই তাঁকে ভুলের মধ্যে মশগুল রাখার জন্য সযত্নে বানানো হয়েছিল। বাইরে ছিল বিজয় তোরণ আর ঘরের মধ্যে ছিল প্রথম সাম্রাজ্যের স্মৃতি চিহ্নের বেশ একটি সংগ্রহ। ফরাসী প্রধান সেনাপতিদের পট, নানা যুদ্ধের ঘটনাবলীর খোদাই-করা ছবি, তামার মূর্তি, কাঁচে-ঢাকা সেণ্ট হেলেনার একটুকরো পাথর—এমনি কত কি! আমাদের গল্পের চেয়েও এই সব স্মৃতি চিহ্নের প্রভাবে এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি অম্লান বদনে বিশ্বাস করতেন, বারলিন অবরোধ করা হয়েছে।

সেদিন থেকে আমাদের সামরিক কার্যকলাপ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। এখন বারলিন দখল করা কেবল ধৈর্যসাপেক্ষ। যখন বুড়ো অপেক্ষা করে করে অধীর হয়ে উঠতেন, তখন প্রায়ই তাঁকে শোনানো হত তাঁর ছেলের চিঠি। অবশ্য এসব চিঠি কাল্পনিক। কেননা, তখন প্যারিস শহরের মধ্যে বাইরে থেকে কিছুই আসবার উপায় ছিল না। আর সেডান যুদ্ধের পর বুড়োর ছেলেকে বন্দী করে জার্মান দুর্গে রাখা হয়েছিল। তখন মেয়েটির মনের কি সাংঘাতিক অবস্থা! তার বাপ বন্দী,—সব রকম সুখ ও আরামের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত, হয়ত পীড়িত। তবু তাঁরই জবানিতে যেন সত্যি-সত্যি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লেখা ছোট ছোট চিঠির আকারে মিথ্যে তৈরী করতে হচ্ছে,—যেন জয়-করা জার্মানীর বুকের ওপর দিয়ে ফরাসীরা বিজয় গর্বে এগিয়ে চলেছে।

কখন-কখন যখন করনেল বেশী দুর্বল হয়ে পড়তেন, তখন নতুন খবর আসতে দিনের পর দিন কেটে যেত। কিন্তু যখন তাঁর উৎকণ্ঠা বাড়ত কিছুতেই ঘুম হত না, হঠাৎ জার্মানী থেকে একখানা চিঠি এসে পৌঁছত। কান্নার বেগ জোর করে চেপে হাসির ভান করে মেয়েটি সেই চিঠি বুড়োকে পড়ে শোনাত। তিনি একান্ত ভক্তিভাবে শুনতেন। মুখে কখন গর্বের হাসি ফুটে উঠত, কখন কোন কাজের প্রশংসা করতেন, কখন-বা দোষ ধরতেন. কখন বা নিজেই ব্যাখ্যা করতেন। সবচেয়ে তাঁর মনে উৎসাহ জাগত যখন তিনি ছেলের চিঠির জবাব লিখতেন : তুমি যে একজন ফরাসী একথা কখনও ভুলে যেও না। বেচারী জার্মানদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করো। তোমাদের এই আক্রমণটা তাদের যেন দুর্দশার চরম সীমায় না নিয়ে যায়।

বুড়োর পরামর্শের আর শেষ ছিল না। পরের সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং মেয়েদের প্রতি শিষ্টাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে কত উপদেশ! এক কথায় বিজয়ীদের কর্তব্য সম্বন্ধে যেন একটি সামরিক সংহিতা তৈরি করেছিলেন। এই সবের মধ্যে আবার সাধারণ রাজনীতি সম্বন্ধে মতামতও থাকত—জয়লাভের পর জার্মানদের ওপর সন্ধির কি কি শর্ত চাপাতে হবে, তারও কথা থাকত। অবশ্য একথা বলব যে, বুড়ো জার্মানদের কাছ থেকে বেশী কিছু দাবী করতেন না। তিনি লিখেছিলেন : যুদ্ধের ক্ষতি পূরণের জন্য অর্থদণ্ড শুধু, আর কিছুর দরকার নেই। রাজ্য দখল করে কি হবে? জার্মানীকে কি কেউ কখন ফ্রান্সে পরিণত করতে পারবে?

লেখবার সময় বুড়ো এই কথাগুলোকে এমন দৃঢ়কণ্ঠে গভীর দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করতেন যে, তা শুনে কারোর পক্ষেই অবিচলিত থাকা সম্ভব হত না।

ইতিমধ্যে অবরোধ পুরোদমেই চলছিল, অবশ্য বারলিনের অবরোধ নয়। প্যারিস শহরে তখন গোলাবর্ষণ, মারী, দুর্ভিক্ষ চরমে উঠেছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ছিল হাড়-কাঁপানো শীত। কিন্তু আমাদের একান্ত যত্ন ও সতর্কতায় বুড়োর স্বপ্নরাজ্যে এর একটুও ছোঁয়াচ লাগেনি। শেষ পর্যন্ত আমি সাদা রুটি আর তাজা মাংস ঠিক যোগাতে পেরেছিলুম—অবশ্য কেবল বুড়োর জন্যই। তাঁর সেই সকালবেলার ভোজন পর্বটা কি মর্মস্পর্শী দৃশ্যই না হত। বুড়ো নিরীহ গর্বের সঙ্গে বিছানায় উঠে বসতেন, তাঁর তাজা মুখে হাসির রেখা, গলার নীচেয় ন্যাপকিন বাঁধা। পাশে বসে অনাহারে শীর্ণ নাতনী তাঁর হাত ধরে খেতে

সাহায্য করত—এমন সব ভাল ভাল খাবার, যা তখন প্যারিসে খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল।

খেয়ে দেয়ে চাঙ্গা হয়ে দোরজানালা-বন্ধ গরম ঘরটিতে আরাম করে বসে বুড়ো করনেল তাঁর উত্তর ইউরোপের অভিযানের গল্প বলতে ভালবাসতেন। কখন কখন বলতেন রাশিয়ার যুদ্ধে সর্বনেশে পিছু হটার গল্প। সে সময় বরফে-জমা বিস্কুট আর ঘোড়ার মাংস ছাড়া আর কিছু তাঁদের খাবার জুটত না।

—খুকু, বুঝেছিস? আমরা ঘোড়ার মাংস খেতুম! বুড়ো সস্নেহে বলতেন।

মেয়েটির কাছে এ খবরে অবশ্য নতুনত্ব কিছুই ছিল না। কারণ দুমাস ধরে ঘোড়ার মাংস ছাড়া আর কিছু খাবার ত ওর জুটছিল না! যাহোক, বুড়ো ক্রমশঃই সেরে উঠতে লাগলেন, আমাদের কাজও দিন দিন কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর ইন্দ্রিয় ও অঙ্গের যে অসাড়তার জন্য আমাদের এতদিন খুব সুবিধা হয়েছিল, তা ক্রমশঃই দূর হতে লাগল। তিনি এর মধ্যে দু একবার পোর্ট মেলোর কামানের ভয়ংকর শব্দ যুদ্ধের ঘোড়ার মত কান খাড়া করে শুনেছিলেন। বাধ্য হয়ে আমাদের গল্প বানিয়ে বলতে হল, বারলিনের সামনে একটা লড়াই-এ আমাদের জয় হয়েছে, সেই জয়ের সম্মানার্থে তোপধ্বনি হচ্ছে।

আর একদিন তাঁর বিছানাটা জানালার ধারে সরিয়ে আনা হয়েছিল। সে সময় সামনের পথে জমা হয়েছিল ন্যাশানাল গার্ডের একদল সৈন্য। তা দেখে বুড়ো চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরা কার সেনা? তারপর কেবলই গুঁজগুঁজ করে বলতে লাগলেন, কিছুই শেখানো হয়নি ওদের!

অবশ্য এ ঘটনা থেকে কিছু খারাপ ফল হয়নি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলুম আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।

তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি মেয়েটি ভীষণ ভাবনায় পড়েছে। ও বললে, কাল যে ওরা প্যারিসে ঢুকবে!

বুড়োর ঘরের দরজাটা হয়ত খোলা ছিল, তিনি বোধ হয় আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। এখনও আমার বেশ মনে আছে, সেদিন সারারাত তাঁর মুখে এক অপূর্ব দীপ্তি লক্ষ করেছিলুম। আমরা বলেছিলুম, প্রাশিআনদের প্যারিসে ঢোকবার কথা। তিনি হয়ত বুঝেছিলেন ফরাসীদের বারলিনে ঢোকবার কথা। তাঁর অনেক দিনের আশা, বিজয়ী মারশাল ম্যাকমাহন তূর্যধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্যারিসে ফিরে আসবেন, তাঁর ছেলে ম্যাকমাহনের পার্শ্বচর হিসাবে ঘোড়ায় চড়ে আসবে সেনাপতির পাশে

আর তিনি পুরোতন উর্দি পরে বারান্দা থেকে বারুদের দাগ-লাগা, ঈগল-আঁকা পতাকাকে অভিবাদন করবেন। আজ হয়ত সেই আশার স্বপ্নে তাঁর মন ভরে উঠেছিল।

হায়! বুড়ো ভেবেছিলেন, অসুখ বাড়বার ভয়ে তাঁকে এইভাবে বিজয়ীদের অভিবাদন করতে হয়ত আমরা দেব না। তাই তাঁর মনোগত অভিপ্রায় আমাদের মোটেই জানতে দেন নি। পরের দিন ঠিক যে সময়ে বিজয়ী প্রাশিআন সৈন্যদের শোভাযাত্রা এসে হাজির হল, বুড়ো করনেল জানালাটি আস্তে আস্তে খুলে এসে হাজির হলেন বাইরের বারান্দায়। মাথায় পুরোতন শিরস্ত্রাণ, কোমরে লম্বা তলোয়ার। অঙ্গে অতীত দিনের গৌরবে-ভরা, নেপোলিঅন-এর আমলের সামরিক সাজ। দুর্বল শরীরে সামরিক কায়দায় অমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে তাঁর না-জানি কি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়েছিল! কিন্তু রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, রাস্তাগুলো এমন চুপচাপ কেন, সব বাড়িতে জানালা বন্ধ, প্যারিস্ যেন যত অসাড় মানুষে ভরতি হয়ে গেছে! চারিদিকে পতাকা উড়ছে কিন্তু একি অদ্ভুত পতাকা! লাল ক্রস-আঁকা যত সব সাদা সাদা পতাকা! আমাদের বিজয়ী সেনাদের অভিবাদন জানাবার জন্য কই কেউ ত আসে নি? মুহূর্তের জন্য হয়ত তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল, সব তিনি ভুল দেখছেন। কিন্তু না, তা ত নয়। বিজয় তোরণের পিছনে একটা কিসের গোলমাল, ভোরের অস্পষ্ট আলোয় যেন এগিয়ে আসছে কিসের একটা কালো রেখা! ঐ ত শিরস্ত্রাণের মাথাগুলো ঝিকমিক করে উঠছে, ছোট ছোট জয়ঢাক যেন বেজে উঠল, তরবারির ঝনঝনার শব্দের সঙ্গে ও কিসের আওয়াজ! এ যে শুবেয়ার রচিত বিজয়-সংগীত!

পথের সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে কে একজন চিৎকার করে উঠল, ঃযে যেখানে আছ সবাই অস্ত্র হাতে নাও, অস্ত্র হাতে নাও! প্রাশিআন বেটারা এসে পড়েছে!

শোভাযাত্রাকারী সেনার দল দেখতে পেলে, দূরে ওপরের বারান্দা থেকে একজন দীর্ঘকায় মানুষ চিৎকার করতে করতে নীচেকার রাস্তায় পড়ে গেল।

এইবার করনেল জুভ প্রাণ হারালেন।

॥ ছোট্ট জলকুমারী ॥

॥ হ্যান্‌স ক্রিসটিয়ান অ্যানডারসন-এর লেখা ॥

[ডেনমারক দেশের সর্বজন-শ্রদ্ধেয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথী হচ্ছেন হ্যান্‌স ক্রিসটিয়ান অ্যানডাবসন। জন্মেছিলেন ২ এপ্রিল, ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে।

মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল উদার, স্নেহশীল, মানুষের প্রতি আন্তরিক মমতায় ভরা। প্রেমিক হিসাবে তাঁর মত মানুষ সংসারে খুব কম দেখা যায়। তিনি জন্মেছিলেন গবিবের ঘরে। প্রথম জীবনে ভালবেসেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী পরিবারেব মেয়েকে। কিন্তু সে ভালবাসার পরিণতি ঘটে ব্যর্থতায়। আশ্চর্য এই যে, তাঁর জীবিতকালে কেউই বুঝতে পাবেনি যে, এই ব্যর্থতার রমণীয় বেদনাকে তিনি সারাজীবন কত গোপনভাবে বহন করেছিলেন। তাঁর তিরোভাবের পর দেখা যায়, গলার হারে ঝোলানো ছোট্ট একটি লকেটেব মধ্যে বয়েছে মহাশিল্পীর প্রেমিকার একখানি ছোট্ট ছবি।

হয়ত এই ব্যর্থতার অন্তঃসলিলা প্রভাব অপ্রত্যক্ষভাবে ছোট্ট জলকুমারীর কাহিনীকে পরম দীপ্তিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ইংরেজী ভাষায় এই গল্পের নাম "দি লিটল মাবমেড"।

রূপকথা রচনায় অ্যানডারসন ছিলেন সারা পৃথিবীর মধ্যে এক অনন্যসাধারণ মহাশিল্পী। তিনি জলকুমারীকে রূপক করে যে ব্যর্থ প্রেমের অপূর্ব কাহিনী রচনা করেছেন, মনে হয়, তা বিশ্বসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক শিল্পীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর রচনায় আঁকা, সাহিত্যরসে রমণীয় জীবনের ছবি শুধু পাঠকের মনকে ভরিয়ে দেয় না, সঙ্গে-সঙ্গে রসের লীলার গোপন গভীরে তা আকর্ষণ করে,—এক অপরূপ, অজানা, বিস্ময়-শিহরিত স্তরে উত্তরণ ঘটায়। আলোচ্য

কাহিনীতে আছে সেই সূক্ষ্ম স্পর্শের পরিচয়। সংসারের প্রণয়ের রূপান্তর ঘটেছে নন্দন-লোকের প্রেমে।

অ্যানডারসন ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।]

সমুদ্রের বুকে বহুদূরে জল যেন সুন্দর ঝুমকো ফুলের মত নীল; আর নিখুঁত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। কিন্তু খুব গভীর—এত গভীর যে কোন দড়ি দিয়ে তার তল মাপা যায় না। তলের শেষ থেকে জলের ওপর পর্যন্ত পৌঁছুতে গেলে অনেকগুলো গির্জের মাথা একটির ওপর আর একটি সোজা করে রাখা দরকার। সেই এলাকায় বাস করে সাগর-সন্তানেরা।

একথা ভাবলে চলবে না যে, এ রাজ্যে শুধু ধূ-ধূ করছে খোলা, সাদা বালির মাঠ। না, তা নিশ্চয়ই নয়। এর মাটিতে জন্মায় যত অদ্ভুত অদ্ভুত গাছ আর ফুল। তাদের পাতা আর ডাঁটা এত নমনীয় যে, ওপরের জল একটুমাত্র নড়লেই ওগুলো জীবন্ত প্রাণীর মত দুলতে থাকে। ছোট বা বড় আকারের মাছ ওদের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে হুড়কে হুড়কে যাতায়াত করে, যেমন পৃথিবীর বুকে পাখিরা গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে উড়ে যায়।

সবচেয়ে গভীর জায়গাটিতে দাঁড়িয়েছিল সাগর-রাজার রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের পাঁচিলগুলি লাল রঙের প্রবালে তৈরী, বড় বড় জানালাগুলি সবুজ রঙের স্ফটিকে গড়া, আর ছাদ ছিল ঝিনুকের খোল দিয়ে ঢাকা। জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে খোলগুলি খুলত-আর বন্ধ হত। প্রত্যেক ঝিনুকের মধ্যে থাকত একটি মুক্তো। মুক্তোগুলি এত সুন্দর ও দামী ছিল যে, রানীর মুকুটে শোভা পাবার যোগ্য।

অনেক বছর আগে সাগর-রাজার রানীর মৃত্যু হয়েছিল। তাই তাঁর বুড়ী মা রাজার সংসার পরিচালনা করতেন। তাঁর অনেকগুণ ছিল। তবে বড় বংশে জন্মাবার জন্য ছিল ভয়ানক অহংকারও। যখন বড় বংশে জন্ম-পাওয়া অপরাপর লোকেরা লেজে মাত্র ছটি করে ঝিনুকের খোল পরতে পারতেন, তেমনি বারটি খোল ব্যবহার করার অধিকার ছিল রাজমাতার। অন্যসব বিষয়ে তাঁর শরীর ছিল চমৎকার। নাতনী রাজকুমারীদের তিনি খুব আদর যত্ন করতেন। রাজকুমারীরা সকলেই ছিলেন খুব সুন্দরী বালিকা, গুনতিতে পাঁচজন। ছোটটি ছিলেন সবচেয়ে সেরা সুন্দরী। গোলাপের কচি পাতার মত নরম শরীর আর ঝকঝকে ছিল গায়ের রঙ। গভীর সমুদ্রের নীলাভা ছিল চোখদুটিতে। কিন্তু তাঁর অন্য বোনেদের যেমন কোন পা ছিল না, তাঁরও তেমনি কোন পা ছিল

না। তাঁদের সবায়ের দেহের শেষ অংশে ছিল মাছেদের মত এক একটি লেজ।

জলের তলায় রাজপ্রাসাদের বড় বড় ঘরে তাঁরা সারাদিন ইচ্ছেমত খেলা করতে পারতেন। সেখানে দেওয়ালের গায়ে গায়ে ফুল ফুটে থাকত। স্ফটিকের বড় বড় জানালাগুলি খোলা হলে মাছের দল তাদের মধ্যে দিয়ে সাঁতরে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ত, যেমন আমাদের বাড়িতে জানালা খুললে 'সোয়ালো' পাখিরা উড়তে উড়তে ভেতরে ঢুকে পড়ে। মাছেরা প্রাসাদের ভেতরে রাজকুমারীদের কাছে সোজা চলে গিয়ে তাদের হাত থেকে খাবার খেত।

প্রাসাদের সামনে চকচকে লাল আর ঘন নীল রঙের গাছ-গাছালি-ভরা বাগান ছিল। সেই গাছগুলিতে সোনার মত জ্বলজ্বলে ফল ধরত আর আগুনের ফুলকির মত ফুল ফুটত। ডালপালা আর পাতাগুলি রাতদিন মর্মর শব্দে আন্দোলিত হত। পায়ের নীচের জমি ছিল সালফারের ধোঁয়ার মত নীল রঙের মসৃণ বালুতে ভরা।

বাগানে প্রত্যেক রাজকুমারীর জন্য এক এক টুকরো জমি নির্দিষ্ট করা ছিল। সেখানে ওঁরা ইচ্ছেমত মাটি খোঁড়াখুঁড়ি বা ফুলগাছ পুঁততে পারতেন। একজন এমনভাবে ফুলের বীজ লাগাতেন যে, চারাগুলো তিমিমাছের আকারে কেয়ারি হয়ে বড় হত। আর-একজন কচি-কাঁচা ছোট্ট জলকুমারীর কেয়ারি সাজিয়ে বীজ লাগাতেন। কিন্তু ছোট রাজকুমারী সূর্যের অনুকরণে গোলাকার ভাবে কেয়ারি করতে ভালবাসতেন। এমন বীজ পছন্দ করতেন, যা থেকে সূর্যের মত দেখতে লাল ফুল জন্মাত। তিনি এক স্বতন্ত্র মনের মেয়ে ছিলেন—শান্ত, চিন্তাশীল। সমুদ্রে নানা জাহাজ ডুবি হত। তাদের থেকে যেসব অদ্ভুত জিনিস মিলত, তা পেয়ে অপর বোনেদের খুশির সীমা থাকত না। ছোট রাজকুমারী কিন্তু এসব জিনিস একটিও কখনো নিতেন না। শুধু ওপরের আকাশে ওঠা সূর্যের মত লাল ফুল পেলে নিতেন। একবার ডুবে-যাওয়া এক জাহাজ থেকে আর-একটি জিনিস নিয়েছিলেন। তা হচ্ছে সাদা খাঁটি মার্বেল পাথরে খোদাই-করা একটি সুপুরুষ তরুণের মূর্তি। এই মূর্তিটিও বাগানে রেখে পাশে ঝকঝকে লাল রঙের এক কাঁদুনে উইলো গাছ পুঁতে দিয়েছিলেন। গাছটি বড় হয়ে উঠলে, ওর তাজা ডালপালা এই মূর্তিকে ঢেকে নীচের নীল বালু-রাশির কাছাকাছি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছিল। বালির ওপর গাছের ছায়া একেবারে বেগুনী রঙের মত দেখাত আর ডালপালার দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে সেই ছায়া নড়ে বেড়াত।

মাথার ওপরের পৃথিবীর গল্প শুনতে ছোট বোনের সবচেয়ে বেশী আনন্দ ছিল। সেখানকার জাহাজ, শহর, লোকজন ও জন্তু জানোয়ারের সম্বন্ধে তাঁর ঠাকুমা যা কিছু জানতেন, সেইসব কথা শোনাবার জন্য তিনি সবসময়ই তাঁর কাছে আবদার করতেন। পৃথিবীর ফুলগুলো থেকে সুগন্ধ বার হয়—এই কথাটিই তাঁর কাছে সবচেয়ে চমৎকার বলে মনে হত। সাগরের তলায় জন্মানো ফুল থেকে ত তেমন গন্ধ বার হয় না। তাছাড়া, পৃথিবীর বনে বনে সবুজের ছড়াছড়ি, গাছে গাছে মাছেরা কেমন গলা ছেড়ে মধুব গান করে। এসব দেখতে বা শুনতে পেলে আনন্দের সীমা থাকে না। রাজমাতা ছোট ছোট পাখিদের 'মাছ' বলতেন। তা না বললে, তাঁব কিশোরী শ্রোতারা তাঁর কথা বুঝতে পারবেন কি করে ? তাঁরা ত কখনো পাখি দেখেন নি।

একদিন ঠাকুমা বললেন, তোমাদের বয়স পনের বছর পূর্ণ হোক। তখন সাগর থেকে মাথা তুলে ওপরে উঠে জ্যোৎস্নার আলোকে পাহাড়ের চুড়োয় বসে বড়বড জাহাজ দেখার অনুমতি পাবে। আর তখন যতসব বন জঙ্গল, এমনকি শহরও দেখতে পাবে।

এর পরের বছর বড় বোনের বয়স হল পনের। কিন্তু অন্যান্য বোনেরা প্রত্যেকেই পরস্পরের চেয়ে এক এক বছরের ছোট ছিল। তাই ছোটবোনকে সমুদ্রের তল থেকে উঠে পৃথিবী কি রকম দেখবার জন্য আরো পাচ বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

যা হোক, সবচেয়ে বড় বোন প্রতিজ্ঞা করলেন, সাগরের ওপরে উঠে প্রথমদিন যা যা তাঁর চোখে পড়ল, এবং কিই বা তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগল, ফিরে এসে সেই সব কথা বোনেদের জানাবেন। কারণ, তাঁদের ঠাকুমার মুখে গল্প শুনে তাঁদের মন ভরত না।

কিন্তু নিজের নিজের পালা পাবার জন্য ছোটবোনের মত আর কেউ এত উদগ্রীব ছিলেন না। তিনি যে খুব গম্ভীর এবং ভাবুক ছিলেন! অনেকদিন রাত্রে খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ঘন-নীল সাগর জলের মধ্য দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর চোখে পড়ত, মাছেরা ডানা আর লেঁজ দিয়ে সমুদ্রজলে ঝাপটা মারতে মারতে চলেছে। তিনি দেখতে পেতেন আকাশের চাঁদ আর তারাগুলিকে। তারা পৃথিবীর লোকের চোখে কেমন জলজল করে, কিন্তু সাগরজলের ভেতর দিয়ে তাদের দেখাত ঢের নিষ্প্রভ অথচ আকারে বড়। কখন-কখন কালো একখণ্ড মেঘের মত কোনকিছু

রাজকুমারী এবং আকাশের তারার মাঝখান দিয়ে চলে যেত। তিনি জানতেন যে, তা হচ্ছে হয় মাথার ওপরে সাঁতরে-যাওয়া কোন তিমি মাছ অথবা মানুষজনে ভরতি কোন জাহাজ। একজন সুন্দরী ছোট্ট জলকুমারী যে ঠিক নীচেতেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তাঁর সাদা সাদা হাতগুলি জাহাজের তলা স্পর্শ করার উদ্দেশে বাড়িয়ে দিয়েছেন—একথা জাহাজের যাত্রীরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

ক্রমে সবচেয়ে বড় রাজকুমারী পনের বছরে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে সাগরের ওপরে উঠতে দেওয়া হল।

ফিরে আসার পর তার মনে হল, অনেক কিছু গল্প করার আছে। তিনি বললেন, কিন্তু সবচেয়ে আনন্দের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, শান্ত সমুদ্রের বালুতীরে শুয়ে ডাঙার ওপরের মস্তবড় আলো-ঝলমল-করা শহরের দিকে তাকিয়ে থাকা। সেখান থেকে গানের স্বর, গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ এবং কর্মচঞ্চল লোকজনদের কোলাহল শোনা যায়, আর দেখা যায় গির্জার চূড়ো, শোনা যায় তার ঘণ্টাধ্বনি। বড়বোন এইসব জিনিসের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি বলেই এদের জন্য তাঁর মনে প্রবল আগ্রহ জেগেছিল।

ওঃ, কি গভীর মনোযোগ দিয়ে না ছোট রাজকুমারী সব গল্প শুনলেন। পরে সন্ধ্যেবেলা খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ঘন নীল জলের ভেতর দিয়ে ওপরের দিকে যখন তাকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মনে ভেসে উঠতে লাগল কর্মকোলাহল ভরা বড় শহরের কথা। এমনকি তাঁর বোধ হল যে, নীচে থেকে গির্জার ঘণ্টাধ্বনিও তাঁর কানে আসছে।

পরের বছর মেজো বোনকে জলের ওপরে উঠে ইচ্ছেমত সাঁতার দিয়ে বেড়াতে অনুমতি দেওয়া হল।

তিনি ঠিক সূর্যাস্তের সময় ওপরে উঠলেন। তাঁর চোখে সে দৃশ্য সবচেয়ে মনোহর বোধ হল। তিনি এসে জানালেন, সারা আকাশ যেন সোনার তৈরী। আর মেঘগুলো এত সুন্দর যে, তা কথা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। লাল আর বেগুনী রঙের মেঘেরা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি উড়ে যাচ্ছিল। এক ঝাঁক বুনো রাজহাঁস যেন একটা লম্বা সাদা রঙের চাদরের মত সাগরের পরপারে সূর্যাস্তের দিকে মেঘেদের চেয়েও তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল। মেজো রাজকুমারীও তাদের দিকে সাঁতার দিয়ে ছুটে যেতে লাগলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সূর্য অস্তে চলে গেল; জলের বুকের গোলাপী আভাও লুপ্ত হল।

পরের বছরে সেজো বোনের পালা এল। তিনি বোনেদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ছিলেন। তাই সমুদ্রে-পড়া একটা নদীর মধ্যে সাঁতার দিয়ে গিয়ে পেঁছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন আঙুর লতায় ভরা কত সুন্দর সবুজ রঙের পাহাড়। ঘন বনভূমির ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে প্রাসাদ ও দুর্গ দেখা যাচ্ছিল। তাঁর কানে আসছিল পাখিদের গান। সূর্যের তাপ তাঁর কাছে এতই প্রখর লাগছিল যে, তিনি তাঁর তপ্ত মুখখানি ঠাণ্ডা করার জন্য জলের নীচে বারবার মাথা ডোবাতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি ছোট খাঁড়ির মধ্যে দেখতে পেলেন, একদল মানুষ-শিশু জলে নেমে খেলা করছে। তিনি ওদের সঙ্গে খেলা করতে চাইলেন। কিন্তু শিশুরা খুব ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। একটি ছোট কালো জানোয়ার এর আগে তিনি কখনো কুকর দেখেন নি ত, তাই একে সাধারণ এক জানোয়ার বলেই মনে করলেন)—সামনে এসে তাঁব উদ্দেশে এত ভয়ংকর শব্দে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল যে, তিনি খুব ভয় পেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সাগরে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মনোরম বনভূমি, সবুজ পাহাড় আর পৃথিবীর চমৎকার শিশুদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। লেজ না থাকলেও এই শিশুরা জলের মধ্যে সাঁতার দিতে পারছিল।

ন বোন তত সাহসী ছিলেন না। তিনি সমুদ্রেব বুকেই ঘোরাফেরা করলেন। তিনি জানালেন, সমুদ্রের বুকেব ওপরটাই সবচেয়ে সেরা জায়গা। সেখান থেকে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। মাথার ওপর বিরাট আকাশটাকে যেন কাঁচের তৈরী ঢাকনা বলে বোধ হয়। তিনি জাহাজ দেখতে পেয়েছিলেন বটে, তবে অনেকদূবে।

এবার এল ছোট বোনের পালা। শীতকালে তিনি জন্মেছিলেন। তাই তিনি শীতের সমুদ্র দেখতে পেলেন। অন্য বোনেরা প্রথমদিন সমুদ্র দেখতে ওপরে উঠে এসব দৃশ্য দেখতে পাননি। এই ঋতুতে সাগরের রঙ ছিল সবুজ, চারিদিকে বড়বড় বরফের পাহাড় ভেসে বেড়াচ্ছিল। তিনি জানালেন, প্রত্যেক পাহাড়টিই মুক্তোর মত সাদা তবে মানুষের তৈরী গির্জার চেয়ে বড় বড়; অদ্ভুত তাদের আকার, দেখতে হীরের মত ঝকঝকে। তিনি সবচেয়ে বড় পাহাড়ের মাথার ওপরে গিয়ে বসেছিলেন। পাশ দিয়ে বড়বড় জাহাজগুলো খুব হুঁশিয়ারির সঙ্গে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছিল, যেন যেখানে তিনি তাঁর লম্বা চুলের রাশি বাতাসে উড়িয়ে বসেছিলেন সেখান দিয়ে জাহাজগুলোর যেতে ভয় করছিল। সন্ধ্যের দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল; বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু

করলে; বাজ পড়ার শব্দ হতে লাগল এবং ঘন কালো সমুদ্র ওই বড় বড় বরফের পাহাড়গুলোকে ওপর দিকে এমনভাবে তুলে ধরতে লাগল যে, বিদ্যুতের লাল ঝলকানিতে তারা হয়ে উঠল আলোয় উজ্জ্বল। সব জাহাজগুলোতেই পাল গুটিয়ে রাখা হল, যাত্রীরা সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে ছোট্ট জলকুমারী তাঁর ভাসন্ত বরফ-স্তূপের ওপর শান্তভাবে বসে রইলেন। তিনি দেখতে লাগলেন জলজলে সমুদ্রের বুকে নীল বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা খেলা।

বোনেরা প্রত্যেকেই যখন সমুদ্রের বুকের ওপরে প্রথমবার উঠতে পেরেছিলেন, তখন যা কিছু দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন, তাদের সৌন্দর্যে ও নতুনত্বে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে বয়স আরো বেড়ে যাওয়ায় এবং যতবার খুশি ওপরে ওঠবার স্বাধীনতা লাভ করার দরুন এ ধরনের বেড়ানোর ওপর আর আকর্ষণ ছিল না। তাঁরা জলের নীচে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চাইতেন। একমাস শেষ হতে না হতে তাঁরা সকলে ঘোষণা করেছিলেন যে, পাতালপুরী ঢের বেশী সুন্দর জায়গা, এবং সেখানকার রাজপ্রাসাদে থাকার মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই। প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা পাঁচটি বোন হাত জড়াজড়ি করে সারি বেঁধে সমুদ্রের বুকের ওপর ভেসে উঠতেন। তাঁদের কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার, যে কোন মানুষের স্বরের চেয়ে সূক্ষ্মতর। যখন ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিত এবং জলকুমারীরা আগে থেকে বুঝতে পারতেন যে, কোন না কোন জাহাজ এবার ডুবি হতে পারে, তখন তাঁরা সেই জাহাজের সামনে সাঁতার কেটে উপস্থিত হয়ে মধুর স্বরে পাতালপুরীর সুখ সম্ভোগের বিষয়ে গান করতেন, তাঁদের গানে নাবিকদের উদ্দেশে এই অনুনয় থাকত যে, পাতালপুরীতে এস। সেখানে এলে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু নাবিকেরা এঁদের কথা বুঝতে না পেরে এঁদের গানকে ঝড়ের গর্জন বলে ভুল করত। পাতালপুরীর সুন্দর সুন্দর জিনিস তারা ত কখনো দেখেনি। জাহাজডুবি হলে জাহাজের মানুষগুলি জলের তলায় তলিয়ে যায়, আর তাদের মৃতদেহ শুধু সাগর রাজার রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌছায়।

যখন সব বোনে মিলে হাত জড়াজড়ি করে সাগরের বুকে উঠতেন, ছোট বোন দল ছেড়ে একলা-একলা কাটাতেন। ওঁদের দিকে চেয়ে তিনি কাঁদ-কাঁদ হয়ে যেতেন। কিন্তু জলকুমারীদের কাঁদবার ত কোন ক্ষমতা থাকে না, তাই তাঁরা অপরের চেয়ে ঢের বেশী মনোকষ্ট ভোগ করেন। ছোটবোন বলতেন, আহা, কবে আমার বয়স পনের বছর হবে। আমি নিশ্চয়ই ওপরের পৃথিবীকে

ভালবাসব, সেই সঙ্গে পৃথিবীর মানুষদেরও।

অবশেষে একদিন তাঁর পনের বছর বয়স হল। তখন তাঁর ঠাকুমা ডেকে বললেন, দেখ, এখন তুমি সাবালিকা হয়েছ। তাই এস, তোমাকে তোমার বোনেদের মত বেশভূষা পরিয়ে দিই।

তারপব তিনি ছোট নাতনীর চুলেব মধ্যে একগোছা সাদা লিলিফুল গুঁজে পরিয়ে দিলেন। লিলিফুলের প্রত্যেক পাতাটি ছিল এক একটি মুক্তো। বুড়ী ঠাকুমা অভিজাত জন্মেব গৌরবসূচক আটটি বড বড় ঝিনুকের খোল নাতনীর লেজে বেঁধে দেওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। ছোট রাজকুমারী বললেন, এসব পরে আমার যে ভীষণ লাগছে, ঠাকুমা! প্রাচীনা উত্তর দিলেন, আভিজাত্যেব গৌরব ভোগ করতে গেলে কষ্টভোগকে এড়ানো যায় না, দিদি।

ওঃ, ছোট্ট জলকুমারী কত আনন্দের সঙ্গেই না এইসব আড়ম্বর ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইতেন। তিনি চুলে গোঁজা ভারী ফুলের গোছার বদলে সেখানে বরং তাঁর বাগানে ফোটা কিছু লালফুল লাগাতে চাইলেন, কিন্তু তা করা সম্ভব হল না।

—বিদায়!

এই বলে তিনি বুদ্‌বুদের মত খুব হালকাভাবে সমুদ্রের বুকের ওপর মাথা তুলে ভেসে উঠলেন।

জলের ওপরে তাঁর মাথা তোলার সঙ্গে-সঙ্গে সূর্য অস্ত গেল। আকাশে মেঘের রঙ তখনো সোনালী আভা মেশানো ফ্যাকাসে লাল ছিল। তাড়াতাড়ি শেষ-হওয়া চারদিকের গোলাপী আভার ওপরে ফুটে উঠছিল সন্ধ্যের পরিপূর্ণ রূপ। সমুদ্র একেবারে শান্ত। জলের ওপরে তিন মাস্তুল-ওলা একটি বড় জাহাজ ভাসছিল। তাতে একটি মাত্র পাল তোলা। এক ঝলকও হাওয়া বইছিল না। নাবিকেরা সকলে দড়ি দড়া রাখার জায়গায় এধারে ওধারে বসেছিল। জাহাজের ওপর থেকে গানের সুর ও বাজনা বাজার শব্দ ভেসে আসছিল। তারপর সন্ধ্যে আরো ঘন হলে শত শত উৎসবের রঙিন লণ্ঠন জ্বালা হল। ওদের দেখে মনে হতে লাগল, যেন দুনিয়ায় যত জাতি আছে, সকলের পতাকা আকাশে উড়ছে। ছোট্ট জলকুমারী জাহাজের কেবিনের জানালার কাছাকাছি সাঁতার কেটে এগিয়ে গেলেন। তারপর যতবার ঢেউয়ের সঙ্গে তাঁর মাথা জলের ওপরে উঠতে লাগল, তিনি শাসির স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। চমৎকার পোশাক-পরা কয়েকজন মানুষ তাঁর চোখে পড়ল। তাঁদের মধ্যে

সবচেয়ে সুন্দর দেখতে ছিলেন রাজকুমার। তাঁর ছিল বড় বড় কালো চোখ। তাঁর বয়স ষোল বছরের বেশী হতে পারে না। অত আড়ম্বরে তাঁরই জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। নাবিকেরা ডেকের ওপর নাচ শুরু করলে। তরুণ রাজকুমার ওদের কাছে যখন এলেন, তখন একশত আতসবাজি পোড়ানো হল। তার ফলে চারিদিকের আকাশ বাতাস দিনের মত উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে উঠল। জলকুমারী এসব দেখে খুব ভয় পেলেন, ডুব দিয়ে তাড়াতাড়ি সমুদ্রের তলায় পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার তিনি জলের ওপর মাথা তুললেন। তখন আকাশের তারাগুলো মনে হল যেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এর আগে আর কখনো তিনি এরকম বাজি পোড়ানো দেখেন নি। বড় বড় সূর্য থেকে স্ফুলিঙ্গ ছুটে আসছিল। নীল আকাশে সুন্দর সুন্দর জ্বলন্ত মাছগুলো দৌড়চ্ছিল। আর নীচেকার সমুদ্রের শান্ত বুকে সেই সব আশ্চর্য জাদুগুলি প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। জাহাজটি এতই উজ্জ্বল আলোয় ভরে গিয়েছিল যে, ছোট ছোট দড়িদড়াগুলি পর্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

রাত বেশ এগিয়ে গেল, তবু ছোট্ট জলকুমারী জাহাজ অথবা পরম সুন্দর রাজকুমারের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে জাহাজে বিচিত্র লণ্ঠনগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আতসবাজি এবং বোম পোড়ানো শেষ হয়েছিল বটে, কিন্তু সমুদ্রের গভীর তলায় তখনো একটা বিক্ষুব্ধ গুডগুড শব্দ হচ্ছিল। তবু তিনি জাহাজের কেবিনের ভেতরে উঁকি মেরে দেখবার উদ্দেশে ঢেউ-এর দোলার সঙ্গে ওঠা-নামা করতে করতে ভেসে রইলেন।

হঠাৎ জাহাজখানি জোরে জোরে যেতে শুরু করলে। একটার পর একটা উডন্ত পালের দড খোলা হয়ে গেল। সাগরের বুকে ঢেউগুলো উত্তাল হয়ে উঠল। আকাশের এপাশে ওপাশে ঘন মেঘগুলি ছোটাছুটি শুরু করলে। দূর দিগন্তে বিদ্যুতের ছটা দেখা গেল। এক ভয়ংকর ঝড ছুটে আসছে বলে মনে হল। তাই নাবিকেরা এবার পালগুলি একেবারে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা শুরু করলে। গর্জন-পাগল সাগরের বুকে বড জাহাজখানি তাড়াতাড়ি যেতে যেতে এদিকে ওদিকে ভীষণ দুলতে লাগল। ক্রমে ঢেউগুলো যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরো ফুলে ফুলে উঠল। রাক্ষসের মত জলের কতকগুলো কালো পাহাড় মাস্তুলের মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওদিকে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জাহাজটি উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে রাজহাঁসের মত ডুব দেয় একবার, তারপর আবার

পাহাড়ের মত জলের উঁচু চূড়োর ওপরে মাথা তুলতে থাকে। ছোট্ট জলকুমারী সবকিছু দেখে কল্পনা করলেন, সুন্দরভাবে জাহাজ চলার এমনই বুঝি বা ঠিক-ঠিক কায়দা। কিন্তু নাবিকেরা তখন অন্যরকম ভাবছিল।

ক্রমে জাহাজখানি শব্দ করে চিড খেতে লাগল। তার মোটা মোটা তক্তাগুলো বার বার ঢেউয়ের আঘাত খেয়ে ভেঙে পড়ার উপক্রম করলে। জাহাজের তলায় একটা গর্ত সৃষ্টি হল। মাস্তুলটি একটি নলখাগড়ার মত সোজা দু ভাগে ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে জাহাজখানি একপাশে হেলে গেল আর সমুদ্রের জল হুহু করে তার খোলের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করলে।

ছোট্ট জলকুমারী এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যে, নাবিকেরা বিপদে পড়েছে। ভাঙা জাহাজের যেসব তক্তা ও কড়ি সাগরের বুকে ভাসছিল, তাদের আঘাত থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচাবার চেষ্টায় হুঁশিয়ার হতে বাধ্য হলেন। মুহূর্তের জন্য হঠাৎ অন্ধকার এত ঘন হয়ে উঠল যে, কিছুই দেখা তার পক্ষে সম্ভব হল না। কিন্তু আকাশে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সবকিছু আবার দেখা গেল। তখন তিনি বিশেষভাবে তরুণ রাজকুমারকে দেখার আশায় তাকাতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, জাহাজটি চৌচির হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ার পর রাজকুমার জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি এই ভেবে খুশী হয়েছিলেন যে, এবার হয়ত রাজকুমার তাঁর কাছে এসে হাজির হবেন। কিন্তু পরে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল যে, মানুষজনেরা জলের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না। আর রাজকুমার হয়ত পাতালে তাঁর বাবার রাজপ্রাসাদে পৌঁছবার আগেই প্রাণ হারাবেন। —না,—না! তাঁকে কিছুতেই মরতে দেওয়া হবে না। অতএব জলকুমারী ভাসমান তক্তা ও কড়ির আঘাত খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবার ভয় থাকা সত্ত্বেও রাজকুমারের দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললেন। তিনি বারবার জলের গভীর তলায় ডুব দিয়ে আবার ঢেউ-এর মাথায় উঠে পড়ে শেষকালে তরুণ রাজকুমারের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন জলে-ভাসা রাজকুমার ঝড়-ঝঞ্ঝায়-মাতাল সাগরের সঙ্গে লড়াই করার সব শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর হাত পা অসাড় হয়ে পড়েছিল; তাঁর সুন্দর চোখ দুটি বুজে গেছল। ছোট্ট জলকুমারীর সহায়তা না পেলে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাতেন। জলকুমারী রাজকুমারের মাথা জলের ওপরে তুলে ধরে ভেসে রইলেন। আর ঢেউগুলো তাঁদের দুজনকে বুকে করে ইচ্ছেমত এগিয়ে চলল।

ভোরের দিকে ঝড়ের বেগ কমে গেল। কিন্তু জাহাজের কোন ধ্বংসাবশেষ

কোথাও দেখা গেল না। জলের বুক থেকে রক্ত-রাঙা আভা-ভরা সূর্য জেগে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমারের মুখের ওপর জীবনের আভাস দেখা গেল। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি তখনো বোজা ছিল। জলকুমারী রাজকুমারের সুডোল কপালে বারবার চুমু খেতে লাগলেন। তাঁর ভিজে চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটলেন। তিনি কল্পনায় অনুভব করলেন, রাজকুমারের দেহ যেন তাঁর বাগানের মার্বেল পাথরের তৈরী মূর্তির মত সুন্দর, আর বার বার আবেগের সঙ্গে চুমু খেয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, রাজকুমার যেন বেঁচে ওঠেন।

এতক্ষণে জমি দেখা গেল। জলকুমারীর চোখে পড়ল উঁচু উঁচু নীল পর্বতমালা। তাদের চূড়োগুলি ছিল ঝকঝকে সাদা তুষারে ঢাকা, বোধ হচ্ছিল যেন, একদল রাজহাঁস সেখানে শুয়ে আছে। পর্বতমালার নীচে তীরের ওপর পরপর চমৎকার সবুজ বনভূমি। সামনে দাঁড়িয়েছিল একটি গির্জা অথবা ধর্মযাজকদের মঠ। জলকুমারী বুঝতে পারলেন না ঠিক কি! তবে তা যে একটি বাড়ি সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। বাগানে অজস্র জামির ফল আর চীনদেশের কমলালেবু হয়েছিল। আর ছিল দরজার সামনে লম্বা লম্বা তালগাছের সারি। এই জায়গায় একটি ছোট উপসাগর সৃষ্টি হয়েছিল। খুব গভীর জল থাকলেও তার বুকে খোলা-সাগরের উত্তালতা ছিল না। জলকুমারী সুন্দর রাজকুমারের দেহ সঙ্গে নিয়ে সাঁতার দিয়ে সেখানকার একটি খাড়াই পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছলেন। কাছেই চমৎকার সাদা বালুর একটি ঢিপি ছিল। তিনি কুমারের দেহটিকে তার ওপর রাখলেন।

তখন সাদা রঙের অট্টালিকা থেকে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল। একদল মেয়েকে বাগানের মধ্যে দেখা গেল। ছোট্ট জলকুমারী তাদের দেখে কিছুদূরে সাঁতরে চলে গিয়ে জল-থেকে-জেগে-ওঠা উঁচু পাথরের পেছনে লুকিয়ে রইলেন। তারপর যাতে তাঁর ছোট দেহটি কারো চোখে না পড়ে, সেই উদ্দেশে মাথা ও বুক সমুদ্র ফেনায় ঢেকে রেখে তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, অভাগা রাজকুমারের সাহায্যে কোন লোক এসে উপস্থিত হয় কিনা!

বেশী ক্ষণ গেল না, একটু পরেই একজন তরুণী বেড়াতে বেড়াতে রাজকুমারের দেহের কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রথমে সে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল, পর মুহূর্তেই শান্ত হয়ে আরো লোকজনকে ডেকে আনলে। জলকুমারী দূর থেকে দেখতে পেলেন, এই সময়ে রাজকুমারের হুঁশ ফিরে এল, তিনি চারপাশের

সকলের দিকে চেয়ে এক ফালি হাসি হাসলেন। কিন্তু জলকুমারীর ভাগ্যে তেমন একটি হাসি মিলল না। তিনি যে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছেন, সেকথা রাজকুমার জানতেও পারলেন না। একথা ভেবে তাঁর মন দুঃখে ভরে গেল। তারপর রাজকুমারকে বড় বাড়িটার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি মনের দুঃখে আবার জলের তলায় ডুব দিয়ে পাতালপুরে বাবার রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

শান্ত ও ভাবুক স্বভাবের ছিলেন তিনি চিরকাল। এখন আরো বেশী শান্ত ও ভাবুক হয়ে পড়লেন। তাঁর বোনেরা জিজ্ঞাসা করলেন, এবার সমুদ্রের বুকে উঠে কি কি দেখলি? তিনি তাদের কাছে কোন কথাই ভাঙলেন না।

যেখানে রাজকুমারকে শেষ রেখে চলে এসেছিলেন, সেই জায়গায় গিয়ে ইতিমধ্যে বার বার ঘুরে এলেন,—কোনদিন ভোরে, কোনদিন বা সন্ধ্যেবেলায়। বাগানে ফলগুলো ক্রমে পেকে উঠছে দেখতে পেলেন। তারপর একদিন সব ফল গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাও তাঁর চোখে পড়ল। উঁচু পর্বতগুলোর মাথায় বরফ গলে শেষ হয়ে গেছে দেখতে পেলেন। কিন্তু রাজকুমারকে কোন দিনও ত দেখা গেল না! প্রত্যেকবার তিনি আগের চেয়ে বেশী মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে লাগলেন। এখন তাঁর সান্ত্বনার উৎস ছিল, তাঁর নিজের ছোট বাগানটিতে বসে বসে রাজকুমারের মত দেখতে মার্বেল পাথরের তৈরী মূর্তিটিকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখা। ফুল গাছগুলিকে যত্ন করা অনেকদিন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাগানের রাস্তাগুলি জঙ্গলে ভরে গেছল।

অবশেষে একদিন নিজেকে আর চেপে রাখতে না পেরে তিনি একজন দিদিকে তাঁর মনের দুঃখ জানালেন। সেই দিদির মুখ থেকে অপর দিদিরাও অবিলম্বে সব গোপন কথা জানতে পারলেন। তাঁরা আবার আর কারোকে বললেন না, শুধু দুজন বন্ধু জলকুমারীকে বললেন, তাঁরা আবার মাত্র কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সব কথা জানালেন—আর কারোকে নয়। এঁদের মধ্যে একজন দৈবক্রমে রাজকুমারকে চিনতেন। তিনিও জাহাজের ওপর সেদিনকার নাচগানের মজলিশ দেখেছিলেন। তিনিই সকলকে জানালেন, রাজকুমার কে আর কোথায় বা তাঁর রাজ্য।

এক সময়ে দিদিরা সকলে মিলে বললেন, ছোট্টু, লক্ষ্মী বোন, আমাদের সঙ্গে চল্। তারপর সকলে হাত ধরাধরি করে লম্বা সারি বেঁধে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে চললেন, যেখানে রাজকুমারের প্রাসাদ ছিল, সেইখানে গিয়ে হাজির হলেন

এই প্রাসাদঘর হলদে রঙের চকচকে পাথরে তৈরী ছিল। সামনে মার্বেলের চওড়া সিঁড়িগুলি সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছিল। অট্টালিকার ছাদ ছাড়িয়ে শোভা পাচ্ছিল চমৎকার সোনার গম্বুজগুলির মাথা, আর মার্বেলের জীবন্ত মূর্তিগুলি চারপাশের থামের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়েছিল।

বড় বড় জানালার স্বচ্ছ শাসির ভেতর দিয়ে সোজা চমৎকার চমৎকার ঘরের মাঝখান পর্যন্ত দেখা যায়। প্রতি জানালায় দামী দামী রেশমী পর্দা টাঙানো; বিচিত্র মনমাতানো ঝোলা ঝোলানো; আর দেওয়ালে দেওয়ালে কারুকার্যময় ফ্রেমে আঁটা বড় বড় ছবি আটকানো। ঘরগুলোর দিকে চেয়ে দেখলেই মন আপনা থেকে তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

রাজকুমার কোথায় থাকেন – এ খবর জানার পর থেকে ছোট্ট জলকুমারী দিনের পর দিন সন্ধ্যের সময় অথবা রাতের বেলা কাছাকাছি এলাকায় গিয়ে সমুদ্রের বুকে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি সাঁতার কেটে তীরের খুব কাছে গিয়ে হাজির হতেন। সেখানে যেতে অন্য জলকুমারীদের সাহসই হত না। এমনকি তিনি সরু খালের মধ্যে ঢুকে পড়ে সুন্দর মার্বেল পাথরের তৈরী বারান্দার নীচে পর্যন্ত চলে যেতেন, খালের জলে ওই বারান্দার লম্বা ছায়া পড়ত। সেখানে বসে তিনি তরুণ রাজকুমারের দিকে একমনে তাকিয়ে থাকতেন। রাজকুমার ত জলকুমারীকে ছায়ার মধ্যে দেখতে পেতেন না, তাই মনে করতেন, যেন জ্যোৎস্নার আলোয় তিনি বেড়াচ্ছেন সম্পূর্ণ একা-একা।

অনেকদিন সন্ধ্যেবেলায় জলকুমারী দেখতে পেতেন, রাজকুমার তাঁর পতাকা-লাগানো অপরূপ ছোট নৌকাখানিতে বসে পাল তুলে দিয়ে গান শুনছেন। তখন তিনি সবুজ খাগড়াবনের মধ্যে বসে তা শুনতেন। যদি কখনো বাতাসে তাঁর সাদা ওড়না উড়তে শুরু করত, রাজকুমারের সঙ্গীরা তা দেখতে পেলে ভাবত, এ বুঝি বা কোন রাজহাঁস পাখনা মেলে দিয়েছে।

অনেকদিন রাতের বেলা জেলেরা টর্চলাইট জেলে জাল পাততে এলে তিনি শুনতে পেতেন, তারা রাজকুমারের সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করছে। তখন তাঁর মনে আনন্দ উপচে উঠত এই কথা ভেবে যে, এই রাজকুমার যখন আধমরা অবস্থায় সমুদ্রের বুকে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তখন তিনিই এঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন।

অবিলম্বে তাঁর মনে মানুষদের সম্বন্ধে আরো বেশী ভালবাসা জন্মাল। তাদের সঙ্গে আরো মেলামেশা করবার জন্য আগ্রহ খুব বেশী বেড়ে গেল। মানুষদের পৃথিবীটা পাতালপুরীর চেয়ে আরো বেশী বড় এবং সুন্দর বলে

তাঁর বোধ হল। মানুষেরা জাহাজে চেপে সাগর পারাপার করতে পারে; যেসব পর্বত মেঘের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চূড়োয় উঠতে পারে; আর মাঠ-ময়দান ও বনভূমি ভরা যে ভূখণ্ড মানুষদের অধিকারে রয়েছে, তা ত তাঁর দৃষ্টির বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তিনি কত নতুন বিষয়—কত নতুন কথা ন শিখতে চাইতেন!

কিন্তু তাঁর দিদিরা তার সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারতেন না। তাই তিনি তার বুড়ী ঠাকুমার কাছে গিয়ে হাজির হতেন। ওপরের পৃথিবী সম্বন্ধে ঠাকুমার বিশেষভাবে জানাশোনা ছিল। খুব সঠিকভাবেই তিনি ওপরের পৃথিবীকে সমুদ্রের ওপরের জমি বলতেন।

ছোট্ট জলকুমারী ঠাকুমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষেরা যখন জলের মধ্যে ডুবে যায় না, তাহলে কি তারা চিরদিন বেঁচে থাকে? পাতাল-পুরীর আমাদের যেমন মৃত্যু হয়, তাদের কি তেমন মৃত্যু হয় না?

বুড়ী ঠাকুমা উত্তর দিলেন, হাঁ, হয়। আমাদের মত মানুষদেরও মৃত্যু হয়। বরং তাদের জীবনের মেয়াদ আমাদের চেয়ে কম। আমরা তিনশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি। তবে, আমাদের জীবনের শেষ হলে আমরা কেবল ফেনায় পরিণত হব। আমাদের ভালবাসার লোকেদের কাছে আমাদের সমাধি দেওয়া হবে না। আমাদের আত্মা অমর নয়। আমরা কখনও নতুন আর এক জীবন পাই না। আমরা সবুজ নলখাগড়ার ডাঁটার মত, একবার তাদের কেটে ফেললে, তার মূল থেকে আর নতুন কিছু জন্মায় না। অন্য দিকে মানুষদের আত্মা চিরকাল বেঁচে থাকে,—হাঁ, এমন কি দেহ মাটিতে মিশে যাবার পরও। আর সেই আত্মা স্বচ্ছ, নির্মল আকাশ পার হয়ে উঠে যায় ওপরে আলোয়-ভরা তারার রাজ্যে। আমরা যেমন মানুষদের জীবন-যাত্রা দেখার জন্য জল ছেড়ে ওপরে উঠি, মানুষেরা তেমনি অজানা প্রিয় সুন্দর রাজ্যে উঠে যেতে পারে। আমাদের কিন্তু কখনো সে রাজ্য দেখার সৌভাগ্য হতে পারে না।

তখন ছোট্ট জলকুমারী বিষণ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ঠাকুমা, আমাদের আত্মা কেন অমর নয়? আমি খুব খুশির সঙ্গে আমার আয়ুর আর যত বছর বাকী আছে, সবটাই দিয়ে দেব – যদি কেবলমাত্র একদিনের জন্যে মানুষ-জীবন পাই, আর সেই স্বর্গীয় রাজ্যে গিয়ে আনন্দের ভাগীদার হতে পারি! বুড়ী ঠাকুমা উত্তর দিলেন, ছিঃ, ওরকম কথা তুমি মোটেই ভাববে না।

আমাদের ধারণা, মানুষ জাতের চেয়ে আমরা ঢের বেশী সুখী এবং মহৎ।

ছোট্ট জলকুমারী বললেন, তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমি মরে যাব আর সঙ্গে-সঙ্গে ফেনা হয়ে সাগরের বুকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হব। তারপর আর ঢেউ-এর সুর শুনতে পাব না, সুন্দর সুন্দর ফুল আর লাল রক্তরাঙা সূর্য দেখতে পাব না। আচ্ছা, যাতে আমি অমর আত্মা লাভ করতে পারি, এমন কোন উপায় কি নেই?

বুড়ী সাগর-রানী বললেন, না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন মানুষ তোমাকে তার বাপ মায়ের চেয়েও বেশী প্রিয়জন বলে ভালবাসে, আর যদি তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও ভালবাসা তোমাকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠে, আর সে তাদের পুরুতমশাইকে তোমার ডানহাতের সঙ্গে তার ডানহাত মেলাতে দিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করে যে, ইহলোকে এবং পরলোকে তোমার ওপর চিরকাল বিশ্বস্ত থাকবে। তা ঘটলে, তার আত্মা তোমার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। আর, মরণের পর মানুষেরা যে আনন্দের অধিকারী হয়, তুমি সেই আনন্দের ভাগীদার হবে। সে নিজের আত্মা না হারিয়েই তোমাকে আত্মা দান করবে। হায়, এ যে কখনও হবার নয়, দিদি! তোমার যে লেজ সাগরতলার অধিবাসীদের সমাজে সৌন্দর্য বলে গণ্য, তা কিন্তু পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ বলে হেয়। মানুষেরা এর বেশী কিছু জানে না। পৃথিবীতে সৌন্দর্যের জন্যে দরকার দুটি শক্ত খুঁটি, তাকে মানুষেরা 'পা' বলে, বুঝলে?

ছোট্ট জলকুমারী নিজের লেজের দিকে দৃষ্টিপাত করে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বুড়ী ঠাকুমা বললেন, যা হোক, যে তিনশ বছর ধরে আমাদের জীবন আছে, সেই সময়টা মনের আনন্দে নেচে লাফিয়ে কাটিয়ে দাও। সব দিকের বিচারেই মনে হয়, এতগুলো বছর যথেষ্ট সময়। এর পর আমরা সকলেই মরণের বিশ্রাম পেতে অনিচ্ছুক হব না। হাঁ, ভাল কথা, আজ রাতে আমাদের রাজপ্রাসাদে নাচগানের আসর বসবে, মনে আছে ত?

এই রকম উৎসবের দিনে এমনই আড়ম্বরের মাতামাতি ঘটে, যা পৃথিবীতে কখনও দেখতে পাওয়া যায় না। রাজপ্রাসাদের উৎসব-ঘরের দেওয়াল এবং ছাদ ছিল মোটা মোটা অথচ স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে তৈরী। শত শত বিরাট ঝিনুকের খোল কতকগুলো গাঢ় লাল, কতকগুলো বা ঘাসের মত সবুজ—চারিদিকে সারি সারি ঝোলানো ছিল; তাদের ভেতর জ্বলে-ওঠা নীল শিখায় সারা ঘরখানি

আলোয় ভরে উঠেছিল, আর দেওয়ালের মধ্যে থেকে সেই আভা বার হয়ে ঝকঝকে উজ্জ্বল হয়ে পড়েছিল সমুদ্রের চারিদিকে। অসংখ্য ছোট বড় মাছ কাঁচের দেওয়ালের পাশ দিয়ে সাঁতরে চলে যাচ্ছে দেখা গেল। তাদের কতকগুলোর গায়ে ডগডগে বা টকটকে লাল রঙের আঁশ ছিল, অপরগুলোর আঁশ ছিল সোনালী বা রূপালী রঙের।

নাচঘরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল জলস্রোত; তার ওপর জলকুমার এবং জলকুমারীরা তাদের নিজস্ব মিষ্টি গান গাইতে গাইতে নাচছিল। কোন মানুষের কণ্ঠস্বরে নেই সেরকম মিষ্টতা। ছোট্ট জলকুমারীর কণ্ঠে শোনা যাচ্ছিল সবচেয়ে মিষ্টি গান। শ্রোতারা হাততালি দিয়ে আর লেজ নেড়ে সে গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল। তা দেখে এক মুহূর্তের জন্য তিনি খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, পাতালপুরে বা পৃথিবীর বুকে কোথাও তাঁর গলার মত মিষ্টি গলা আর কারো নেই। কিন্তু অবিলম্বে তাঁর ভাবনাগুলো আবার পৃথিবীর দিকে ছুটে গেল। তিনি যে বেশীক্ষণ ভুলে থাকতে পারেন না রাজকুমারের কথা অথবা তাঁর মত একটি অমর আত্মালাভ না করার দুঃখ। তাই চুপিচুপি রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে বাইরে তাঁর নিজস্ব ছোট বাগানে এসে ভারাক্রান্ত মনে বসে রইলেন। নাচঘরে তখনো চলছিল গান আর নাচের হুল্লোড়। হঠাৎ জলের ভেতর থেকে বিউগল বাজার শব্দ তাঁর কানে এল।

তিনি ভাবতে লাগলেন, এখন নিশ্চয়ই রাজকুমার সমুদ্রের বুকে নৌকো করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চিন্তায় দিনরাত আমার মন পূর্ণ। তিনিই আমার জীবনের সব সুখের কাণ্ডারী। তাঁর মন জয় করার জন্যে আর মানুষের অমর আত্মা লাভ করার আশায় আমার সবকিছু দিতে পারি। আমার দিদিরা এখন ওই ত বাবার রাজপ্রাসাদে নাচগানে মত্ত, আমি এই সুযোগে যাব সাগর-ডাইনীর কাছে তাঁকে দেখলে আমার সব সময়ে কেমন যেন একটা আতঙ্ক হয়। তবু মনে হয়, এ সময়ে তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য আমার কাজে লাগতে পারে।

ছোট্ট জলকুমারী এইসব ভেবে বাগান ছেড়ে সাগর-জাদুকরী যে ঘূর্ণিস্রোতের অঞ্চলে বাস করতেন তার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

এদিকে আগে তিনি কখনো আসেন নি। এখানে কোন ফুল ফোটে না, সমুদ্রের ঘাসও জন্মায় না। তৃণহীন, ধূসর, ধু-ধু বালু ভরা মাটি—শুধু মাটি। এছাড়া, ঘূর্ণিস্রোতের পথে আর কিছু দেখা যায় না। ঘূর্ণিস্রোতের অঞ্চলে

জলস্রোত কেবলই চক্রাকারে ঘুরে মরে আর যা কিছু জিনিস কাছাকাছি পায় তা টেনে হিঁচড়ে নীচের অতল জলে ডুবিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘূর্ণিস্রোতগুলি ছোট্ট জলকুমারীকে ভয়ংকর ভাবে আঁকড়ে ধরে ধ্বংস করে দিতে পারত, তবু তিনি এদের মধ্যে দিয়েই পার হয়ে গিয়ে সাগর-জাদুকরীর রাজ্যে পৌছলেন। এমনকি এ পথের এক অংশ ছিল গরম ফুটন্ত কাদায় ভরা। এর পেছনে এক ঘনঘোর বনের মধ্যে ছিল ডাইনীর বাড়ি। এই বনের ঝোপ ও গাছগুলি ছিল আধা জানোয়ার, আধা গাছালি। তারা দেখতে ছিল যেন শতমুখী এক-একটি সাপ মাটি ভেদ করে মাথা তুলে আছে। এদের ডালপালা ছিল যেন লম্বা সরু সরু হাত আর সচল আঙুল। শিকড় থেকে মাথা পর্যন্ত যত গাঁট ছিল, তা ইচ্ছেমত নাড়ানাড়ি করতে পারত। সমুদ্রের বুক থেকে যা কিছু তারা টেনে আনত, তা আঁকড়ে ধরে রাখত। কখনো ওপরে ফিরে যেতে দিত না।

ছোট্ট জলকুমারী এদের দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর বুক দুরু-দুরু করে কাঁপতে লাগল। তিনি ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হলেন কিন্তু সেই মুহূর্তেই রাজকুমারের কথা তাঁর মনে ভেসে উঠল। আর একটি কথাও ভেসে উঠল, মানুষেরা বিশেষ করে যে আত্মার অধিকারী সেই কথাটা। তখনই তিনি আবার সাহস ফিরে পেলেন। তাঁর মাথার লম্বা ঢেউ খেলানো চুলগুলি এঁটে বাঁধলেন, যাতে ঐ রাক্ষুসে গাছগুলো তাঁর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরতে না পারে। তারপর তাঁর বুকের ওপর হাত দুটি আড়াআড়ি করে রেখে মাছ যেমন জলের ভেতর দিয়ে ছুটে পালায় সেইভাবে খুব তাড়াতাড়ি গাছের সারির মধ্যে দিয়ে ছুটে এগিয়ে গেলেন। তিনি চোখ মেলে দেখতেই বুঝতে পারলেন, রাক্ষুসে গাছগুলো কেমনভাবে তাদের শত শত ছোট অথচ লোহার মত শক্ত হাত দিয়ে যা ধরতে পেরেছে, তা-ই আঁকড়ে আটকে রেখেছে। কত মানুষ সমুদ্রে ডুবে মরার পর তলায় তলিয়ে গেছল, তারা এই রাক্ষুসে ডালপালার জালে সাদা কঙ্কালের মত হয়ে আটকে আছে। ডোবা জাহাজের হাল, বাক্স, সিন্দুক, মাটির দেশের জন্তু-জানোয়ারের কঙ্কালও এমনিভাবে আটকে রয়েছে। এমন কি, যে একজন অল্প বয়সী জলকুমারীকে ধরে দম বন্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছিল; তাও এদের কবলে পড়ে রয়েছে। ছোট্ট জলকুমারীর মনে এই দৃশ্যই সবচেয়ে বেশী বেদনার সৃষ্টি করলে।

ক্রমে তিনি বনের মধ্যে এক বিরাট জলাভূমির কাছে এসে পড়লেন। সেখানে বড় বড় মোটা সাদাটে হলদে রঙের বিশ্রী জলঢোঁড়া সাপ কাদার

মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। এই জঘন্য এলাকায় দাঁড়িয়েছিল জাহাজডুবিতে মরা যত মানুষের হাড় দিয়ে তৈরী একটি বাড়ি। তার মধ্যে বসেছিলেন ডাইনী বুড়ী। তিনি তখন তাঁর মুখ থেকে খাবার নিয়ে একটি কোলা ব্যাঙকে খাওয়াচ্ছিলেন। আর যত বিশ্রী মোটা জলঢোঁড়া সাপগুলোকে আদর করে ডেকে তাঁর বুকের ওপর জড়িয়ে ধরছিলেন।

ডাইনী জলকুমারীকে বললেন, তুমি কি চাও, তা জানি। এ তোমার ভারী বোকামি, বাছা। যাক সে কথা, যখন আমার কাছে এসেছ, তুমি যা চাও, তাই পাবে। তবে সুন্দরী জলকুমারী শোন, এতে তুমি বিপদের মধ্যে একেবারে ডুবে যাবে। তুমি তোমার মাছের লেজটি ত্যাগ করতে চাও ত? আর মানুষদের মতন পায়ে হেঁটে চলার জন্যে এক জোড়া খুঁটিও চাও, যাতে তুমি রাজকুমারের হাত এবং অমর আত্মা লাভ করতে পার।

এইটুকু কথা বলে বুড়ী ডাইনী এমন হো-হো করে বিশ্রী আওয়াজ তুলে হাসতে লাগলেন যে, কোলাব্যাঙ ও সাপগুলো ভয়ে মাটিতে পড়ে এপাশ ওপাশ ছুটতে লাগল।

ডাইনী জলকুমারীকে আবার বললেন, তুমি একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে আমার কাছে হাজির হয়েছ। কেন না, আগামীকাল সূর্যোদয়ের পর থেকে পাকা এক বছর পর্যন্ত আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। যা হোক, আজ তোমাকে একটা জলপড়া তৈরী করে দেব। তুমি কাল সকালে সূর্যোদয়ের আগে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে বসে তা খাবে। খাওয়া শেষ হলে তোমার লেজ খসে পড়বে আর তার জায়গায় মানুষেরা যাকে 'পা' বলে সেই রকম দুটো পা গজিয়ে উঠবে। কিন্তু সাবধান, ধারাল ছোরা ঢুকিয়ে দিলে যেরকম যন্ত্রণা হয়, এ থেকে সেই রকম যন্ত্রণা তোমায় ভোগ করতে হবে। যে যে তোমাকে দেখবে, প্রত্যেকেই স্বীকার করবে যে, তুমি মানুষ সমাজে সবচেয়ে সুন্দরী হয়ে উঠেছ। তোমার চলনভঙ্গীতে আগেকার মতই আভিজাত্য থাকবে। আর কোন নাচওয়ালী তোমার মত হালকাভাবে নাচতে পারবে না। কিন্তু প্রত্যেক-বার যখনই তুমি পা ফেলবে, তোমার মনে হবে যে, তুমি একটা ধারাল ছোরার ওপর পা ফেলছ। আর তার ফলে তোমার দেহ থেকে অবশ্যই রক্ত ঝরবে। যদি তুমি এরকম যন্ত্রণা ভোগ করতে রাজী হও, তাহলে তোমাকে সাহায্য করার শক্তি আমার হবে।

— হাঁ, আমি রাজী।

ছোট্ট জলকুমারী রাজকুমার এবং অমর আত্মার কথা ভাবতে ভাবতে কাঁপা গলায় জবাব দিলেন।

তখন ডাইনী বললেন, কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ বাছা, যদি একবার তুমি মানুষের শরীর পাও, তাহলে পুনরায় কখনো জলকুমারী হতে পারবে না। কখনো জলের তলায় ডুব দিয়ে তোমার দিদিদের কাছে বা তোমার বাবার প্রাসাদে ফিরে যেতে পারবে না। আর যদি তুমি রাজকুমারের ভালবাসা জয় করতে না পার এমন গভীরভাবে, যার ফলে তিনি তোমার জন্যে তাঁর বাপ-মাকে ভুলে যাবেন, তোমাকে সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে ভালবেসে পুরুতমশাইকে তোমাদের হাত মিলিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দেবেন, তা হলে কিন্তু তুমি কখনো অমর আত্মার অধিকারী হতে পারবে না। তাছাড়া, যেদিন রাজকুমার অপর কারোকে বিয়ে করবেন, সেই দিনই তোমার হৃদয় ভেঙে পড়বে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তুমি সমুদ্রের এক টুকরো ফেনায় পরিণত হবে।

ছোট্ট জলকুমারীর মুখখানা কালো হয়ে গেল। তবু তিনি উত্তর দিলেন, আমি ভাল করে ভেবেই মন স্থির করেছি।

ডাইনী বললেন, বেশ। কিন্তু আমার পাওনা-গণ্ডাটাও ত তোমাকে দিতে হবে। আর তা ত বড় ছোটখাটো ব্যাপার নয়! পাতালবাসীদের সকলের চেয়ে তোমার গলা মিষ্টি, - তুমি সেই মিষ্টি গলা দিয়েই রাজকুমারের মনে মোহ সৃষ্টি করতে চাও। এখন আমার শর্ত শোন। আমাকে তোমার সেই মিষ্টি স্বর দিয়ে দিতে হবে। আমার অমূল্য জলপড়ার পরিবর্তে তোমার শ্রেষ্ঠ ধন আমি চাই। কারণ, ঐ জলপড়ার সঙ্গে আমার নিজের রক্ত মিশিয়ে দেব, যাতে তা ধারালো, দুমুখী চাকুর মত কাজ করবে।

ছোট্ট জলকুমারী বললেন, যদি আপনি আমার গলার স্বর নিয়ে নেন, তাহলে আমার আর কি থাকবে, বুড়ীমা?

ডাইনী বললেন, কেন, তোমার চমৎকার সুন্দর দেহ, তোমার বাতাসের মত হালকা চলন, আর তোমার অপরূপ চোখ দুটি। এই সবের সাহায্যে অবশ্যই তুমি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারবে। কি, তোমার আগেকার সব সাহস এবার উবে গেল নাকি? চলে এস, তোমার ছোট্ট জিভটি বার করে ফেল। আমার দক্ষিণে হিসেবে তোমার জিভটি কেটে নেব। আর, তোমাকে দেব আমার অমূল্য জলপড়া।

ছোট্ট জলকুমারী জবাব দিলেন, তাই হোক।

ডাইনী জলপড়া তৈরী করার উদ্দেশে বিরাট আকারের একটা কড়া উনুনে চড়িয়ে দিলেন। শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে বললেন, পরিচ্ছন্নতা, ধর্মের একটি অঙ্গ। তারপর সাপগুলোকে একটা গেরো দিয়ে বেঁধে, একসঙ্গে তাদের গা ঘসে কড়াটা পরিষ্কার করলেন। এরপর নিজের বুকে খোঁচা মেরে গর্ত করলেন, তা দিয়ে কালো রক্ত কড়ার ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগল। ওদিকে উনুনে আগুন এত ভয়ংকর হয়ে উঠল যে, তার দিকে চেয়ে আঁতকে উঠে না কেঁপে থাকা যায় না। ডাইনী নতুন নতুন জিনিস প্রতিমুহূর্তে কড়ার মধ্যে ফেলে দিতে লাগলেন। যখন সবকিছু টগবগ করে ফুটে শব্দ করতে শুরু করলে, তখন মনে হল, তা যেন কুমীরের কান্না। অবশেষে জলপড়া তৈরী হল। তা দেখে বোধ হতে লাগল যেন বিশুদ্ধ ঝরনার জল।

ডাইনী ছোট্ট জলকুমারীর জিভ কেটে নিয়ে বললেন, এই নাও তোমার জলপড়া।

ততক্ষণে জলকুমারী বোবা হয়ে গেছেন; গান করা বা কথা বলা কিছুই আর সম্ভব ছিল না।

—যদি আমার বনের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাবার পথে গাছগুলো তোমাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে, তুমি এক ফোঁটা জলপড়া তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিও। তৎক্ষণাৎ ওদের হাত আর আঙুলগুলো হাজার হাজার টুকরোয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

ডাইনী এই কথা বলে সাবধান করে দিলেন।

কিন্তু ছোট্ট জলকুমারীকে শেষ পর্যন্ত জলপড়া ছিটিয়ে দিতে হল না। গাছগুলো চোখ-ধাঁধানো জলপড়ার কথা আগে থেকে বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে নিজেরাই নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি খুব তাড়াতাড়ি বন-এলাকা, জলাভূমি ও গর্জনভরা ঘূর্ণিস্রোত পার হয়ে এলেন।

তাঁর চোখে পড়ল বাবার রাজপ্রাসাদ। বড় নাচঘরের আলোগুলো ইতিমধ্যে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানতেন, প্রাসাদের ভেতরে এখন পরিবারের সকলে ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে গিয়ে দেখা করার সাহস তাঁর হল না। তিনি যে বোবা হয়ে গেছেন। আর তাঁকে যে চিরদিনের জন্যে আত্মীয়স্বজন সকলকে ছেড়ে এখনই চলে যেতে হবে। যন্ত্রাণয় তাঁর বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম হল। তিনি চুপিচুপি প্রাসাদের বাগানে ঢুকে দিদিদের প্রত্যেকের ফুলের কেয়ারী থেকে একটি করে ফুল তুলে রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে

হাজারটা ছুঁড়ে দিলেন। তারপর নীল জলস্রোতের মাথার ওপর উঠে এলেন।

যখন তিনি রাজকুমারের প্রাসাদ দেখতে পেয়ে অপরূপ-সুন্দর মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে এসে পেঁছলেন, তখনও সূর্য আকাশে ওঠে নি। ছোট্ট জলকুমারী ভীষণ তেঁতো টগবগ-করা ফুটন্ত জলপড়া খেয়ে ফেললেন। তাঁর বোধ হল, যেন একটা দু-মুখো চাকু তাঁর কোমল অঙ্গে কেউ বিঁধে দিলে। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। দেখে মনে হতে লাগল, যেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

যখন সূর্যের আলো সাগরের বুকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাঁর জ্ঞান হল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলেন। দেখতে পেলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তরুণ রাজকুমার। রাজকুমার অপূর্ব কয়লা-কালো চোখ দিয়ে একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যে, লজ্জায় তিনি তাঁর চোখ মাটির দিকে নামিয়ে নিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর মাছের লেজ ইতিমধ্যে খসে গেছে এবং তার বদলে পেয়েছেন এমন এক জোড়া চমৎকার ছোট ছোট সাদা পা, যা কুমারী মাত্রেরই কামনার ধন। কেবল পরনে কোন কাপড় না থাকায় তিনি তাঁর খোঁপার লম্বা ঘন চুল দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে বাধ্য হলেন।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে গো? কি করে এখানে এলে?

তিনি শুধু বিষণ্ণ নীল-গভীর চোখের মিষ্টি দৃষ্টি দিয়ে রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারণ, তিনি যে বোবা হয়ে গেছলেন। তাঁর ত কথা বলার ক্ষমতা ছিল না।

রাজকুমার প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁকে হাত ধরে তুললেন। ডাইনী যেমন যন্ত্রণার কথা বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, তেমনি যেন ছুঁচ আর চাকুর ওপর দিয়ে হাঁটার যন্ত্রণা জলকুমারী পদে পদে অনুভব করতে লাগলেন। তবু শান্তভাবে সে যন্ত্রণা সহ্য করে রাজকুমারের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সাবানের বুদবুদের মতো অনায়াসে হালকা সহজভাবে পা ফেলে এগিয়ে চললেন। রাজকুমার পরীদের মতো সেই অপরূপ চলার ভঙ্গী দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

তাঁকে রেশম ও মসলিনের তৈরী দামী দামী পোশাক পরতে দেওয়া হল। ক্রমে তিনি প্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বলে গণ্য হলেন। কিন্তু হায়, তিনি যে বোবা, - কথা বলতেও পারতেন না, গান করতেও পারতেন না। চমৎকার সুন্দরী ক্রীতদাসীরা রেশমী বেশভূষা ও সোনার গয়না পরে

রাজকুমার ও তাঁর বাবা মার সামনে এসে গানের আসর বসাতেন। একদিন সেই রকম এক আসরে দৈবক্রমে ওদের একজন খুব চমৎকার গান করলেন। রাজকুমার ওর হাত দুখানি ধরে একফালি হাসলেন। তা দেখে, জলকুমারীর মনে কষ্ট হল। তিনি জানতেন যে, একদিন তিনি নিজে ঐ মেয়েটির চেয়ে অনেক বেশী মিষ্টি চমৎকার গলায় গান গাইতে পারতেন। তাই ভাবলেন, আহা, যদি রাজকুমার জানতেন যে, তাঁরই কাছে আসবার আশায় আমি চিরদিনের জন্যে আমার সেই মধুর কণ্ঠস্বর বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি।

তারপর, একদিন ক্রীতদাসীরা খুব চমৎকার বাজনার সঙ্গে নানা উচ্চাঙ্গের নাচ দেখালেন। ছোট্ট জলকুমারী তখন তাঁর সুন্দর সাদা হাত দুখানি তুলে তাঁর পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে সারা ঘরে এমন হালকা সহজ গতিতে নাচতে লাগলেন যে, এর আগে তেমন নাচ কেউ নাচে নি। ক্রীতদাসীদের তুলনায় তাঁর প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে নতুন সৌন্দর্যের সৃষ্টি হতে লাগল। তাঁর চোখ দুটির আবেদন দর্শকদের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়ে তুললে ঢের বেশী সহজভাবে। প্রত্যেকেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হলেন রাজকুমার। তিনি জলকুমারীকে আদর করে কাছে ডেকে বললেন, ওগো আমার ছোট্ট, কুড়িয়ে-পাওয়া খুকু।

জলকুমারী একের পর এক নতুন নতুন নাচ নেচেই চললেন। যতবার তাঁর পা মেঝে স্পর্শ করলে, ততবার তিনি অনুভব করলেন, যেন তিনি ধারালো চাকুর ওপর দিয়ে হাঁটছেন। রাজকুমার ঘোষণা করলেন যে, তিনি কখনো জলকুমারীকে ত্যাগ করবেন না। রাজকুমারের ঘরের দরজার কাছে মখমলে তৈরী বিছানায় ঘুমোবার হুকুম তাঁকে দেওয়া হল। যাতে তিনি রাজকুমারের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বাইরে যেতে পারেন, সেই উদ্দেশে রাজকুমার তাঁকে পুরুষের পোশাক পরালেন। তারপর তাঁরা দুজনে একসঙ্গে গন্ধে-ভরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেখানে সবুজ ডালপালা তাঁদের কাঁধের ওপর ছুঁয়ে যেত, ছোট ছোট পাখিরা শান্ত শীতল পাতার অন্তরালে বসে গান করত। তিনি রাজকুমারের পাশে পাশে পর্বতের ওপর উঠে যেতেন। যদিও অপরে দেখতে পেত, তাঁর পা দিয়ে রক্ত পড়ছে, তবু তিনি তাঁর যন্ত্রণার কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। তারপর রাজকুমারকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেন, যতক্ষণ না চোখে পড়ত পায়ের নীচেয় দূর দেশের যাত্রী, উড়ে-যাওয়া পাখির দলের মত মেঘগুলোর ছুটোছুটি।

রাত্রিবেলা রাজকুমারের প্রাসাদে সকলে যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তিনি একলা চওড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়িগুলোর শেষে গিয়ে সমুদ্রের জলে পা ডুবিয়ে বসতেন, যাতে তাঁর পায়ের যন্ত্রণার জ্বালা দূর হয়। সেখানে বসে বসে তিনি সমুদ্রতলের আপনজনদের কথা ভাবতেন। একদিন রাতে তাঁর দিদিরা হাত ধরাধরি করে জলের ওপর উঠে এসে সাঁতার দিতে দিতে করুণ স্বরে গান করতে লাগলেন। তিনি তখন তাঁদের ইঙ্গিত করলেন। দিদিরা তাঁকে চিনতে পারলেন, তাঁর ব্যবহারে অপর সকলে যে কত গভীর কষ্ট পেয়েছে, সে কথা জানালেন। এর পর থেকে দিদিরা রোজ রাত্রে তাঁকে দেখতে আসতে লাগলেন। একদিন তাঁর বোধ হল, অনেকদূরে যেন তাঁর বুড়ী ঠাকুমা অপেক্ষা করে রয়েছেন। বুড়ী বহুবছর সাগরের বুকে উঠে আসেন নি। মাথায় মুকুটপরা সাগর-রাজাও যেন তাঁর পাশে রয়েছেন। তাঁরা দুজনে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আদর জানালেন, কিন্তু দিদিদের মত তীরের অত কাছাকাছি সাঁতার দিয়ে আসতে সাহস করলেন না।

প্রতিদিন রাজকুমারের প্রতি তাঁর প্রেম গভীর হয়ে বাড়তে লাগল। আর রাজকুমারও তাঁকে ভালবেসে ফেললেন—যেমন লোকে অতি আদরের ছোট শিশুকে ভালবাসে। তবে এঁকে বিয়ে করে নিজের রানী করবেন এমন কোন ভাবনা তাঁর মাথায় একবারও এল না। কিন্তু হায়, রাজকুমারের স্ত্রী না হলে ত জলকুমারী অমর আত্মার অধিকারিণী হতে পারবেন না! আর রাজকুমার অন্য কারোকে বিয়ে করলে তার পরদিনই তাঁকে সমুদ্রের ফেনায় পরিণত হতে হবে যে!

রাজকুমার যখন তাঁকে আলিঙ্গন করে কপালে চুমু খেতেন, তখন জলকুমারীর চোখ দুটি থেকে এই প্রশ্নটিই জ্বলজ্বল করে জেগে উঠত, আপনি কি আমাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন না?

রাজকুমার একদিন বলেছিলেন, হাঁ, আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি; কারণ, তোমার হৃদয় সকলের চেয়ে বড়। আর, তুমি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী অনুরক্ত। তোমাকে দেখতে ঠিক আর একজন তরুণীর মত, যার সঙ্গে একদিন আমার দেখা হয়েছিল; তবে তাকে পুনরায় আর কোনদিন দেখিনি। আমি যে জাহাজে করে যাচ্ছিলুম, তা ডুবি হয়ে গেল। ঢেউ-এর আঘাতে-আঘাতে ডাঙার কাছে এসে একটি পবিত্র মন্দিরের বাগানে আটকে পড়েছিলুম। সেখানে কতকগুলি তরুণী প্রার্থনা করছিল। সবচেয়ে কম বয়সী যে,—সে

আমাকে দেখতে পেয়ে সেদিন আমার জীবন রক্ষা করে। আমি কেবলমাত্র দুবার তাকে দেখেছিলুম। একমাত্র তাকেই আমি আমার জীবনে ভালবাসতে পারি। কিন্তু তুমি ঠিক তার মত দেখতে আর তুমিই আমার মন থেকে তার মূর্তি প্রায় মুছে দিয়েছ। সে ছিল পবিত্র মন্দিরের লোক। তাই হয়ত আমার ভাগ্য তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। আমাদের দুজনের কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না।

ছোট্ট জলকুমারী ভাবলেন, হায়, হায়, রাজকুমার ত জানেন না যে, আমিই সেদিন তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিলুম। আমিই সমুদ্রের পরপারের বনের মধ্যে যেখানে পবিত্র মন্দিরটি ছিল, সেখানে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলুম। আমি ফেনার নীচে বসে বসে দেখছিলুম, যদি কোন মানুষ তাঁর সাহায্যে এসে উপস্থিত হয়। যে সুন্দরী মেয়েটিকে রাজকুমার এখন আমার চেয়ে বেশী ভালবাসছেন, তাকে ত আমিই প্রথম দেখতে পেয়েছিলুম।

জলকুমারীর বুক থেকে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কারণ, জলকুমারীদের চোখ থেকে চোখের জল কখনো বার হয় না। তিনি আবার ভাবলেন, রাজকুমার বলছেন, সেই তরুণীটি পবিত্র মন্দিরের মেয়ে, তাই সংসারী হবার জন্যে কখনো সংসারে ফিরে আসবে না। আরও বলছেন যে, ওঁদের দুজনের পুনরায় দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথচ আমি ত তাঁরই পাশে পাশে রয়েছি, রোজ রোজ তাঁকে দেখছি। আমি তাঁর সেবা করব, তাঁকে ভালবাসব—তাঁর জন্যে আমার জীবনের সবকিছু বিসর্জন দেব।

হঠাৎ একদিন গুজব শোনা গেল, রাজকুমারের বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যের সুন্দরী রাজকুমারীকে আনার চেষ্টা চলছে। তাই তিনি একখানি জাহাজকে চমৎকারভাবে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সাজিয়ে তুলছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি যেন পাশের রাজার রাজ্য দেখতে ভ্রমণে বার হচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজকন্যাকে দেখা। তাঁর সঙ্গে থাকবে নানা লোকজন। ছোট্ট জলকুমারী মাথা নেড়ে একফালি হাসলেন। তিনি অপরদের চেয়ে ভালভাবে রাজকুমারের মনের কথা জানতেন। একদিন রাজকুমার তাঁকে বলেছিলেন, আমার বেড়াতে বার হওয়া কর্তব্য। এই সুন্দরী রাজকন্যাকে আমার দেখা দরকার। আমার বাবা-মা তা-ই চান। অবশ্য, রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্যে তাঁরা আমাকে জোর জবরদস্তি করবেন না। হায়, আমি ত ওকে ভালবাসা দিতে পারি না। সেই মন্দিরের সুন্দরী মেয়েটির মত তোমাকে বরং

দেখতে, কিন্তু ঐ রাজকন্যা ত তার মত নয়। আর যদি বিয়ের পাত্রী পছন্দ করার জন্যে আমাকে জোর করাই হয়, ও আমার কুড়িয়ে-পাওয়া বোবা মেয়ে, তাহলে সে পাত্রী হবে তুমি। কত যে কথা ভরা থাকে তোমার চোখ দুটিতে!

তারপর তিনি জলকুমারীর গোলাপী মুখে চুমু খেয়েছিলেন, ওর লম্বা চুলের রাশি নিয়ে খেলা করেছিলেন, ওর বুকের ওপর মাথা রেখেছিলেন। সেই বুকে মানুষের আদরের সৃষ্টি-করা আশা আর অমর আত্মা লাভের কামনা জাগিয়ে তুলেছিল চাঞ্চল্য।

পাশের রাজ্যে যাত্রা করার আগে চমৎকার ভাবে সাজানো জাহাজটিতে উঠে রাজকুমার জলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বোবা খুকু, তুমি সমুদ্রকে ত ভয় করো না?

তারপর তিনি ঝড়ঝঞ্ঝার রুদ্র মূর্তি আর শান্ত সমুদ্রের সৌন্দর্যের কথা গল্প করতে লাগলেন। গভীর জলে যে অদ্ভুত জাতের মাছ আছে, ডুবুরীরা সমুদ্রের তলায় গিয়ে যেসব বিস্ময়কর জিনিস দেখতে পেয়েছে, সেই গল্পও করলেন। গল্প শুনে জলকুমারীর হাসি পেল। সমুদ্রের তলায় কি-সব আছে, তা তিনি অনেক ভাল করেই ত জানতেন।

জ্যোৎস্না-ভরা রাতে জাহাজের মধ্যে যখন সকলে ঘুমে আচ্ছন্ন, তিনি ডেকের ওপর একলা বসে স্বচ্ছ জলের ভেতরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। কল্পনায় তাঁর বোধ হত, তিনি যেন তাঁর বাবার রাজপ্রাসাদ দেখতে পাচ্ছেন; প্রাসাদের ওপর-তলায় তাঁর বুড়ো ঠাকুমা যেন রূপোর মুকুট মাথায় পরে বসে জাহাজের একেবারে নীচের তক্তাখানির দিকে করুণ চোখে চেয়ে আছেন। তারপর তাঁর দিদিরা জলের ওপরে উঠে এলেন, বিষণ্ণ মনে ছোটবোনের দিকে তাকিয়ে দুঃখে নিজেদের সাদা হাতগুলি মোচড়াতে লাগলেন, ছোট বোন দিদিদের দিকে ইঙ্গিত করলেন, একফালি হাসলেন;—যেন মিথ্যা ছলনা করে বললেন, তিনি সুখে আছেন, স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন। এমন সময়ে জাহাজের কেবিন-বয় সেখানে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দিদিরা ডুব দিয়ে জলের তলায় চলে গেলেন। কেবিন-বয় ভাবলে, সাদামূর্তি বলে যা মনে হয়েছিল, তা জলের ফেনা বই আর কিছু নয়।

পরের দিন সকালবেলা জাহাজ পাশের রাজ্যের রাজধানীতে এসে পৌছল। কি অপরূপ সেই শহর! তখন চারিদিকে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল। উঁচু উঁচু তোরণ থেকে বেজে-ওঠা শিঙার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পতাকা উড়িয়ে, চকচকে সঙ্গিন উঁচিয়ে সৈন্যদল অতিথিকে অভ্যর্থনা করার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর প্রতিদিন নতুন নতুন প্রমোদের আয়োজন করা হল। নাচ গান, ভোজন পরপর চলতে লাগল। কিন্তু রাজকন্যে তখন শহরে ছিলেন না। লোকে বললে, খুব দূরের এক পবিত্র মন্দিরে রেখে তাঁকে মানুষ করা হচ্ছে। যাতে তিনি রাজ-পরিবারের উপযুক্ত চালচলন ও গুণগুলি শিখতে পারেন। যা হোক, কয়েকদিন পরে তিনি রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন।

ছোট্ট জলকুমারী রাজকন্যার রূপ খুঁটিয়ে দেখার জন্যে খুব উৎসুক ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখে নিজের মনে স্বীকার করলেন যে, এ রকম সুন্দর মুখ আর কখনো দেখেন নি। রাজকন্যার দেহ ছিল লাবণ্যে ভরা, রং ধবধবে। তাঁর দীঘল, ঘন কালো ভ্রূর নীচেয় আন্তরিকতায় ভরা, গাঢ়-নীল চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল।

রাজকুমার রাজকন্যাকে দেখে ত বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, এই যে তুমি! —যখন আমি তীরের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, তুমিই ত আমাকে বাঁচিয়েছিলে। তারপর তিনি লজ্জায় রক্তবর্ণ তাঁর কনেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন।

পরে ছোট্ট জলকুমারীকে বললেন, ওঃ, আজ আমি খুব সুখী! আমার সবচেয়ে সেরা স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে! তুমি সবচেয়ে বেশী আমার মঙ্গল কামনা করো। তুমি নিশ্চয়ই আমার সুখের জন্যে খুশী হবে।

জলকুমারী তাঁর হাতে চুমু খেলেন, তবে তাঁর বোধ হল, তাঁর বুক যেন ভেঙে যাচ্ছে। মনে পড়ল, রাজকুমারের বিয়ের পরের দিন সকালবেলা ত তাঁর মৃত্যু হবার কথা। আর মৃত্যুর পর সমুদ্রের বুকে তুচ্ছ এক টুকরো ফেনায় রূপান্তরিত হতে হবে।

ক্রমে গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠল, পথে পথে ঘোষকেরা ঘোড়ায় চড়ে আসন্ন বিয়ের খবর ঘোষণা করতে লাগল। প্রতি গির্জার বেদীতে দামী দামী রূপোর পাত্রে সুগন্ধি তেলের আলো জ্বলতে লাগল, পুরুতেরা দোলাতে লাগলেন ধুনুচি। বর-কনে হাতে হাত মিলিয়ে ধর্মযাজকের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। ছোট্ট জলকুমারী রেশমী জামাকাপড় আর সোনার গয়না পরে কনের পোশাক সামলে রাখার ভার পেয়েছিলেন। তিনি সে কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু বিবাহ-অনুষ্ঠানের সময় মন্ত্রোচ্চারণের কোন ধ্বনিই তাঁর কানে ঢুকল না। কোন কৃত্যই চোখে পড়ল না। তাঁর মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছিল শুধু আসন্ন মৃত্যুর বিষণ্ণ ভাবনা, আর পাতাল ত্যাগ করে পৃথিবীতে এসে তিনি কত কি যে হারালেন, তার হিসাবনিকাশ।

সন্ধ্যে হলে অনেকগুলো বিচিত্র লণ্ঠন জ্বালা হল, জাহাজের নাবিকেরা ডেকের ওপর নাচে মত্ত হয়ে উঠল। প্রথম দিন পৃথিবীর ডাঙায় তাঁর আসার কথা জলকুমারীর মনে পড়ল। সেদিনও দেখেছিলেন এমনই আড়ম্বর আর আমোদ প্রমোদের উচ্ছ্বাস। হঠাৎ তিনি ঘুরপাক খেয়ে সমবেত নাচে যোগ দিলেন। যারা উপস্থিত ছিল, সকলেই নাচের প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এরকম মনোমুগ্ধকর নাচ তিনি ত আর কখনো করেন নি। তাঁর নরম পা দুখানিতে চাকু ঢোকার যন্ত্রণা হতে লাগল। তিনি তা কিছুমাত্র পরোয়া করলেন না ;.তাঁর বুক ভবে যে ঢেব বেশী যন্ত্রণার জ্বালা অনুভব করছিলেন! তিনি জানতেন, যাঁকে লাভ করার জন্যে তিনি ঘর ছেড়ে আপনজনদের ত্যাগ করেছেন, তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর বিসর্জন দিয়েছেন, আর রোজ অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে মরেছেন, সেই রাজকুমাবকে আজ শেষ দেখা দেখার দিন। তাঁব সঙ্গে একই বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার, একই সমুদ্রের সৌন্দর্য আর তারা-ভরা আকাশের আলো উপভোগ করার আজই শেষ দিন। চিন্তা করা বা স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনাহীন এক অনন্ত কালো রাত এখন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কারণ, তাঁর ত কোন আত্মা নেই, আর তা লাভ কবার সুযোগও এখন আর মিলবে না।

ক্রমে মাঝ রাত অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল, তবু জাহাজের ওপর আমোদ প্রমোদের ধুম চলল ; আর মনের মধ্যে মরণের চিন্তা বেদনার সৃষ্টি করলেও জলকুমারী সবকিছু ভোলার ভান করে হাসিতে নাচেতে আর মেলার আনন্দে মত্ত হয়ে রইলেন। রাজকুমার তাঁর সুন্দরী কনেকে বারবার চুমু খেতে লাগলেন ; তাঁর কালো চুলের গোছা নিয়ে খেলা করলেন, তাবপর চমৎকার এক তাঁবুর মধ্যে বিশ্রাম করার উদ্দেশে দুজনে হাত ধরাধরি করে চলে গেলেন।

তখন জাহাজের ওপরে প্রমোদের মেলা শেষ হয়ে গেছে। কোথাও কেউ নেই। শুধু চালক হালের কাছে একাকী বসে আছেন। এমন সময় ছোট্ট জলকুমারী জাহাজের রেলিং-এর ওপর দুই সাদা হাতে ভর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পূবের আকাশে সূর্য-ওঠা দেখার চেষ্টা করলেন। তিনি জানতেন, প্রথম কিরণ-ছটাই তাঁর মৃত্যু ঘটাবে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, দিদিরা ঢেউ-এর ওপরে মাথা তুলে রয়েছে। তাঁর মত তাঁরা সকলেও ম্রিয়মান, তাঁদের প্রত্যেকের সুন্দর লম্বা চুলের রাশি আর বাতাসে উড়ছে না ; তা কেটে ফেলা হয়েছে।

তাঁরা বললেন, ছোটু শোন, আজ রাতে তোমার যাতে মৃত্যু না ঘটে এইটুকু করার জন্যে আমরা আমাদের চুল ডাইনীকে দান করেছি। তিনি চুলের বদলে

একটি ছোরা আমাদের দিয়েছেন। বেশ ধারালো ছোরা, তুমি পরীক্ষা করে দেখো না। এখন সূর্য ওঠার আগে রাজকুমারের বুকে এই ছোরা তোমাকে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর ওর গরম রক্তে যখন তোমার পায়ের পাতা ভিজে যাবে, তখন পাগুলি একটি মাছের লেজে পরিণত হবে; আর তুমি হয়ে যাবে আবার জলকুমারী। তখন তুমি পুনরায় আমাদের কাছে পাতালপুরে আসতে পারবে। তাছাড়া, প্রাণহীন, নোনতা ফেনায় পরিণত হওয়ার আগে পর্যন্ত তোমার তিনশ বছরের জীবন যাপন করতে পারবে। অতএব জলদি কর,—জলদি কর। রাজকুমার অথবা তুমি—সূর্যোদয়ের আগে একজনকে মরতে হবে। আমাদের বুড়ী ঠাকুমা তোমার জন্যে অশান্তিতে গুমরে গুমরে থেকে তাঁর সাদা চুলগুলি সব হারিয়েছেন, যেমন আমরা ডাইনীর কাঁচির ধারে আমাদের চুলগুলি হারিয়েছি। অতএব জলদি কর! ওই আকাশে লাল আভা দেখা দিয়েছে, তুমি কি বুঝতে পারছ না? কয়েক মিনিটের মধ্যে সূর্যোদয় হবে, তখন তোমাকে যে মরতেই হবে।

তারপর দিদিরা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলের তলায় ডুবে গেলেন।

ছোট্ট জলকুমারী তাঁবুর রক্ত-রাঙা পর্দা তুলে দেখতে পেলেন, সুন্দরী রাজকুমারী রাজকুমারের বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছেন। তিনি মুখ নীচু করে রাজকুমারের সুডোল কপালে চুমু দিলেন। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ভোরের লাল আভা ক্রমশঃই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। পরে ধারালো ছোরার দিকে চাইলেন এবং চোখ ফিরিয়ে আর একবার রাজকুমারকে দেখে নিলেন। রাজকুমার তখন ঘুমের ঘোরে রাজকুমারীর নাম ধরে ডাকছিলেন। এখন কেবল রাজকুমারীই যে তাঁর হৃদয় মন সব ভরে রেখেছেন। জলকুমারীর হাতের আঙুলগুলি আপনা থেকে ছোরাখানি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে—কিন্তু পর মুহূর্তে তিনি তা দূরে সমুদ্রের বুকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যেখানে ছোরাখানি পড়ল, সেখানে জল লাল হয়ে গেল, যেন জলের তলা থেকে কয়েক ফোঁটা রক্তের বুদবুদ ভেসে উঠল। মৃত্যু পথের যাত্রী জলকুমারা শেষবারের মত রাজকুমারের দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ধীরে ধীরে তাঁর দেহ ফেনায় পরিণত হচ্ছে।

সূর্য এখন সমুদ্রের বুক ছেড়ে আকাশের ওপরে উঠে পড়েছে। তার কিরণ ওই ঠাণ্ডা সোনার টুকরোর ওপর পড়ে করুণার তাপ বর্ষণ করলে। তার ফলে ছোট্ট জলকুমারীকে মৃত্যু যন্ত্রণা আদৌ ভোগ করতে হল না। তিনি আলো ঝলমল সূর্যকে দেখতে পেলেন। আর দেখতে পেলেন আকাশের বুকে শত শত

স্বচ্ছ-সুন্দর সত্তা ভেসে বেড়াচ্ছে। তখনো জাহাজের সাদা পালের একটু আভাস তাঁর চোখে আসছে। আর চোখে আসছে উড়ে-যাওয়া সুন্দর সুন্দর সত্তাগুলির ঝাঁকের ওপরে আকাশের লাল মেঘের দৃশ্য। সত্তাগুলির ভাষা ছিল সুরেলা। কিন্তু সে সুর এত স্বর্গীয় যে, মানুষের কান দিয়ে তা শোনা যায় না। যেমন মানুষের চোখ দিয়ে দেখা যায় না তাঁদের চেহারা। তাঁদের পাখা নেই বটে, তবু ভারহীনতার গুণে তাঁরা আকাশের বুকে ভেসে থাকতে পারেন। ছোট্ট জলকুমারী দেখতে পেলেন, এঁদেরই মত তাঁরও একটি দেহ আছে, যা ফেনার মধ্য থেকে ক্রমশঃ উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে চলেছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কোথায় আমি?

তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর বর্তমান সঙ্গীদের মত এতই স্বর্গীয় যে, পৃথিবীর কোন সুরে এর মিষ্টতার ঠিক ঠিক রূপ ধরা যায় না।

উত্তর শোনা গেল, তুমি আকাশ মার্গের মেয়েদের সমাজে পৌঁছে গেছ। কোন জলকুমারীর ত অমর আত্মা থাকে না। তা লাভ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন মানুষের ভালবাসা জয় করতে পারে। তার চিরকালের কল্যাণ নির্ভর করছে আর একজনের ইচ্ছার ওপর। কিন্তু আকাশ-মার্গের মেয়েরা স্বভাবগুণে অমর আত্মার অধিকারিণী না হলেও জীবনে মহৎ কিছু কাজের দ্বারা তা লাভ করতে পারেন। আমরা গরম আবহাওয়ার দেশে দেশে উড়ে যাই যাতে মানুষেরা ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। যেসব মহামারী রোগে সেখানকার তপ্ত আবহাওয়া ভরে থাকে, আমরা আমাদের পাখার হাওয়া দিয়ে তাদের উড়িয়ে দিই। আমরা রোগ ভাল করে মানুষদের নতুন বলে বলীয়ান করার উদ্দেশে বাতাসে বাতাসে ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে দিই। আমাদের যত কিছু শক্তি আছে, তা দিয়ে তিনশ বছর ধরে কল্যাণ-কাজ করার চেষ্টার পর আমরা অমর আত্মা লাভ করি,—মানুষগোষ্ঠীর অনন্ত সুখের ভাগীদার হই। জলকুমারী খুকু, তুমি আমাদের মত হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভাল কাজ করার চেষ্টা করেছ। তুমি দুঃখ ভুগেছ, যন্ত্রণা সহ্য করেছ। তার ফলে আকাশমার্গের সত্তা-রূপে নিজেকে উন্নীত করেছ। এবার তিনশ বছর পূর্ণ হলে তোমার সুকৃতি তোমাকে এনে দেবে অমর আত্মা।

তারপর ছোট্ট জলকুমারী উজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে সূর্যের দিকে তাকালেন। এই প্রথমবার তাঁর বোধ হল, চোখদুটি জলে ভরে গেছে। ওদিকে জাহাজের ওপর আবার সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তিনি দেখতে পেলেন, রাজকুমার ও

সুন্দরী রাজকুমারী যেন তাঁর খোঁজ করে বেড়াতে বেড়াতে মুক্তোর মত ফেনার টুকরোটার দিকে সজল চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন তাঁদের বিশ্বাস যে, জলকুমারী ঢেউ-এর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই ফেনার টুকরোর মধ্যে নতুন রূপ পেয়েছেন।

তারপর তিনি অদৃশ্যভাবে নতুন বধূর কপালে চুমু খেলেন আর রাজকুমারকে সযত্নে বাতাস করলেন। পরে আকাশমার্গের অন্যান্য তরুণীদের সঙ্গে উঠে গেলেন গোলাপী রঙের মেঘের দল যেখানে উড়ে বেড়াচ্ছিল তার পারে।

তিনি বললেন, তিনশ বছর শেষ হলে এইভাবে আমরা স্বর্গরাজ্যে উড়ে যাব।

আকাশমার্গের একজন তরুণী ফিসফিস করে বললেন, আগেও আমরা যেতে পারি। আমরা ত অদৃশ্যভাবে মানুষদের বাড়িতে বাড়িতে যাই। সেখানে যেদিন একজন ভাল খোকা বা খুকুকে দেখতে পাব—যার ব্যবহারে বাপ মা পরম খুশী—সেইরকম প্রত্যেকদিনের জন্যে পরমেশ্বর আমাদের পরীক্ষার মেয়াদ কমিয়ে দেন। সেই খোকা বা খুকুটা জানতেও পারে না যে, যখন আমরা তার ঘরের মধ্যে উড়ে যাই আর তার মত ভাল একজনকে আবিষ্কার করে আনন্দে হেসে ফেলি, তখন আমাদের তিনশ বছরের মেয়াদ থেকে একটি বছর বাদ পড়ে যায়। আবার যখন একজন বদমেজাজী দুষ্টুকে দেখতে পাই, তখন দুঃখে আমাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। আর প্রত্যেক ফোঁটা চোখের জলের জন্যে আমাদের মেয়াদের সময় বেড়ে যায় পুরো এক-একটা দিন।

॥ খোলা জানালা ॥

॥ "সাকি"-র লেখা ॥

[সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর ছদ্মনাম ছিল "সাকি", প্রকৃত নাম হচ্ছে হেকটর হিউ মুনরো। জাতিতে ইংরেজ, জন্ম ব্রহ্মদেশে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। পরে ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করেন। মৃত্যু ঘটে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে।

এক সময়ে তাঁর ছোটগল্প ইংরেজী-সাহিত্য পাঠকদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। টেকনিকের দিক থেকে ছিলেন ছোটগল্প রচনার অসামান্য শিল্পী। বিশেষতঃ, উদ্ভট-কল্পনা ভিত্তিক কাহিনী সৃষ্টির জাদুকর। তাঁর প্লট উন্মোচনের কৌশল আমেরিকার বিখ্যাত ছোট-গল্প লেখক ও হেনরার রীতিপদ্ধতির কথা মনে করিয়ে দেয়। তবু সমগ্রভাবে বিচার করলে মনে হয়, ব্রিটিশ ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একেবারে একজন স্বতন্ত্র এবং একক শিল্পী। তাঁর লেখায় ছিল না ভাবের গভীরতা। হয়ত কাহিনী উপস্থাপনের পদ্ধতি ছিল লঘু। তবু তাঁর কালের জীবনধারাকে তিনি শক্তিশালী, মনস্তত্ত্ব-সন্ধানী শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং সুনিপুণ তুলিতে তার খণ্ড খণ্ড ছবি এঁকেছিলেন।

আলোচ্য ছোটগল্পের নায়িকা হচ্ছে একজন বাকপটু, কল্পনাবিলাসী, চটুলস্বভাবের কিশোরী কন্যা। মাসীমার অনুপস্থিতিতে বৈঠকখানা ঘরে হাওয়া-বদলসূত্রে-আসা একজন অতিথিকে একটি উদ্ভট গল্প ফেঁদে সম্মোহিত করে রাখাটাই হচ্ছে গল্পের মূল উপকরণ। মুনরোর প্রতিভার সংস্পর্শে এই ছবি হাস্যরস, গম্ভীররস এবং উদ্ভটরসের সংমিশ্রণে হয়ে উঠেছে অপূর্ব একখানি সৃষ্টি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চরম উদ্ভট হয়েও পাঠকের মনে সব সময়ে জাগায় বাস্তবতার বিশ্বাস। মাসীর কিশোরী বোনঝি একটি নিখুঁত ও সজীব চরিত্র।]

একজন খুব আত্মসচেতন, কল্পনাচঞ্চল পনের বছরের কিশোরী বললেন,

আমার মাসীমা এখনই নীচেয় নেমে আসবেন। ইতিমধ্যে আপনি আমার সঙ্গে বরং গল্প করার চেষ্টা করুন। কেমন?

ফ্র্যামটন নাটেল সময়োপযোগী এমন দুটো কথা বলার চেষ্টা করলেন, যাতে আগতপ্রায় মাসীমাকে অন্যায়ভাবে ছোট না করে এই মুহূর্তের বোনঝিটিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে একটু তোষামোদ করা হয়। কিন্তু এই সম্পূর্ণ অপরিচিত সমাজে ক্রমান্বয়ে একজনের পর আর-একজনের সঙ্গে এমনভাবে সামাজিক দেখা-সাক্ষাৎ করলে, সম্প্রতি-চিকিৎসাধীন তাঁর স্নায়ু-রোগের উপশমে বিশেষ কিছু ফল হবে কি না—সে বিষয়ে তাঁর মনে আগের চেয়ে ঘোরতর সংশয় জেগে উঠল।

এই স্বাস্থ্যকর গ্রামে হাওয়া বদলের আশায় আসার উদ্দেশে তিনি যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সে সময়ে তাঁর বোন তাঁকে বলেছিলেন, আমি জানি, শেষ পর্যন্ত এর ফল কি হবে! তুমি সেখানে নতুন জায়গায় একা-একা নিজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। কোন জীবিত মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা, আড্ডা-আলোচনা করবে না। আর, সেইভাবে মনমরা হয়ে দিনরাত কাটাবার ফলে তোমার স্নায়ুর অসুখ আরো বরং বেড়ে যাবে। যাহোক, ওখানকার যেসব বাসিন্দাদের আমি জানি, তাদের নামে পরিচয়-পত্র তোমায় দিচ্ছি। যতদূর মনে পড়ছে, আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ সজ্জন।

ফ্র্যামটনের মনে হঠাৎ এক-টুকরো জিজ্ঞাসা খেলে গেল, আচ্ছা, পরিচয়-পত্রগুলির একখানি নিয়ে যে-মহিলার সঙ্গে এখন দেখা করতে এসেছি, সেই মিসেস স্যাপলটন সজ্জন ব্যক্তিদের বিভাগে পড়েন ত?

এদিকে বোনঝি দেখলেন যে, দুজনে বেশ কিছুক্ষণ মুখোমুখি চুপ করে বসে থাকা হয়েছে; তাই কিছু-একটা প্রসঙ্গ তোলার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানকার অনেক লোককে কি আপনি চেনেন?

ফ্র্যামটন উত্তর দিলেন, না, না। একজনকেও না। প্রায় চার বছর আগে আমার বোন এখানে ধর্মযাজকের কাছে কিছুদিন ছিলেন। তিনি আমাকে এখানকার কয়েকজনের নামে পরিচয়-পত্র দিয়েছেন।

স্পষ্টতঃ, অনুশোচনার সুরে তিনি শেষোক্ত মন্তব্যটি করলেন।

আত্ম-সচেতন কিশোরী বললেন, তাহলে আপনি আমার মাসীমার সম্বন্ধে কার্যতঃ কিছুই জানেন না।

আগন্তুক স্বীকার করলেন, জানি শুধু তাঁর নাম আর ঠিকানা।

তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, মিসেস স্যাপলটন বিবাহিতা না বিধবা? তবে ঘরের মধ্যে বর্ণনা-করা-যায়-না এমন-কিছু এই ইঙ্গিতই দেয় যে, এ বাড়িতে পুরুষ মানুষও বাস করে।

তরুণী বললেন, জানেন, আমার মাসীমার জীবনে সবচেয়ে বড ট্র্যাজিডি ঘটেছিল ঠিক তিন বছর আগে অর্থাৎ প্রায় আপনার বোনের থাকার সময়েতেই।

ফ্র্যামটন প্রশ্ন করে উঠলেন, বলেন কি, আপনার মাসীমার ট্র্যাজিডি?

তাঁর মনের ভাব ছিল এই যে, যে ভাবেই হোক, এই শান্ত, গ্রাম্য পরিবেশে ট্র্যাজিডি ঘটা যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার!

বোনঝি হঠাৎ উঠোনের দিকে একটি খোলা, বড়, ফরাসী ধরনের জানালা দেখিয়ে বললেন, আপনি হয়ত ভাবছেন, এই অকটোবর মাসের বিকালবেলা আমরা ওই জানালাটা দু ফাঁক করে খুলে রেখেছি কেন?

ফ্র্যামটন বললেন, বছরের এই সময়টা ত বেশ গরম। তবে ওই জানালার সঙ্গে মাসীমার ট্র্যাজিডির কি কোন যোগ আছে?

—তিন বছর আগে একদিন ওই জানালার ভেতর দিয়েই তাঁর স্বামী আর দুজন তরুণ বয়সের ভাই সারাদিন শিকার করার উদ্দেশে বার হয়ে গেছলেন। তারপর তাঁরা আর ফিরে আসেন নি। তাঁদের প্রিয় কাদাখোঁচা পাখি শিকারের জায়গা ওই জলাভূমি পার হবার সময়ে তিনজনেই বিশ্বাসঘাতক চোরাবালিভরা পাঁকের মধ্যে আটকা পড়ে যান। সময়টা ছিল সে বছরের গরমকালের ভয়ংকর বাদলার দিন। অন্যান্য বছরে যে জায়গাকে ওই ঋতুতে নিরাপদ বলে জানা ছিল, সেখানেই আকস্মিকভাবে এ ঘটনা ঘটল। তাঁদের দেহ এ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় নি। এটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার!

এ সময়ে তরুণীর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক দৃঢ়তা হারিয়ে সত্যিই করুণ হয়ে উঠল। তিনি বলে চললেন, বেচারী মাসীমা সদাসর্বদা ভাবেন যে, তাঁরা একদিন না একদিন ফিরে আসবেন। তাঁরা এবং ছোট্ট বাদামী রঙের যে স্প্যানিয়েল কুকুরটি তাঁদের সঙ্গে হারিয়ে গেছে—সেও! যেমন অভ্যেস ছিল, সেইভাবে তাঁরা সকলে ওই জানালার পথ দিয়ে হেঁটে আসবেন। এইজন্য রোজ ভর সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত ওই জানালাটি খুলে রাখা হয়। আহা, বেচারী মাসীমা! তিনি যখন-তখন আমাকে গল্প বলেন, কেমন করে সাদা ওয়াটার-প্রুফ কোট হাতে নিয়ে তাঁর স্বামী একদিন বাইরে চলে গেছলেন; সঙ্গে গেছলেন 'বারটি, তুমি কেন বারণ কর—' গানটি গাইতে গাইতে ছোট ভাই রন্নি। রন্নি তাঁর দিদিকে ক্ষেপাবার জন্য সর্বদা

এই গানটি গাইতেন। কেননা, দিদি প্রায়ই বলতেন, এই শিকার করতে যাওয়া তাঁর কাছে অসহ্য লাগে। আপনি কি ভাবতে পারেন, কোন-কোন দিন এই রকম শান্ত, চুপচাপ সন্ধ্যেবেলা আমার কেমন-যেন মনে হয়, ওই জানালাটা দিয়েই তাঁরা শেষ পর্যন্ত হেঁটে আসবেন—।

একটু কেঁপে উঠে তরুণী মুখ বন্ধ করলেন। তার ফলে ফ্রামটন সামান্য স্বস্তি অনুভব করলেন যেন। আসতে দেরী হওয়ার দরুন মাসীমা এমন সময়ে মাপ চাওয়ার ঝড় তুলে হৈ-হৈ করে ঘরে ঢুকলেন।

তিনি বললেন, আশা করি, আমাদের লক্ষ্মীমেয়ে ভেরা মজার মজার কথা বলে আপনাকে খুশী রেখেছে।

ফ্র্যামটন জবাব দিলেন, মেয়েটি সত্যি খুব চমৎকার।

মিসেস স্যাপলটন তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছা, ওই জানালাটা খোলা রয়েছে, তার জন্যে আপনি কিছু মনে করছেন না ত? আমার স্বামী এবং দু ভাই শিকার করে এখনি বাড়ি ফিরবেন। তাঁরা সবসময়ে এই পথ দিয়েই ফিরে আসেন। আজ জলাভূমিতে কাদাখোঁচা পাখি শিকার করতে বার হয়ে গেছেন। অতএব, ঢুকেই আমার বেচারা কার্পেটগুলোর দশা কাদা মাখিয়ে চমৎকার করে তুলবেন। পুরুষজাতের ত এই কাজ! নয় কি?

তারপর তিনি খুশী মনে বকবক করে বকে যেতে লাগলেন শিকারের কথা আর পাখির অভাব ও শীতকালে হাঁস মেলার সুযোগ সম্বন্ধে। ফ্র্যামটনের কাছে এসব প্রসঙ্গ একেবারে বিশ্রী শোনাল। তিনি এর চেয়ে কম ভয়ংকর বিষয়ে আলোচনা ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, অতিথির দিকে গৃহকর্ত্রীর মন মাত্র আংশিকভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। তাঁর চোখের দৃষ্টি সব সময়েই কিন্তু খোলা জানালা আর বাইরের উঠোনের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকের এই মর্মান্তিক বার্ষিকীর দিনে মিসেস স্যাপলটন-এর সঙ্গে তাঁর দেখা করতে আসাটা নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজনক যোগাযোগ! বহু লোকের মত ফ্র্যামটন-এরও মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের অসুখবিসুখ ও রোগ যন্ত্রণার খুঁটিনাটি,—অসুখের কারণ এবং চিকিৎসা-পদ্ধতির গল্প শুনতে পরিচিত, এমন-কি সম্পূর্ণ অপরিচিত অথবা আকস্মিকভাবে কিছু-পরিচিত লোকও—ভালবাসেন। এই বিশ্বাসের বশে তিনি ঘোষণার স্বরে বলতে লাগলেন, ডাক্তারেরা সকলেই একমত হয়ে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

আমি যেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিই আর কঠোর দৈহিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলি। পথ্যের বিষয়ে অবশ্য তাঁরা তেমন একমত হতে পারেন নি।

—তাই নাকি ?

মিসেস স্যাপলটন এমন স্বরে উত্তর দিলেন, যার শেষ মুহূর্তের পরিণতি হচ্ছে হাই তোলা।

তারপর হঠাৎ তিনি বেশ খুশিভরে যেন সতর্ক ও ব্যগ্র হয়ে উঠলেন,—অবশ্য ফ্র্যামটন যে আলোচনা করছিলেন সে প্রসঙ্গে নয়!

তিনি চিৎকার করে বললেন, এই যে, ওরা এসে গেছে! ঠিক চায়ের সময়ে। আচ্ছা, ওদের চেহারা দেখলে মনে হয় না, ওরা যেন চোখের কোল পর্যন্ত কাদা-মাখা ?

ফ্র্যামটন একটু কেঁপে উঠলেন। সহানুভূতি প্রকাশের ইচ্ছাভরা দৃষ্টিতে বোনঝির দিকে চোখ ফেরালেন। আতঙ্কে হতবুদ্ধি চোখ দুটি দিয়ে বোনঝি তখন খোলা জানালার পারে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। একটা কি যেন অজানা ভয়ের হাড়-কাঁপানো বিহ্বলতায় ফ্র্যামটন তাঁর আসনে ঘুরে বসে চোখ তুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলেন।

সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছায়ায় তিনটি মূর্তি লন পার হয়ে জানালার দিকে হেঁটে আসছিলেন। তাঁদের সকলের হাতে ছিল বন্দুক। তাঁদের মধ্যে একজনের গলায় ঝুলছিল সাদা কোট। একটি ক্লান্ত বাদামী রঙের স্প্যানিয়েল কুকুর তাঁদের পা ঘেঁসে ঘেঁসে আসছিল। মূর্তিগুলি নিঃশব্দে বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লেন। তারপর একজন তরুণ ধরা গলায় অন্ধকারের মধ্যে গান গেয়ে উঠলেন, 'বারটি, তুমি কেন বারণ কর ?'

ফ্র্যামটন হঠাৎ পাগলের মত তাঁর ছড়ি ও টুপি সজোরে আঁকড়ে ধরলেন। তারপর ?—তারপর একে একে টুকরো পাথর-বিছানো পথ, সামনের গেট প্রভৃতি আবছায়া-ভরা ধাপে ধাপে হঠকারী লোকের মত তাঁর পশ্চাদপসারণ ঘটল। রাস্তা দিয়ে একজন সাইকেল-আরোহী গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন, আসন্ন সংকট বাঁচাবার জন্যে তাঁকে পাশের বেড়ার ওপর পড়ে ধাক্কা খেতে হল।

জানালা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সাদা ম্যাকিনটোশ-ধারী লোকটি বললেন, এই ত এসে হাজির হলুম গো, গিন্নী। আমাদের হাত পা কাদা-মাখামাখি বটে, তবে অনেক জায়গায় তা শুকিয়ে এসেছে। আচ্ছা, আমরা যখন বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিলুম, তখন যে লোকটি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন উনি কে বটে ?

মিসেস স্ট্যাপলটন জবাব দিলেন, খুব অদ্ভুত এক ভদ্রলোক। নাম মিঃ নাটেল। উনি শুধু নিজের অসুখের গল্পই করতে জানেন। তোমাদের আসতে দেখে হঠাৎ বিদায় না নিয়েই পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেলেন!

বোনঝি তখন শান্তভাবে গম্ভীর সুরে বললেন, আমার কি মনে হচ্ছে জান? ওই কুকুরটাই এর কারণ। লোকটি আমার কাছে গল্প করেছিলেন, কুকুর দেখলে তাঁর ভয়ংকর ভয় হয়। তিনি নাকি একবার কতকগুলো নেড়ী কুত্তার তাড়া খেয়ে গঙ্গার তীরে এক জায়গায় একটি কবরখানায় ঢুকে পড়তে বাধ্য হন। তারপর একটি নতুন-খোঁড়া কবরের গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সারা রাত তাঁকে কাটাতে হয়। কুত্তাগুলো তখন ঠিক মাথার ওপর জড় হয়ে মুখ খিঁচিয়ে ফেনা ফেলতে ফেলতে ভয়ংকর ডাক ডাকছিল। যে-কোন লোকের স্নায়ু-দৌর্বল্য অসুখ ঘটাতে এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়?

অল্প সময়ের মধ্যে রোমান্স-মূলক কল্পিতকাহিনী রচনায় বোনঝির ছিল বিশেষ দক্ষতা।

॥ মরুর দেশে মোহিনী মায়া ॥

॥ অনরা গু বালজাক-এর লেখা ॥

[অনরা গু বালজাক শুধু ফরাসী সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে গেছেন —সংখ্যায় তারা যেমন বহুসংখ্যক, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও বহু-বিচিত্র।

তাঁর বাবা জন্মেছিলেন গ্রামের কৃষক-পরিবারে। কিন্তু তাঁর বুকে ছিল উদগ্র উচ্চাশা। বয়স হলে দেশের রাজধানী প্যারিস শহরে এসে তিনি বাসা বাঁধেন, নানাভাবে উপার্জনের চেষ্টা করে বিত্তশালী হয়ে ওঠেন।

বালজাকের জন্ম তারিখ ২০ মে, ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ। বাবার মত বালজাকের দেহে ছিল সুস্বাস্থ্য, মনে ছিল অদম্য শক্তি। জীবনে তিনি চেয়েছিলেন প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে। কিন্তু তাঁর মনের গভীরতর আগ্রহ ছিল ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক হতে। বড় সাহিত্যিক হবার জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে গেছেন। প্রতিদিন রাত বারটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত এক আসনে বসে সাহিত্য রচনা করতেন। এই ছিল তাঁর সাধারণ অভ্যাস। একখানা বই লেখা শেষ হলে কয়েকদিন লেখা বন্ধ রেখে বাইরে আমোদ-প্রমোদ, মেলামেশা করতেন। তারপর আবার নতুন কোন লেখায় মন দিতেন।

তাঁর জীবন ছিল নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অদৃষ্টের ওঠানামা, বহু নর-নারীর সংস্পর্শ ও সংঘাতে সমৃদ্ধ। তিনি আপন জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে ফরাসী সাহিত্যে বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন।

"মরুর দেশে মোহিনী মায়া" তাঁর একটি বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্প। ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে এর নাম হয়েছে "A Passion in the Desert"। এই গল্পের বিষয়বস্তু বড় বিস্ময়কর। কাহিনীর মূলে আছে একজন মরুভূমির মধ্যে পথ-হারা ফরাসী সৈনিকের সঙ্গে এক কিশোরী বাঘিনীর প্রণয়। কথাশিল্পী গল্প বলতে বলতে এক জায়গায় লিখেছেন :

"যখন সময় হল ফরাসী সৈনিক গুহা থেকে নিঃশব্দে বার হয়ে খুব জোর কদমে নীল নদের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু বালুর বুকের ওপর দিয়ে মাত্র সিকি মাইল যেতে না যেতেই বুঝতে পারলেন, বাঘিনী তাঁর পিছনে পিছনে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে; সঙ্গে-সঙ্গে করাতের কলের শব্দের মত মাঝে মাঝে ডাক ডাকছে। সে ডাকের আওয়াজ লাফানোর ধুপধাপ শব্দের চেয়েও ভয়ংকর। * * * * সৈনিক নিজের মনে বলে উঠলেন, বেশ, বেশ, নিশ্চয়ই আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে। এর আগে কারোর সঙ্গে হয়ত তোমার ভালবাসার সম্পর্ক হয় নি। ভাবতে অবশ্য খুব ভাল লাগে, আমিই তোমার প্রথম।"

কথাশিল্পী এখানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাঘিনী বয়স এবং যৌন-অভিজ্ঞতার দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ কিশোরী। এর আগে সে নিজের জাতের কোন পুরুষ-সংসর্গ পায় নি বলেই তার পশু-হৃদয়ে সদ্য-উন্মেষিত হয়েছিল সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, স্থূলতাহীন প্রণয়ের আকুতি। মানুষ-সৈনিকের সঙ্গ লাভ করে নিঃসঙ্কোচে তা সজাগ হয়ে উঠল। সূক্ষ্ম কলাকৌশলের অধিকারী বালজাক অপূর্ব রসাত্মক রেখায় রেখায় এঁকেছেন এই পশু ও মানুষের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়ার মোহিনী ছবি।

মানুষ ও পশুর মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা এবং প্রণয়কে ভিত্তি করে বিশ্বের বিচিত্র দেশের-সাহিত্যে বেশী কাহিনী রচিত হয় নি। তবু এই সুকঠিন কাজটি আমাদের সাহিত্যিকরা যে একেবারে বর্জন করে চলেন নি, এটাই মানুষের শিল্প-প্রতিভার পরম পরিচয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের আঁকা মহেশ ও গফুরকে নিয়ে বাৎসল্যের রসাত্মক চিত্রটি।

বালজাকের মৃত্যু হয় ১৭ অগাস্ট, ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে।]

—কি ভয়ংকর দৃশ্য!

মঃ মারটিনের প্রদর্শনী থেকে বাইরে এসে মহিলাটি চিৎকার করে উঠলেন। তিনি এইমাত্র খাঁচার মধ্যে হায়নাকে নিয়ে ওই দুঃসাহসী খেলোয়াড়ের খেলা দেখছিলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, উনি কি কৌশলে এই হিংস্র জানোয়ারদের এমনভাবে পোষ মানাতে পেরেছেন যে, ওদের ভালবাসা সম্বন্ধে একেবারে নির্ভয়! আশ্চর্য!

আমি তাঁর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে উত্তর দিলুম, আপনি যা একটা সমস্যা বলে মনে করছেন, আসলে তা একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

তিনি অবিশ্বাসের একফালি হাসি হেসে বললেন, তাই নাকি ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম. তাহলে আপনি কি মনে করেন, জন্তু-জানোয়ারদের বুকে কোন রাগ-অনুরাগ নেই। জেনে রাখুন যে, সভ্যজীবনের যত কিছু গুণ সবই ওদের শেখানো যায়।

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বলে চললুম, আমি যখন প্রথম মঃ মারটিনের খেলা দেখি, তখন ঠিক আপনার মতই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলুম। সে সময়ে দৈবক্রমে একজন বুড়ো সৈনিকের পাশে দাঁড়িয়েছিলুম, তাঁর ডান পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে প্রদর্শনীতে ঢুকেছিলুম। তাঁর চেহারা দেখে প্রথমে চমকে উঠি। তিনি ছিলেন যুদ্ধ-বৃত্তির ছাপ-মারা একজন সাহসী পুরুষ, যাঁর কপালের রেখায় রেখায় লেখা ছিল নেপোলিয়নের যত যুদ্ধের ইতিহাস। এই বুড়ো লোকটির মধ্যে এমন একটা প্রাণখোলা সরলতা আর হাসিখুশি ভাব ছিল! এই গুণ-গুলোকে সব সময়ে ভালবাসি। নিঃসন্দেহ, তিনি ছিলেন একজন পুরোতন জাতের সিপাই, যিনি কোন কিছুতে ভয় পান না; যিনি একজন সঙ্গার বুকে মরণের শ্বাস উঠছে দেখে সেই দৃশ্যের মধ্যে হাসির খোরাক খুঁজে পান; যিনি হাসতে হাসতে সেই সঙ্গীকে কবর দিতে বা ওর যথাসর্বস্ব লুঠ করতে পারেন; যিনি গোলাগুলির আক্রমণের মধ্যে অটল থাকতে পারেন এবং শয়তানের সঙ্গে মেলামেশা করতেও বিচলিত হন না। মঃ মারটিন যখন হায়নার খাঁচা থেকে বার হয়ে আসছিলেন, লোকটি তাঁর দিকে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর ঠোঁটে ভেসে উঠল একটা তাচ্ছিল্যের ভাব।

আমি মঃ মারটিনের সাহস দেখে প্রশংসায় চেঁচিয়ে উঠলুম; তিনি হেসে ফেলে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে নাড়তে মন্তব্য করলেন, ও-সব রহস্য আমার জানা আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, এর মানে? ভেতরের রহস্যটা কি—যদি একটু খুলে আমায় বলতে পারেন; তাহলে খুব বাধিত হব।

কয়েক মিনিটের কথাবার্তার ফলে আমাদের বন্ধুত্ব জমে উঠল। পথে নেমে প্রথম যে রেস্টুরেণ্ট দেখতে পেলুম, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে খেতে বসলুম। খাওয়ার শেষ পর্বে এক বোতল শ্যামপেন পানের গুণে অদ্ভুত বুড়ো মানুষটির

স্মৃতিশক্তি বেশ ভালভাবেই জেগে উঠল। তিনি তাঁর গল্প বললেন। আমি বুঝতে পারলুম, 'ও সব রহস্য আমার জানা আছে' যখন তিনি বলেছিলেন, তখন সত্যি কথাই বলেছিলেন।

বাড়ি ফিরে এসে আমার বান্ধবী আবদারের সুরে এমন পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, আমি সৈনিক মানুষটির স্মৃতিকথা তাঁর জন্যে লিখে ফেলতে রাজী হলুম।

পরের দিন তিনি সেই লেখা হাতে পেলেন। একে বলা যেতে পারে, কোন মহাকাব্যের যেন এক খণ্ডকাহিনী আর মহাকাব্যটির নামকরণ করা যেতে পারে "মিশরে ফরাসীজাতির আগমন"।

মিশর দেশের উত্তর খণ্ডে জেনারেল ডেসায়েক্স-এর অধীনে অভিযানকালে একজন প্রোভেনস্যাল অঞ্চলের ফরাসী সৈনিক 'মগ্রাবিন'দের হাতে বন্দী হন। এই আরবীয় দস্যুরা তাঁকে নীলনদের গতিপথ থেকে অনেক দূরে মরুভূমির মধ্যে নিয়ে যায়। ফরাসী-বাহিনী আর ওদের মধ্যে নিরাপত্তামূলক দূরত্ব রক্ষা করার উদ্দেশে মগ্রাবিনরা সারাদিন খুব জোর কদমে পথ অতিক্রম করে রাত্রে একটি কুয়োর ধারে পৌঁছে তাঁবু ফেলে। চারিদিকে ছিল খেজুর গাছের সারি। এখানে আগে থেকে ওরা কিছু খাদ্যদ্রব্য গোপনে পুঁতে রেখে গেছল। এদিকে ওদের বন্দী যে পালাবার মতলব করতে পারে, সেকথা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাই ওরা তাঁর হাত দুটি শুধু বেঁধে আর নিজেদের ঘোড়াগুলোকে খাবার দেবার পর কয়েকটি করে খেজুর খেয়ে শুয়ে পড়েছিল।

ফরাসী সৈনিক যখন বুঝতে পারলেন যে, ঘুমন্ত শত্রুরা পাহারার কাজে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তখন তিনি দাঁত দিয়ে একখানা ধারালো অস্ত্র তুলে নিলেন। তারপর তা দুই হাঁটুর মধ্যে রেখে হাতবাঁধা দড়িটাকে কেটে ফেলে মুক্ত হলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটুও দেরি না করে আত্মরক্ষার্থে একটা ছোট বন্দুক এবং একখানা ছোরা হাতে তুলে নিলেন। সঙ্গে আরো রইল ভবিষ্যতের সংস্থান হিসাবে কিছু শুকনো খেজুর, ছোট এক থলি বার্লি এবং কিছু বারুদ ও গুলি। তারপর কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে শত্রুদেরই একটি ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে এগিয়ে চললেন সেইদিকে—তাঁর অনুমান অনুযায়ী যেদিকে গেলে ফরাসী বাহিনীর নিশ্চয়ই দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু রাতের শিবির ছেড়ে যাবার আগে যাতে সেনাবাহিনীর কাছে পৌছতে পারেন—সেই ভাবনায় অধীর হয়ে ভীষণ জোরে ক্লান্ত ঘোড়াটাকে ছোটাতে লাগলেন। ফলে, তাঁর জুতোর নালের

আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বেচারা ঘোড়াটি মাঝপথে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল। মরুভূমির মধ্যিখানে ফরাসী সৈনিকটি তখন নিতান্ত একা হয়ে পড়লেন। জেল-ভাঙা কয়েদীর মরিয়া দুঃসাহস বুকে নিয়ে মরুবালুর ওপর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর হঠাৎ তাঁকে থেমে পড়তে হল। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। পূর্বদেশের রাত্রিবেলা যদিও মনোরম তবু তাঁর এগিয়ে যাবার শক্তি আর ছিল না। ভাগ্যক্রমে তিনি একটি উঁচু ঢিবির ওপর এসে পৌঁছেছিলেন। এর চূড়োয় ছিল কয়েকটি খেজুর গাছ।

তা দেখে তাঁর বুকে নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হল। তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, বিছানার আকারের একখণ্ড গ্রানাইট পাথরের ওপর শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমের অবস্থায় কোন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করেই ঘুমুতে লাগলেন।

সূর্য উঠলে তাঁর ঘুম ভাঙল। রোদের খাড়া রেখাগুলো গ্রানাইট পাথরের ওপর পড়ে অসহ্য উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল। তিনি ভুল করে খেজুর গাছগুলির পাতা-ভরতি মাথার ছায়া স্বভাবতঃ যেদিকে পড়ে, তার উলটো দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন। সেই নিঃসঙ্গ গাছগুলির দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠল। তিনি এক এক করে গুনে দেখলেন, মাত্র সামান্য কয়েকটি গাছ। তারপর চারিদিকে চোখ ফেলে তাকালেন। তাঁর অন্তরাত্মা ঘোর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন, এ যেন এক সীমাহীন সমুদ্র! চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু বিষাদ জাগানো বালুরাশি খর রোদে ইস্পাতের ফলার মত ঝকমক করছে। তিনি বুঝতেই পারছিলেন না, আয়নার মত জ্বলজ্বলে সারি-সারি হ্রদ, না, এক বিরাট সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। আগুন-ভরা কুয়াশাজাল যেন কাঁপনের ছোট-ছোট ঢেউ তুলে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশের বুকে রয়েছে এক পূর্ব-দেশের তপ্ত, খর আলো, যার চাকচিক্যে মনে জাগে শুধু হতাশা। কারণ, কোন কিছু পাবার আগ্রহ ত থাকে না। মাথার ওপরে বা পায়ের নীচে সর্বত্র যেন একই ভাবে আগুন জ্বলছে। চরম নিঃশব্দতা ভয়াল মহিমায় ভয়ংকর। চারিদিক থেকে অনন্ত বিরাটের অনুভূতি মনপ্রাণ অভিভূত করে তুলছে। আকাশে একখণ্ড মেঘ নেই, বাতাসে নেই তিলমাত্র চঞ্চলতা, ঢেউ-খেলানো বালুরাশির বুকে নেই কোন গতি। বহুদূরে দিকচক্রবাল এক সংকীর্ণ অথচ উজ্জ্বল আলোকরেখায় চিহ্নিত—যেন একখানি বাঁকা তরবারি! গ্রীষ্মের দিনে সাগর পারের দিগন্তে থাকে এমনতর রেখা।

ফরাসী সৈনিক একটি খেজুর গাছকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন—এ যেন কোন

বন্ধুর দেহ। তারপর লম্বা রেখার-মত-পড়া সোজা একফালি ছায়ার তলায় গ্রানাইট পাথরের ওপর বসে পড়লেন। চোখের সামনে দূর-বিস্তৃত, নির্জন প্রান্তরের দিকে গভীর আতঙ্কে তাকাতে তাকাতে ফোঁপাতে লাগলেন। শেষে সেই দুঃসহ নির্জনতাকে ধ্যান ভাঙায় প্রলুব্ধ করার উদ্দেশে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর আকাশের শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে গিয়ে দূর-দিগন্তে এমন একটা ক্ষীণ ধ্বনিতে পরিণত হল যে, তা থেকে বাইরে কোন প্রতিধ্বনি জাগল না। প্রতিধ্বনি জাগল তাঁর নিজের বুকে।

তিনি ছিলেন ফরাসীদেশের প্রোভেন্স অঞ্চলের লোক। বয়স বাইশ বছর। তিনি বন্দুকে বারুদ ভরে রাখলেন।

—একে ব্যবহার করার সময় অবশ্য এখনো আসেনি। দেরি আছে।

তিনি বারুদভরা বন্দুকটি মাটির ওপর রেখে কথাগুলো নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন।

ফিরে-ফিবে বারবার বিষাদে-ভরা মরুপ্রান্তর আর মাথার ওপর নীল আকাশের বিবাট বিস্তৃতির দিকে তাকাতে তাকাতে তাঁর মনে ভেসে উঠতে লাগল স্বদেশের কথা। কল্পনায় বোধ হল, নাকে আসছে প্যারিস নগরের পথের পাশে নালাগুলির গন্ধ। যে-সব শহব পার হয়ে এসেছিলেন, তাদের ছবি, সহকর্মীদের স্মৃতি, জীবনের সহস্র ছোট ছোট ঘটনার কথা একে একে স্মরণে উদয় হল।

তারপর মরুর বুকের তপ্ত হাওয়ার স্পর্শে দক্ষিণ ফ্রান্সের বিখ্যাত কল্পনা-প্রবণতা জাগিয়ে তুললে প্রিয় জন্মভূমি প্রোভেন্সের পথের নুড়িগুলির স্মৃতি।

নিষ্ঠুর মরীচিকার যতকিছু বিপদের দুশ্চিন্তা থাকা সত্ত্বেও তিনি গত রাত্রে যে-দিক থেকে পাহাড়ে উঠে এসেছিলেন, তার উলটো দিকে নামতে আরম্ভ করলেন। যেতে যেতে একটা নকল গুহা আবিষ্কার করলেন, তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। পাহাড়তলির বড়বড় পাথরখণ্ড কেটে গুহাটি তৈরী করা হয়েছিল। একপাশে একটা ছেঁড়া মাদুর পড়েছিল। তা থেকে বুঝতে পারলেন, আগে কোন একদিন কোন লোক গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। কয়েক পা দূরে কয়েকটা খেজুর গাছ দেখা গেল। গাছগুলোয় প্রচুর খেজুর ফলেছিল। বাঁচবার ইচ্ছে—যা হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তা আবার তাঁর অন্তরে নতুন করে জেগে উঠল। তাঁর আশা হল, কোন মরুবাসী মগ্রাবিন এ পথে দৈবাৎ এসে পড়া পর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। অথবা ফরাসী সেনাদলের কামান গর্জন হয়ত অনতিবিলম্বে

শুনতে পাওয়া যাবে। কারণ, এ সময়ে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী ত মিশরদেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই ভাবনার ফলে তিনি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেলেন। ফলের ভারে নুয়ে-পড়া খেজুরগাছগুলি থেকে পাকা খেজুরের কয়েকটি গুচ্ছ কেটে ফেললেন। অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া এই অমৃত ফলগুলি খেতে বেশ সুস্বাদু ছিল। গুহার আগেকার বাসিন্দা নিশ্চয়ই গাছগুলি লাগিয়েছিলেন। তাজা, মিষ্টি, সুস্বাদু শাঁস থেকে বুঝতে পারা যায়, গাছগুলির প্রতি তাঁর কত না যত্ন ছিল।

গভীর হতাশার বদলে হঠাৎ খুশির উন্মাদনায় ফরাসী সেনার বুক ভরে গেল। তিনি পুনরায় পাহাড়ের ওপর-অংশে উঠলেন। গতরাত্রে যে নিষ্ফলা খেজুর গাছের তলায় শুয়েছিলেন, সেটি কাটতে কাটতে দিনের বাকিটুকু শেষ হয়ে গেল।

একটা ক্ষীণ স্মৃতি থেকে মরুর বন্য জানোয়ারদের কথা তাঁর মনে পড়ল। পাহাড়গুলোর মধ্যে বালুর ওপর দিয়ে যে ঝরনাটি বুকে বুদ্বুদ তুলে বয়ে চলেছে, রাতের বেলা জানোয়ারেরা জলের খোঁজে সেখানে আসতে পারে—এই ভেবে তিনি ঠিক করলেন, জানোয়ারদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হবার উদ্দেশে গুহাতে ঢোকবার মুখ কিছু-একটা দিয়ে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে জানোয়ারের পেটে পড়ার আতঙ্কে প্রাণপণ পরিশ্রম করেও একদিনের মধ্যে খেজুর গাছটা প্রয়োজনমত খণ্ডখণ্ড করার কাজ শেষ হল না। তবে যাহোক করে শেষ পর্যন্ত গুঁড়ি কেটে মাটির ওপর ফেলা গেল। সন্ধ্যের সময় যখন সেই মরুর বুকের বৃক্ষরাজ মাটির ওপর শুয়ে পড়লেন, তখন তার মহাপতনের বজ্রনাদ দূরে—বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। মনে হল, সে যেন বিরাট স্তব্ধতার বুকভাঙা বিলাপের ধ্বনি। এ যে আসন্ন বিপদের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী। এই ভেবে সৈনিক আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন।

ইতিমধ্যে তিনি কাটা গাছের লম্বা, চওড়া ও সবুজ পাতাগুলি ছিঁড়ে এনে ছেঁড়া মাদুরের সঙ্গে বিছিয়ে তাঁর বিছানা মেরামত করে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে দিনের বেলার উত্তাপে এবং কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে অন্ধকার গুহার লাল ছাদের নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝ রাতে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসলেন। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে শুনতে পেলেন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। এ যে প্রবল শ্বাস-প্রশ্বাস! মনে হয় না, কোন মানুষের এই শ্বাস-প্রশ্বাস। একে গভীর অন্ধকার এবং নিবিড় নিঃশব্দতা, তার ওপর হঠাৎ-জাগা অবস্থায় কল্পনার খেয়াল—

সবকিছুর প্রভাবে ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জমে উঠল। তাঁর বোধ হল, মাথার খুলি যেন কুঁচকে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর চোখের তারা দুটি বড় হয়ে উঠছে। তিনি আবছায়ার মধ্যে দুটি অস্পষ্ট, হলদে রঙের আলো দেখতে পেলেন। প্রথমে ভাবলেন, এ বুঝি বা তাঁর নিজের চোখের তারা দুটির প্রতিবিম্ব। কিন্তু মরুভূমির রাতের স্বচ্ছ আলোয় ক্রমে গুহার ভেতরের জিনিসগুলি একে একে পরিষ্কার হয়ে ওঠার ফলে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, মাত্র কয়েক পা দূরে শুয়ে আছে এক বিরাট জানোয়ার।

ওটা কি সিংহ? না, বাঘ? না, কুমীর? শত্রু যে কোন্ জাতের—তা বোঝার সম্যক জ্ঞান প্রোভেন্সবাসী লোকটির ছিল না। সেই জন্যই হয়ত তাঁর আতঙ্ক বেড়ে গেল। অজ্ঞানতা কল্পনাকে খুঁচিয়ে তুললে; একটুও নড়াচড়া না করে প্রাণীটার ভয়ংকর শ্বাসপ্রশ্বাসের খেয়ালিপনাটা লক্ষ করতে করতে মনের মধ্যে অসহ্য পীড়নের নিষ্ঠুরতার চাপ নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। শিয়ালের গায়ের বোটকা গন্ধের চেয়েও তীব্র গন্ধে গুহা ভরে গেছল। এ গন্ধ প্রতিবার তাঁর নাকে ঢোকামাত্র তাঁর আতঙ্ক চরমে উঠছিল। এক ভয়াল মরু-বন্ধুর রাজকীয় আবাসের মধ্যে যে তিনি রাত্রিবাস করছেন—সে বিষয়ে আর তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। কিছুক্ষণ পরে অস্তগামী চাঁদ আকাশের প্রান্তে নেমে পড়ায় গুহার ভেতর চারিদিক আলোময় হয়ে গেল। ক্রমে সেই জ্যোৎস্নার ঝলমলের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা চিতাবাঘের গায়ের গোলগোল যত দাগ।

মিশরের পশুরাজ একটা বিরাট-আকার কুকুরের মত ঘুমুচ্ছিল। একবার ওর চোখদুটি মুহূর্তের জন্য খুলে আবার বন্ধ করে দিয়েছিল। ওর মুখ ফেরানো ছিল ফরাসী সৈনিকের দিকে।

এদিকে বাঘের বন্দ.র মনে সহস্র দুঃশ্চিন্তা খেলে গেল। প্রথমে ভাবলেন, গুলি চালাবেন। কিন্তু বন্দুক তাক করবার মত তাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা ছিল না। আর এ কাজ করতে গেলে যদি জানোয়ারটা জেগে ওঠে!—তাহলে! এইসব অনুমান করে তিনি নিশ্চল, নিথর হয়ে শুয়েছিলেন। সেই নিঃশব্দতার মধ্যে নিজের বুকের ধুকধুকুনি শুনতে শুনতে তিনি নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন; আর ভয় করছিলেন, কখন হয়ত হঠাৎ জানোয়ারটার ঘুম ভেঙে যায়! ইতিমধ্যে দু-দুবার তাঁর তরবারির ওপর হাত রাখলেন; ইচ্ছে হয়েছিল, শত্রুর মাথাটা কেটে ফেলবেন। কিন্তু ছোট-ছোট শক্ত লোমগুলির মধ্যে দিয়ে তরবারি বসানো বেশ কঠিন কাজ—এই কথা মনে পড়ায় শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা

ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তরবারি বসানোর চেষ্টায় অকৃতকার্য হওয়া মানে ত নিশ্চিত মৃত্যু!

শেষ পর্যন্ত তিনি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করাই পছন্দ করলেন। তারপর সংকল্পে অটল হয়ে ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে বেশী দেরি হল না। এতক্ষণে তাঁর পক্ষে জানোয়ারটাকে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হল। ওর মুখ আর নাকে রক্ত লেগেছিল।

তিনি ভাবলেন, খাওয়াটা কাল খুব জবর হয়েছে, দেখছি। অন্ততঃ ঘুম ভাঙলেই খিদে পাবে না। খাদ্যটা নরমাংস ছিল কিনা—সে চিন্তা তাঁর মনে জাগল না।

জানোয়ারটা ছিল বাঘ নয়—বাঘিনী! ওর বুকের এবং উরুর ওপর চকচক করছিল সাদা, রেশমী লোম। পায়ের নীচের দিকে ছোট ছোট, মখমল-কোমল ছাপ গোলগোল অলংকারের মত চমৎকার দেখাচ্ছিল। সুপুষ্ট লেজটিতে সাদা রঙের ওপর ছিল বালার মত গোলগোল যত কাল দাগ। দেহের ওপর ভাগের চামড়া ছিল পুরাতন সোনার মত হলদে রঙের,—বেশ নরম আর মসৃণ; তার ওপর গোলাপ ফুলের আকারের ছাপের পর ছাপ। এই ছাপ কেবল এই জাতের বাঘেদের গায়েই দেখা যায়। এই ভয়ংকরী আগন্তুকটি তখন খুব শান্তভাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। ভঙ্গীটা যেন গদি-আঁটা, নরম সোফার কোলে ঘুমিয়ে পড়া বিড়ালছানার মত। তার মাংসল রক্তমাখা থাবা আর জোরালো নখগুলো মাথা ছাড়িয়ে বিছানো ছিল, আর সেই থাবাগুলোর ওপর ওর মাথাটি রাখা ছিল। ওর সরু, খাড়া-খাড়া গোঁফ-গুলি দেখতে যেন রূপোর তারের মত উজ্জ্বল।

সৈনিক বাঘিনার দেহশ্রী এবং বিচিত্র-রঙের বৈষম্যে-সৃষ্টি-করা দেহসজ্জার রাজকীয় আড়ম্বরের প্রশংসা নিশ্চয়ই করতেন—যদি অবশ্য বাঘিনী খাঁচার মধ্যে-বন্দী অবস্থায় থাকত। কিন্তু এই মুহূর্তে বাঘিনার ভয়ংকর দিকটার আতঙ্কেই তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। প্রবাদ আছে, অজগর সাপের দৃষ্টির সামনে পাপিয়া পাখি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বাঘিনীর উপস্থিতি এমন-কি ঘুমন্ত অবস্থাতেও তেমনি তাঁকে মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন করেছিল।

এই বিপদের মধ্যে সৈনিকের সাহসিকতা দুর্বল হয়ে পড়ছিল,—যদিও কামানের গোলার সামনে তা নিঃসন্দেহে সতেজ হয়ে উঠত। যাহোক, একটি বে-পরোয়া ভাবনায় তাঁর মন ভরে উঠল। আর তাঁর কপাল দিয়ে যে ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছিল, তার উৎস শুকিয়ে পড়ল। চরম বিপদের সময় মানুষেরা যেমন অদৃষ্টের

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ সর্বনাশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্নায়ুকে সতেজ করে তোলে, তিনিও তেমনি এই ব্যাপারের শেষ পরিণতি যে দুঃখ-জর্জর হবে—তা বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত আত্ম-সম্মানের সঙ্গে নিজের কর্তব্য করে যেতে সংকল্প করলেন।

এইভাবে তর্ক করে নিজের মনকে বোঝালেন, দুদিন আগে ত আরব-দেশীয়েরা আমাকে হত্যাই করে ফেলত!

তাঁর যেন মৃত্যু ঘটে গেছে—এই ভেবে তিনি অশান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে অথচ দুঃসাহস ভরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন না-জানি শত্রু জেগে ওঠে!

যখন সূর্য আকাশে বেশ ভালভাবে উঠে গেছে, বাঘিনীর ঘুম ভাঙল, ও চোখ খুললে; যেন দেহের আড়ষ্টতা ভাঙবার জন্য ওর থাবাগুলো খুব জোরের সঙ্গে মেলে ধরলে। এরপর হাই তুললে। দেখা গেল, ওর ভয়াল দাঁতের পাটি আর খাঁজ-কাটা, তীক্ষ্ণ জিব।

—আঃ, বাঘিনী দেখছি একটি সুশ্রী মেয়ে!

ফরাসী সৈনিক ওকে প্রণয়ের ভান-করা অথচ শান্ত ভঙ্গীতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখে এই কথা ভাবলেন।

ওর মুখে এবং থাবায় যে রক্তের দাগ লেগেছিল, তা বাঘিনী চেটে-চেটে মুছে ফেললে। এরপর বেশ আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে মাথা ঘষতে লাগল।

—এই ত চাই! নিজেকে একটু ঘষে মেজে সুন্দরী করে নাও।

তিনি বাঘিনীর উদ্দেশে বলে উঠলেন। সাহস ফিরে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে জেগে উঠেছিল আমোদ-প্রিয়তা। তিনি রঙ্গভরে আরো বললেন, এবার আমরা পরস্পরকে 'সুপ্রভাত' জানাব, কি বল?

সঙ্গে-সঙ্গে তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন—যে ছোট ছোরাখানি 'মগ্রাবিন'দের কাছ থেকে চুরি করে এনেছিলেন।

এই সময়ে বাঘিনী মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল,—এগিয়ে এল না। সেই দৃষ্টির একাগ্রতা ও দুঃসহ ঔজ্জ্বল্যের তেজ দেখে তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

ক্রমে জন্তুটি তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলে। তিনি ওর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ওকে যেন মোহাবিষ্ট করার চেষ্টা করছেন—এইভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বাঘিনীকে নিজের খুব কাছে আসতে দিলেন। ক্রমে স্নেহভরা, সযত্ন ভঙ্গীতে ওর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সারা অঙ্গে হাত

বুলোতে লাগলেন। বাঘিনীর হলদে পিঠের মাঝখানে ওর নরম মেরুদণ্ড নিজের নখ দিয়ে আঁচড়ে দিতে লাগলেন। জন্তুটি সুখের আবেশে ওর লেজ নাড়তে লাগল। ওর চোখ দুটি আবেগে কোমল হয়ে এল। যখন ফরাসী সৈনিক এক এক করে তিনবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ওর মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করলেন, তখন জন্তুটি বিড়ালের মত গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগল। এই গলার শব্দ এত গম্ভীর ও জোরালো যে, গির্জার অর্গানের আওয়াজের মত সারা গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আদর করার সুফল যে ফলেছে—সৈনিক সে কথা বুঝতে পেরে দ্বিগুণ উৎসাহে তা পুনরায় করতে লাগলেন। শেষকালে মহীয়সী সুন্দরী সুখের আবেশে সম্পূর্ণরূপে শান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

যখন তিনি নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পারলেন যে, ভয়াল, খেয়ালী সঙ্গিনীটি নিখুঁতভাবে বশীভূত হয়েছে এবং গত রাত্রের নিষ্ঠুর প্রাণিহত্যার ফলে ওর ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়ে রয়েছে, তখন তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে পড়লেন। বাঘিনী তাকে যেতে দিলে। কিন্তু যখন পাহাড়ের ওপরে এসে পৌঁছেছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ও চড়ুই পাখির ডালে ডালে লাফানোর মত হালকা ভাবে লাফাতে লাফাতে এসে তাঁর পায়ে গা ঘষতে লাগল আর বিড়ালের মত পিঠ ফুলিয়ে তুললে। তারপর অতিথির দিকে ওর উজ্জ্বল চোখের পলকহীন দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থেকে এমন এক বিরাট চিৎকার করে উঠল, যা পশুবিজ্ঞানীরা করাতের আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

ফরাসী সৈনিক একফালি হেসে বলে উঠলেন, আমার সুন্দরী দেখছি, পাওনা-গণ্ডা বেশ জোরের সঙ্গেই আদায় করতে জানে!

এরপর তিনি কখন-বা ওর কান নিয়ে খেলা, কখন-বা সারা অঙ্গে হাত বুলানো, আবার কখন-বা হাতের নখ দিয়ে জোরসে ওর মাথা আঁচড়াতে শুরু করলেন। ক্রমে নিজের সাফল্য দেখে আরও সাহসী হয়ে উঠলেন, ছোরার ডগা দিয়ে বাঘিনীর মাথার খুলির ওপরে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন। এই সময় আঘাত করবার মত ঠিক উপযুক্ত জায়গাটিও সন্ধান করতে ছাড়লেন না। কিন্তু খুলির হাড় এত শক্ত যে, ছোরা বসিয়ে সফল হবার মত সম্ভাবনা খুব কম; শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে ভয় জাগল।

কিছুক্ষণ পরে মরুরাজ্যের সুলতানা ওর ক্রীতদাসের কাজকর্মের অনুমোদনে নিজের ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর পানে মাথা তুলে ধরলে এবং খুব শান্তশিষ্ট ভাব ধারণ করে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করলে। ফরাসী সৈনিক হঠাৎ বুঝতে পারলেন,

এই ভয়ংকরী রাজকুমারীকে এক আঘাতে হত্যা করতে হলে প্রয়োজন শুধু ওর ঘাড়ের ওপর ছোরা বসিয়ে দেওয়া। সে চেষ্টা করার জন্যে যেই তিনি ছোরাখানা তুলে ধরেছেন, ঠিক সেই সময়ে বাঘিনী তাঁর পায়ের কাছে জমির ওপর খুশিভরা মোহিনী ভঙ্গীতে লুটিয়ে পড়ল এবং মাঝে মাঝে তাঁর মুখপানে তাকিয়ে দেখতে লাগল এমন দৃষ্টিতে যার মধ্যে স্বাভাবিক হিংস্রতা সত্ত্বেও জেগে উঠেছিল অজানা এক স্নিগ্ধতার দীপ্তি।

বেচারা প্রোভেন্স-বাসী সৈনিক একটি খেজুর গাছে ঠেস দিয়ে খেজুর খেতে লাগলেন। খেতে খেতে কখন-বা মরুভূমির খাঁ খাঁ বুকের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন—যদি কোন উদ্ধারকারী লোকের খোঁজ পাওয়া যায়। কখন-বা তাঁর ভয়ংকরী সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন, কতক্ষণ ওর সন্দেহ-জনক, দয়ালু দরদ বজায় থাকে! প্রত্যেকবার তিনি খেজুর খেয়ে বীচিটা যেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলেন, বাঘিনী অচিন্ত্যনীয় সন্দেহে সে জায়গাটার ওপর চোখ ফেলে দেখছিল। ও পাকা ব্যবসায়ীর মত মনোযোগ দিয়ে মানুষটিকে যাচাই করে নিচ্ছিল। যা হোক, সে পরীক্ষার ফল হল সন্তোষজনক। কেন না, সৈনিকের খাওয়া শেষ হলে, ও তাঁর জুতো জোড়া চাটতে চাটতে ওর খসখসে জোরালো জিব দিয়ে জুতোর খাঁজে খাঁজে যত ধুলো ছিল সাফ করে দিলে।

সৈনিক ভাবলেন, এখনো ত বেশ দরদী, কিন্তু যখন ওর ক্ষিদে পাবে তখন কি হবে!

এই চিন্তা মনে উঠতেই তাঁর বুক কেঁপে উঠল। তবু, তিনি বেশ উৎসুক হয়ে বাঘিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাত বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগলেন। ও ছিল সত্যিই ওর জাতের মধ্যে একজন সবচেয়ে উঁচুদরের সুন্দরী। উচ্চতায় তিন ফুট, লম্বায় লেজ বাদ দিলে চার ফুট। লেজটি ছিল ওর জোরালো অস্ত্র, লাঠির মত সুগোল এবং প্রায় তিন ফুট লম্বা। ওর মাথা সিংহিনীর মাথার মত বড়। তার ওপর ছিল সচরাচর-দেখা-যায় না-এমন নারীসুলভ কমনীয়তার ছাপ। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, বাঘ জাতির মমতাহীন নিষ্ঠুরতার ছাপই ছিল প্রধান। তবু, ছলনাময়ী মেয়ের গড়নের অনেকটা সাদৃশ্যও ছিল। এক কথায় এই নিঃসঙ্গ সম্রাজ্ঞীর মুখের আকৃতির ওপর এই মুহূর্তে ছিল ভয়ংকর রঙ্গ-প্রিয়তার ছাপ—যেন পানোন্মত্ত, রোম সম্রাট নিরোর মুখের মত। ওর রক্তের পিপাসা মিটেছিল, —এখন ও খেলায় মত্ত হতে চায়।

সৈনিক অবাধে আসা-যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। বাঘিনী তা করতে

দিলে। কেবল চুপচাপ বসে তাঁর প্রতি পদক্ষেপ এক দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল। সে দৃষ্টিপাতে বেশী ছিল অবশ্য কুকুরের স্বাভাবিক বিশ্বাসপরায়ণতার চেয়ে অ্যাঙ্গোরা দেশের প্রকাণ্ড বিড়ালীর সংশয়প্রবণতা। ঘোরাঘুরির সময় রাস্তার বাঁকের মাথায় তিনি দেখতে পেলেন, ঝরনার পাশে তাঁর ঘোড়ার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। বাঘিনী অনেক দূর থেকে টানতে টানতে ওটাকে নিয়ে এসেছে। মরা জানোয়ারের দেহের প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ খাওয়া শেষ হয়েছিল। সৈনিক সে দৃশ্য দেখে ভরসা পেলেন। তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন, ও গতরাত্রে কেন গুহাতে ছিল না এবং গুহাতে ফিরে আসার পর তাঁকে ঘুমন্ত দেখেও কেন আক্রমণ করে নি। সৌভাগ্যের এই প্রথম টুকরোটি তাঁকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করে তুললে। তিনি মনে মনে এক উদ্ভট পরিকল্পনা করলেন যে, বাঘিনীর সঙ্গে একত্রে বাস করে সুখের সংসার গড়ে তুলবেন। ওকে সন্তুষ্ট রাখবার কোন উপায়ই তুচ্ছ বলে ত্যাগ করবেন না এবং ওর স্নিগ্ধ কোমল ব্যবহারের প্রতিদানে ওর মন জয় করবার চেষ্টা করবেন।

তিনি শেষে ওর কাছে ফিরে এলেন। খুশির সঙ্গে লক্ষ করলেন, প্রায়-বুঝতে-পারা-যায়-না এমন ধীরে ধীরে ও ওর লেজ নাড়তে লাগল। তখন নির্ভয়ে ওর পাশে বসে পড়ে ওর সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে দিলেন। তিনি ওর থাবা, ওর মুখ নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরলেন; কান দুটো টানাটানি করতে লাগলেন; মাটিতে ওর পিঠের ওপর ওকে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তপ্ত, রেশমী-কোমল গায়ের দুপাশ জোরসে আঁচড়াতে লাগলেন। বাঘিনী তাঁর খুশি-মত তাঁকে সবকিছু করতে দিলে। যখন তিনি ওর থাবার লোমগুলোর ওপর হাত বুলুতে লাগলেন, তখন ও থাবার বড় বড় নখগুলো সাবধানে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলে। নখগুলো ছিল দামাস্কাস নগরীর ব্লেডের মত বাঁকানো।

তিনি ছোরার ওপর একখানা হাত রেখে সে সময়েও ভাবছিলেন, বাঘিনীর দেখছি একটুও সন্দেহ এখন মনের মধ্যে নেই। এই সুযোগে ওর নরম বুকে ছোরাখানা সজোরে বসিয়ে দেব নাকি! সঙ্গে-সঙ্গে ভয় জাগল, মৃত্যু যন্ত্রণার শেষ ছটফটানির সময় ও যদি তাঁকে প্রাণপণে জাপটে ধরে তার দম আটকে দেয়, তাহলে!

তাছাড়া, তাঁর প্রাণে একটা এই মর্মে সাবধানী ধারণা জেগেছিল যে, কোন রকম ক্ষতি করছে না যে প্রাণী, তাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত। তাঁর বোধ হল, এই বিরাট মরুপ্রান্তরে যাহোক অন্ততঃ একজন বন্ধু ত তিনি পেয়েছেন!

হঠাৎ আপনা থেকে স্মরণে এল, দেশে থাকতে একদিন যার সঙ্গে তাঁর ভালবাসা হয়েছিল, সেই মেয়েটিকে। সে ছিল বড় হিংসুটে, তাই তাকে তামাশা করে ডাকতেন 'মিগনন' বলে। এই হিংসুটে স্বভাব এত ভয়ংকর ছিল যে, যতদিন তাদের মেলামেশা ছিল, ততদিন সদাই তাঁর ভয় করত, কখন না-জানি মিগনন তাঁকে ছোরা মেরে বসে। যৌবনের এই স্মৃতির সংস্পর্শে তাঁর মনে একটা ইচ্ছা জাগল, এই বাঘিনীর নড়ন-চড়নের লালিত্য এবং সর্বাঙ্গের শ্রী যখন বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক নির্ভয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে উপভোগ করছেন, তখন তরুণী বাঘিনীকে 'মিগনন' নামে ডাকি না কেন!

সন্ধ্যের দিকে তিনি তাঁর বিপদসংকুল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে এত স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নিতে পারলেন যে, এই বিপদসংকুলতা তাঁর বেশ পছন্দসই হয়ে উঠল। শেষে যখনই তিনি কৃত্রিম স্বরে 'মিগনন' বলে ডাকতে লাগলেন, বাঘিনী তখনই তাঁর দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করলে।

সূর্য অস্ত গেলে 'মিগনন' কয়েকবার গভীর অথচ বিষাদভরা ডাক ডাকলে।

সৈনিক রঙ্গভরে মনে মনে বললেন, যোগ্যভাবেই ওর লালন-পালন হয়েছে, দেখছি! এ ত ওর ডাক নয়—এ যে সন্ধ্যেবেলায় ওর প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ।

সন্দেহ নেই, এ সময়ে বাঘিনীর খুশিভরা, শান্ত ভাব-ভঙ্গিমা দেখেই তাঁর মনে এ কথা জেগেছিল।

ইতিমধ্যে তিনি পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন, বাঘিনী ঘুমিয়ে পড়লেই পায়ে হেঁটে পালাবেন এবং রাত্রের জন্যে কোন-একটি আশ্রয় খুঁজে নেবেন। তাই ওর উদ্দেশে বললেন, বেশ, বেশ, ছোট্ট আদরের ধন আমার, চল, আমি তোমাকেই ঘুমিয়ে পড়বার সুযোগ দিই।

তারপর ধৈর্যের সঙ্গে পালাবার উপযুক্ত মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যখন সময় হল, তিনি গুহা থেকে নিঃশব্দে বার হয়ে খুব জোর কদমে নীল নদের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু বালির বুকের ওপর দিয়ে মাত্র সিকি মাইল যেতে না যেতেই বুঝতে পারলেন, বাঘিনী তাঁর পিছনে পিছনে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে; সঙ্গে-সঙ্গে করাতের কলের শব্দের মত মাঝে মাঝে ডাক ডাকছে। সে ডাকের আওয়াজ লাফানোর ধুপধাপ শব্দের চেয়েও ভয়ংকর।

তিনি নিজের মনে বলে উঠলেন, বেশ, বেশ, নিশ্চয়ই আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে! এর আগে কারোর সঙ্গে হয়ত তোমার ভালবাসার সম্পর্ক হয়-নি। ভাবতে অবশ্য খুব ভাল লাগে, আমিই তোমার প্রথম!

ঠিক এই মুহূর্তে ভাগ্যক্রমে ফরাসী সৈনিকের পা চোরা বালির মধ্যে ঢুকে গেল।

মরুযাত্রীদের পক্ষে এমন অবস্থা ভয়ানক বিপজ্জনক! এ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা থাকে না। তিনি অনুভব করলেন, আস্তে আস্তে তাঁর দেহটা বালির মধ্যে নেমে যাচ্ছে। তাই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন।

বাঘিনী জায়গাটিতে পৌছেই ওর দাঁত দিয়ে সৈনিকের জামার কলার খুব জোর করে কামড়ে ধরলে এবং বিপুল শক্তিবলে পেছনের দিকে লাফ দিয়ে যেন জাদুস্পর্শে বালির আবর্ত থেকে তাঁকে টেনে তুললে।

—আঃ, মিগনন! আমরা এখন জীবনে মরণে দুজন দুজনের বন্ধু। কিন্তু আর কোন ছলনা-চাতুরী চলবে না। কি বল?

সৈনিকপুরুষ উৎসাহের সঙ্গে ওকে আদর করতে করতে কথাগুলো বলতে লাগলেন।

তারপর গুহায় ফিরে গেলেন।

এখন থেকে তাঁর চোখে মরুভূমি আর জনহীন মনে হল না। পাশে অন্ততঃ এমন একজন আছে, যার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে পারেন। ইতিমধ্যে বন্ধুর হিংস্র স্বভাব তাঁর সম্পর্কে অনেকটা কমজোরী হয়ে পড়েছিল। এ রকম মানুষ আর জীবের মধ্যে অদ্ভুত বন্ধুত্ব যে কি করে সম্ভব, তা নিজের কাছেও দুর্বোধ্য মনে হতে লাগল।

সেদিন রাতে জেগে থাকবার এবং আত্মরক্ষার্থে সাবধান হবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোরবেলা জেগে উঠে মিগননকে কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন না।

তিলমাত্র দেরি না করে খুঁজতে বার হলেন। পাহাড়ের ওপর-এলাকায় উঠতেই ওকে দূরে দেখতে পেলেন। বাঘিনী লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছিল। ওই ওদের জাতের স্বভাব। মেরুদণ্ড খুব নরম হওয়ার দরুণ না লাফ দিয়ে শুধু ছুটে যাতায়াত করতে পারে না।

মিগনন কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর মুখখানা ছিল রক্তমাখা। সেই অবস্থাতেই গলায় ঘড়ঘড়:শব্দ করে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গীর কাছ থেকে আদর আদায় করলে। সৈনিক প্রিয়জনের মত ওকে আদর করতে করতে বলতে লাগলেন, আহা, সুন্দরী, তুমি ভদ্র মনের তরুণী, ঠিক কিনা বল? তুমি আদর খেতে ভালবাস, নয় কি? কিন্তু নিজের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কি তোমার লজ্জা করে

না? তুমি আজ একটি মগ্রাবিন ঘোড়াকে খাচ্ছ। আচ্ছা, ওরা ত তোমার মতই জানোয়ার। তুমি কিন্তু কোন ফরাসী লোককে গবগব করে গিলে খেও না, বলে দিচ্ছি। খেলে আমি তোমাকে একটুও ভালবাসব না!

মনিবের সঙ্গে ছোট কুকুর-ছানা যেমনভাবে খেলা করে, ও তেমনিভাবে তাঁর সঙ্গে খেলা করলে। নিজের দেহটা নিয়ে সঙ্গীকে গড়াগড়ি খাওয়াতে দিলে, খেলার ছলে চড় চাপড় মারতে দিলে। কখন-কখন বা ওকে আদর করার কাজে প্রলুব্ধ করার আশায় অনুনয়-অনুরোধের ভঙ্গী করলে।

এইভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। বন্ধুর সঙ্গভোগের ফলে মরু-রাজ্যের মহিমা-দীপ্ত সৌন্দর্য তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠল। মরুর বুকে যখন তিনি খুঁজে পেলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আতঙ্কের মধ্যে শান্তির অজানা রহস্য, প্রয়োজনের মত খাদ্য এবং তাঁর সারা দিনের ভাবনা চিন্তাকে ভরিয়ে রাখে এমন একটি জীবন্ত জানোয়ার সঙ্গী, তখন তাঁর অন্তর্-সত্তা নতুনতর আবেগের প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠল। এ এক বিপরীত-বৈচিত্র্যে ভরা জীবন। তাঁর চোখে নির্জন নিস্তব্ধতার নবীন রূপ উদ্ঘাটিত হল। এর জাদু-মায়ায় তিনি মুগ্ধ হলেন। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের শোভার মধ্যে এক গোপন মহিমার দীপ্তি আবিষ্কার করলেন। সংসারের দশজন মানুষের কাছে এ মহিমা ত নিজেকে ধরা দেয় না। কদাচ-কখন-উড়ে আসা পাখির ডানার শোঁ-শোঁ শব্দ মাথার ওপরে যখন শুনতে পান, অথবা দ্রুত পরিবর্তনশীল, বিচিত্র রঙের পথিক-মেঘের দল যখন আকাশের বুকে জড় হয়, তখন তাঁর সারা দেহ কাঁপতে থাকত। গভীর রাতে মরু-ঝড়ে নিত্য আন্দোলিত বালু-সাগরের বুকে দেখতেন জ্যোৎস্নার খেলা। পূর্বদেশের দিনের বেলার খর আলো তাঁর সহ্য হয়ে গিয়েছিল। এর জ্যোতির গরিমা উপলব্ধি করে তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকত না। আবার অনেক সময়ে সমতল ভূমিতে মহা-আড়ম্বরে ঝড় উঠত, তার ফলে মারাত্মক বাষ্পে-ভরা লাল, শুকনো কুয়াশায় বালুর ঘূর্ণি সৃষ্টি হত। এর ঠিক পরেই তিনি মহা খুশিভরে লক্ষ করতেন, ধীরে ধীরে নেমে আসছে সন্ধ্যার ছায়া। আর তার ওপর বর্ষিত হচ্ছে আকাশের তারাগুলির আশিস-ভরা শীতলতা। আকাশে আকাশে তিনি শুনতে পেতেন যে গান কানে-যায়-না শোনা—সেই গান! নির্জন নিস্তব্ধতা তাঁর অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছিল স্বপ্নময়তার সবকিছু সুখানুভূতি। তিনি তুচ্ছ স্মৃতিগুলি নিয়ে অথবা তাঁর অতীতের মামুলী জীবন এবং বর্তমান বিস্ময়কর জীবন দুয়ের তুলনা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন।

ক্রমে বাঘিনীর প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ জন্মাল। কারণ, ভালবাসার মত কোন কিছু অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে জরুরী হয়ে পড়েছিল। হয়ত প্রবল ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগে তিনি সত্যি-সত্যি তাঁর সঙ্গিনীর স্বভাবে একটা পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন। অথবা, তখন মরুর বুকে নিয়ত যুদ্ধ চলার দরুণ বাঘিনী যথেষ্ট খাদ্য জোগাড় করতে পারছিল বলে সৈনিক-সঙ্গীকে আক্রমণ করার প্রবৃত্তি ওর হয় নি। ক্রমে সম্পূর্ণভাবে পোষ মানতে দেখে সৈনিকের মনে ত ওর সম্বন্ধে আর তিলমাত্র ভয় ছিল না।

এরপর এমন অবস্থা হল যে, তিনি বেশির ভাগ সময় নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে কাটাতে লাগলেন। তবে মাকড়সা যেমন নিজের চারিদিকে জাল সৃষ্টি করে রাখে, তেমনিভাবে তিনি মনকে সবসময়ে জাগিয়ে রাখতেন, যাতে চারিদিকের দিগন্ত-ঘেরা এলাকার মধ্যে উদ্ধার পাওয়ার কোন সুযোগ উপস্থিত হলে, তা যেন সাবধানতার অভাবে হারিয়ে না যায়। নিজের গায়ের কামিজ কেটে একটি পতাকা তৈরি করেছিলেন। মুড়িয়ে-পাতা-কাটা একটি খেজুর গাছের মাথায় সেই পতাকাখানি বেঁধে দিয়েছিলেন। পাছে হাওয়ায় গুটিয়ে গিয়ে সেই পতাকা মরু-পথ-দিয়ে-চলে-যাওয়া, প্রত্যাশিত দূরের কোন পথিকের নজরে না পড়ে, তাই প্রয়োজনের তাগিদে শিখে-নেওয়া বিদ্যাবলে কয়েকটি লাঠির সাহায্যে পতাকা-খানিকে পতপত করে সর্বদা ওড়া অবস্থায় রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এক-এক সময় তাঁর বোধ হত, সময় যেন আর কাটতে চায় না। মনের সেই অবসন্ন অবস্থায় উদ্ধারলাভের সকল আশা লুপ্ত হয়ে যেত। তখন তিনি সঙ্গিনীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতেন। বাঘিনীর গলার স্বরের বিভিন্ন সুরের তাৎপর্য আর চোখের চাহনির নানা ভঙ্গিমার মানে বুঝতে শিখেছিলেন। ওর সোনার রঙের গায়ের চামড়ার ওপরে যে-সব বিচিত্র, পরিবর্তনশীল দাগগুলো নক্ষত্রের মত শোভা পেত, তাদেরও তিনি বিশ্লেষণ করে দেখতেন। এমন-কি ওর ভয়ংকর লেজের শেষ প্রান্তের চুলগুলো ধরে টেনে লেজের ওপরকার কাল আর সাদা রঙের রোদে-ঝলমল-করা গোল গোল দাগগুলো যখন তিনি গুনতে থাকতেন, তখন মিগ্ননন রাগ প্রকাশ করে কোন গর্জন করত না। ওর মাথার সুন্দর গড়ন আর বুকের তুষার-সাদা, কোমল-সুশ্রী রেখাগুলি দেখতে দেখতে তাঁর অন্তর তৃপ্তিতে ভরে যেত। আর বাঘিনী যখন তিরিং-মিরিং করে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা দেখাত, তিনি খুশি মনে তাকিয়ে দেখতেন। ওর চটপটে তৎপরতা, ওর ভরাযৌবনের ছন্দোময় গতিশীলতা দেখে নিত্য নতুন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তেন।

ঝাঁপানো, গাছেচড়া, অনায়াসে হড়কে নামা, তাঁর খুব কাছে এসে গায়ে গা ঘষা, দোল খাওয়া, গড়াগড়ি দেওয়া—লাফ দেবার আগে গুড়িগুড়ি মেরে বসা প্রভৃতি সব রকম কাজেই ওর সহজ নমনীয়তা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ওদিকে আর একজনের মনেও সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি মোহ। লাফ দেবার সময় ওর গতি যতই ক্ষিপ্র থাক, অথবা জমির পাথর যতই পিছল থাকুক, 'মিগনন' ডাক শোনা মাত্র বাঘিনী মুহূর্তের মধ্যে একেবারে খাড়া হয়ে থেমে পড়ত।

হঠাৎ একদিন একটা বিপুল-আকার পাখি মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। আকাশে তখন ভীষণ খর রোদ। ফরাসী সৈনিক পাখিটাকে ভাল করে দেখার জন্যে বাঘিনীর সঙ্গ ছেড়ে উঠে গেলেন। কিন্তু এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর বাঘিনী একটা হুংকার দিয়ে ডেকে উঠল।

সৈনিকের মনে হল, ওর চোখ দুটিতে পুনরায় ফুটে উঠেছে কঠোর দৃঢ়তা।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন, কে জানে ওর বুকে যদি হিংসা না জেগে থাকে, তাহলে নিজেকে খুব পুণ্যবান মনে করব। মেয়েমানুষের সত্তা ওর দেহের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে ঈগল পাখিটা দূর আকাশে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর? তারপর সৈনিকের মনে নতুন করে সৃষ্টি হতে লাগল বাঘিনীর পিঠের গোল আকৃতি এবং অঙ্গে অঙ্গে সুষ্ঠু, সুশ্রী রেখার সৌন্দর্যের প্রতি মোহ। ও যেন সত্যিই একজন মেয়েমানুষের মতই সুন্দরী। গায়ের লোমের সোনালী রং ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবে ধাপে ধাপে বদলাতে বদলাতে উরুর সাধারণ সাদা রঙের সঙ্গে মিশেছে। দাগে বিচিত্রিত দেহের স্বর্ণ-আভার ওপর সূর্যকিরণ পড়লে অবর্ণনীয় রূপ ঝলসে ওঠে।

ফরাসী সৈনিক এবং বাঘিনী মন জানা-জানির বিশ্বাস নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালে। মরু-সুন্দরী কেঁপে উঠল হঠাৎ ওর মাথার খুলির ওপর মানুষ সঙ্গীর আঙুলের নখের স্পর্শ পেয়ে। ক্ষণিকের জন্যে ওর চোখ দুটিতে খেলে গেল বিদ্যুতের শিখা। তারপর ও বেশ সজোরে চোখ বুজে ফেললে।

সৈনিক চিৎকার করে বলে উঠলেন, বাঘিনীর বুকের মধ্যে একটা সত্তা আছে, দেখছি।

শান্ত, চুপচাপ, বিশ্রামে এলিয়ে পড়া মরু-রানীকে তখন দেখাচ্ছিল মরুর

বালুর মত স্বর্ণাভ, চোখ-ঝলসানো দীপ্তিতে অপরূপা,—আবার মরু-বালুর মতই অগ্নিময়া ও নিঃসঙ্গ।

—আচ্ছা, বেশ, আমি জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে আপনার ওকালতিমূলক লেখা পড়ে ফেলেছি। কিন্তু এই দুটি প্রাণী, যারা পরস্পরকে এত সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছিল, ওদের শেষ-পরিণতি কি হল?

আমার বান্ধবী জিজ্ঞাসা করলেন।

—আহা, সব বড় বড় ভালবাসার ক্ষেত্রে যা ঘটে, এদের শেষ পরিণতিও হল ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে।

—কখন-কখন সব চেয়ে সুখের মুহূর্তে মাত্র একটা চাহনি বা চিৎকারই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট উপকরণ। আচ্ছা, তোমার গল্পের শেষে কি ঘটল?

বান্ধবী জিজ্ঞাসা করলেন।

—তা বলা মুশকিল। তবে বুড়ো মানুষটি আমার কাছে যে গোপন কথা একান্ত বিশ্বাসবশে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, তা শুনলে তুমি হয়ত কিছু বুঝতে পারবে। শ্যামপেনের বোতল শেষ করে উনি আবেগে চিৎকার করে উঠেছিলেন, জানি না, কিসের ঘোরে আমি ওকে আঘাত করেছিলুম। একদিন হঠাৎ পাগলীর মত ও আমাকে আক্রমণ করে আমার উরু দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। এটা অবশ্য ঠিক ঠিক কোন সাংঘাতিক আক্রমণ ছিল না। কিন্তু খেয়ালবশে আমার ধারণা হল, ও আমাকে মেরে ফেলতে চায়, তাই তখনি ওর গলায় খুব জোরে ছোরা বসিয়ে দিলুম। ও একটা শেষ ডাক ডেকে জমির ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগল। সে ডাক শুনে আমার শরীরে রক্ত হিম হয়ে জমে উঠল। ও শেষ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে,—ওর সে দৃষ্টিতে কোন রাগের চিহ্ন ছিল না। ওকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে আমি দুনিয়াতে আমার যা-কিছু ছিল,—আমার সর্বস্ব—এমন কি আমার এই মিলিটারী পদক (অবশ্য পুরস্কার তখনো পাইনি) পর্যন্ত দিতে পারতুম। আমার বোধ হচ্ছিল, আমি যেন একজন মানুষ খুন করেছি,—জানোয়ার নয়! তারপর?

—যে ফরাসী সেনাদল দূর থেকে আমার পতাকা দেখতে পেয়ে আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টায় ছুটে এসেছিল, তারা কাছে এসে দেখতে পেল, বেহুঁশের মত অবস্থায় আমি অঝোরে কাঁদছি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সৈনিক বলে চললেন, এর পর থেকে আমি যুদ্ধ

করতে করতে জার্মানী, স্পেন, রাশিয়া, ফ্রান্স—নানাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু আমার কাছে মরুদেশের মত আর-কিছু সংসারে নেই। আহা, কি সুন্দর, কি চমৎকার!

—সেখানে আপনার কি ভাল লেগেছিল?

প্রশ্ন করে আমি জানতে চেয়েছিলুম।

—ওঃ, আমি তা মুখে প্রকাশ করতে পারব না। আমি যে সবসময়ে আমার বাঘিনী আর খেজুর গাছের কথা ভেবে মরি, তা নয়। ওদের জন্যে আমার মনোকষ্টের শেষ নেই! কিন্তু আমার এই কথাগুলো মনে রাখবেন। মরুদেশে সবই আছে, আবার কিছুই নেই।

—আপনার মন্তব্যটি একটু ব্যাখ্যা করে বলুন না।

তিনি বেশ অধৈর্যের সঙ্গে বলতে লাগলেন, কি আর বলব? এ যে ভগবান, —মানুষের সংস্পর্শহীন!

। ভাল্লুকশিকারীর মেয়ে ॥

॥ কনর‍্যাড বারকোভিচি-র লেখা ॥

[কনর‍্যাড বারকোভিচি ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি স্বদেশ হচ্ছে রুমানিয়া রাজ্য। ১৬ বছর বয়সে সেখান থেকে চলে এসে শেষ দিন পর্যন্ত আমেরিকার ন্যু ইয়র্ক শহরে বসবাস করেছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় অসংখ্য ছোট-গল্প রচনা করে গেছেন। "ডাসট্ অব্ ন্যু ইয়র্ক", "মুরডো", "স্টোরী অব্ দ্য জিপসীস" প্রভৃতি তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ।

আলোচ্য কাহিনীর প্রধান চরিত্র একজন জিপসী কিশোরী, নাম মার্গারিটা। শুধু তার ভালবাসাকে উপকরণ করেই গল্পের প্লট সৃষ্টি করা হয়েছে। ভাল্লুকশিকারী বাপের কাছে শিখেছিল বুনো ভাল্লুকদের পোষ মানিয়ে নানা খেলা দেখাবার মত গড়ে তোলার কলাকৌশল। অল্প বয়সেই এ কাজে সে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তার দেহে ছিল যেমন অসামান্য শক্তি, মনের দিক থেকে সে ছিল তেমনি নব-কৈশোরের উত্তাপে উগ্র তেজস্বিনী।

লেখক বিচিত্র রেখার স্পর্শে সুন্দরভাবে এঁকে তুলেছেন কাহিনীর প্রথম অংশে জিপসী গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পরিমণ্ডল এবং দ্বিতীয় অংশে জিপসী রমণীর চারিত্রিকতার স্বাতন্ত্র্য—তার রুচি ও আচরণ, কথা-বার্তার স্থূলভঙ্গী ও ভালবাসা প্রকাশের সরল অথচ তীক্ষ্ণ আকুতি। শহরের প্রান্তে আমাদের চারপাশের মধ্য শ্রেণীর সামাজিকতার কিনারায় বাস করেও তারা যেন অন্য গ্রহের মানুষ।

এই গ্রন্থের অন্য দুজন কিশোরী নায়িকা মেগান ও দীনার সঙ্গে বাহ্যতঃ তার রুচি ও জীবনের কামনায় প্রচুর গরমিল রয়েছে, "প্রথম-প্রেম" প্রকাশের রীতি এবং উপভোগের আদর্শে রয়েছে বেশ প্রভেদ, তবু প্রেমানুভূতির মূলে আছে সবায়েরই একই রকম ত্যাগরসে-উচ্ছলিত আত্মসমর্পণের প্রচণ্ড আকর্ষণ। এই বিষয়ে কোন অমিল নেই।

এবার টেকনিকের আলোচনা করা যাক। ঘটনাবহুলতার অভাব

থাকলেও কোথাও প্লটের গতি দুর্বল হয়ে পড়েনি, বরং নিপুণ তুলির স্পর্শে দুর্বার স্রোতে তা পরিণতির দিকে ছুটে গেছে। গল্প পড়তে পড়তে সম্পূর্ণ অজানা পরিবেশ এবং অপরিচিত মানুষ—জিপসীগোষ্ঠীর বস্তির কাছে আমরা যেন অজান্তে গিয়ে উপস্থিত হই। লেখকের বাস্তবতার মায়া-সৃষ্টির দক্ষতাকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ঘটনাবলীর শেষ প্রান্তে মার্গারিটার বাবা 'চোরকে না ধরে বাসায় ফিরব না' এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে চলে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ তার বাসায় ফিরে আসার শব্দ শুনতে পাবার ইঙ্গিত সৃষ্টি করায় কিছু অকারণ melo-drama-র পরিচয় প্রস্ফুট হয়ে পড়েছে। এর ফলে, মনে হয়, পড়ার সময় পাঠক-পাঠিকাদের অন্তরে বাস্তবতার মায়াচ্ছন্নতাবোধ আপনা থেকে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। প্রশ্ন জাগে, এ কি শিল্পীর তুলির একটি অত্যন্ত কৃত্রিম রেখা নয়? —কৃত্রিম নিশ্চয়ই, কিন্তু হয়ত এখানেই প্লটের পরিণতি ঘটাবার জরুরী প্রয়োজন বোধে তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছে। হঠাৎ বাপ এসে পড়ার সর্বনাশা সম্ভাবনা না ঘটালে নায়িকার আকুল কণ্ঠে "লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়, ভগবানের দোহাই! বাবা যে এসে পড়ল!" —এই উক্তি দিয়ে মনের গোপনে লুকিয়ে রাখা আত্মনিবেদনের চরম আকুতি অজান্তে প্রকাশ করা সম্ভব হত না,—প্লটের পরিণতিও ঝটিতি এমন চিত্তাকর্ষকভাবে রূপ গ্রহণ করতে পারত না।]

নাম ওর কোসটা। পেশায় ভাল্লুকশিকারী। কারপেথিয়ান পর্বতমালার আশপাশের সর্বত্র ও বেশ ভালভাবেই পরিচিত ছিল। ঐ পর্বতমালার যেদিকে হাঙ্গেরী দেশ এবং যেদিকে রুমানিয়া দেশ—দুদিকেই ওর আসা-যাওয়া ছিল। যে শত-শত জিপসীরা গ্রামে গ্রামে বাজারের ধারে কিংবা সরাইখানার সামনেটায় ভাল্লুক-নাচ দেখিয়ে ঘুরে বেড়াত, তাদের প্রায় আধা-আধি লোক এই কোসটার কাছ থেকেই ভাল্লুক কিনেছিল।

কোসটার কাছে শিক্ষা-পাওয়া ভাল্লুক কিনলে প্রচুর উপার্জন হত। কোসটার ভাল্লুক বাঁশির ধ্বনি বা ডুগডুগির শব্দের তালে তালে চার পায়ে সাধারণ নাচ নাচতে পারত, আবার পিছনের দু-পায়ের সাহায্যে ওয়াল্টস্ নাচও নাচতে পারত। বয়সে বড় ছোট সবায়ের আনন্দবর্ধনের জন্যে জানোয়ারগুলো ডিগবাজি

খাওয়া, মাটিতে মাথা রেখে ওপর দিকে পা করে দাঁড়ানো, কাঠের গুঁড়ি বা খালি পিপে গড়ানো, হুকুম করলে সৈন্যদের মত খাড়া হয়ে দাঁড়ানো, অথবা আরো হাজার রকমের কলা-কৌশল দেখানো,—সব কাজই করতে পারত।

কোসটা ওর ছাত্রদের জন্যে অনবরত নতুন-নতুন খেলা আবিষ্কার করত। সে যা ইচ্ছে করত, তাই ওদের শেখাতে পারত। হাতে কোন জানোয়ার একবার পড়লে সে বেশ কুশলী ক্রীড়াশিল্পী না হওয়া পর্যন্ত কোসটা তাকে বিক্রী করত না। আর জানোয়ারটা যে নতুন মনিবের হুকুম অনুযায়ী খেলা দেখাবে—এ বিশ্বাস তার ওপর সব সময়ে রাখা যেত।

কোসটার বাসা ছিল পাশাপাশি দুটি পর্বতের মধ্যে এক গিরিখাতে। বসন্তের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূর্যকিরণে বর্ধিত সারি-সারি লম্বা গাছের ছায়ায় ছোট-ছোট তাঁবু গেড়ে কোসটা ওর মেয়ে মার্গারিটার সঙ্গে বাস করত।

পাহাড়ের পাদদেশে এক 'ক্রেনি'তে ছিল তার বিদ্যালয়। সেখানে কোসটা সম্পূর্ণ একাকী কেবল মানুষ-খেকো, সদ্য-ধরা-পড়া, বিরাট-বিরাট বাদামী রঙের ভাল্লুক-গুলোয় পরিবৃত হয়ে তার শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করত। কোসটার অভ্যাস ছিল প্রতি বসন্তকালের গোড়ার দিকে বরফগলা শুরু হতেই তার বাসা ছেড়ে ভাল্লুকের সন্ধানে যাত্রা করা। কালো ময়দার একটি বড় পাঁউরুটি, একখণ্ড পুরনো কার্পেটের তৈরী থলির মধ্যে পুরে, তার জুতোর ওপর দিকে হুইস্কির একটা বোতল গুঁজে দিয়ে, একটি ধারালো ছুরি নিয়ে, তার চওড়া লাল কোমর-বন্ধে ভাল করে তেল-লাগানো এক আর্মি রিভলভার ঝুলিয়ে, লোম-ওলা ভুরুর ওপর পর্যন্ত ফারের তৈরী কালো টুপিটি মাথায় দিয়ে কোসটা পাহাড়ে-পাহাড়ে ভাল্লুকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত।

কখন-কখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সে সেইদিনই বা সেইরাত্রেই তার দড়িগাছা টানতে-টানতে ফিরে আসত। সেই দড়িতে বাঁধা থাকত—শীত ঋতুর ঘুম যার তখনও পুরোপুরি ভাঙেনি এমন এক বিরাট মেয়ে-ভাল্লুক, আর তার কাঁধে ঝুলত একটা বা দুটো ছোট ভাল্লুক ছানা, পেছনের পায়ের সঙ্গে পেছনের পা বাঁধা। অন্যসময় কোসটা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ফিরে আসত না।

যা হোক, শিকার করতে গিয়ে সে কখনো শুধু হাতে বাসায় ফিরে আসত না। আর বাস্তবিক, যে সপ্তাহে এই প্রচুর দাড়ি-ভরা মুখ, দীঘল গড়ন, কালো তীক্ষ্ণ-চোখ যাযাবর কোন না কোন সরাই-মালিকের কাছে অন্ততঃ একখানা তাজা ভাল্লুকের চামড়া বিক্রি করতে না পারত, তখন বড়ই দুঃসময় বলে মনে করত।

কিন্তু ভাল্লুক মারবার জন্যে কোসটার তত আগ্রহ ছিল না। সে তাদের জীবন্ত ধরতে চাইত। কারপেথিয়ান পর্বতমালার প্রতি ইঞ্চি তার জানা ছিল। আর জানা ছিল ভাল্লুকদের প্রতিটি গর্ত। জীবন্ত ভাল্লুক ধরার জন্যে সে ছিল হাজার রকম কৌশলের ওস্তাদ।

যদি ভাল্লুকের শীতকালীন বাসায় পৌঁছবার পথ খুঁজে পাওয়া না যেত, কোসটা তখন একটা মাটির তৈরী পাত্রে আধ বোতল হুইস্কি খালি করত। সাধারণতঃ, মেয়ে-ভাল্লুকেরা সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটাবার উদ্দেশে গর্তে ঢোকবার আগে বাইরে আসার জন্যে দুটি মুখ তৈরী করে রাখে। কোসটা এইরকম একটি মুখ খুঁজে নিয়ে তার সামনে পাত্রটি রেখে দিত। তারপর কয়েকটি শুকনো ডালপালা বা কাঠি যোগাড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে আর সালফারের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে বাইরে আসার অপর মুখে সেগুলোকে ফেলে রাখত। সবশেষে এক জায়গায় লুকিয়ে বসে এবার কি ঘটে—তা লক্ষ করত। যদি ভাল্লুকটি তার কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জাগতে আরম্ভ করত, তাহলে সালফারের ধোঁয়ার গন্ধে কাজ হয়েছে বোঝা যেত। কিছুক্ষণ পরেই জানোয়ারটি অ্যালকোহল-ভরা পাত্রের কাছে এসে, তার চারপাশ ঘুরে গন্ধ শুঁকে একটু চেখে দেখার পর চাটতে চাটতে সবটুকু খেয়ে ফেলত।

আরো কিছুক্ষণ পরে কোসটা তার দাঁত দিয়ে একটা ছুরি কামড়ে ধরে এক-হাতে পিস্তল আর একহাতে তৈরী দড়ির ফাঁস নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেত। তার হিসাব-করা ওস্তাদের অনুমান ভুল না হলে, আর হুইস্কি ঠিক-ঠিক খাঁটি হলে, কোসটা তাড়াতাড়ি তার দড়ির পেছনে-বাঁধা একটা ভাল্লুককে টেনে নিয়ে আসত।

কিন্তু, এটা ছিল জীবন্ত অবস্থায় ভাল্লুক ধরার হাজাব রকম কৌশলের মাত্র একটি। ঠিক কোন্ কৌশল প্রয়োগ করা হবে, তা নির্ভর করত অবস্থা, খেয়াল আর মনের সহজ প্রেরণার ওপর। কম বেশী এক ডজন ভাল্লুক ধরার পর তাদের শিক্ষা দেওয়া শুরু হত। সদ্য-ধরা-পড়া কোন ভাল্লুককে চেনে বাঁধা থাকার সময় কোন লোক দেখতে এলে ও লাফালাফি করত। কিন্তু, কোসটা কাছে এলে জানোয়ারটা নিমেষে কুঁচকে পড়ে হাই তুলত। এরপর বড়জোর এক সপ্তাহের মধ্যে সেই সবচেয়ে দুর্দান্ত ভাল্লুকও পোষ মেনে যেত।

কোসটা সদ্য-ধরা জানোয়ারটাকে পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে তার শিক্ষা ভবনে নিয়ে যেত এবং এক বা দুদিনের মধ্যেই ছাত্রীটি শিক্ষকের হুকুম অনুযায়ী যে

কোন খেলা খুশিমনে দেখাত। এমনি ছিল শিক্ষক কোসটা। কিন্তু একবার নতুন ভাল্লুকটা পোষ মেনে সব খেলা শিখে ফেললে, ওর প্রতি কোসটার আর কোন আগ্রহ থাকত না! বরং ওকে ঘৃণা করতে শুরু করত। ও যে গাছের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত সেই গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর গায়ে থুতু দিত। শীতের লম্বা রাতগুলোতে সে সরাইখানায় গিয়ে পাইপ-দিয়ে-তামাক-খেকো কিসানদের কাছে গল্প বলত, যত পুরোতন দিনের গল্প, যখন ভাল্লুকেরা সত্যি ভয়ংকর প্রাণী ছিল, যখন তাদের ধরবার জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে নানা কৌশল করতে হত এবং তাদের পোষ মানাতে মাসের পর মাস কেটে যেত। আরো আগেকার দিনের গল্প বলত—যখন ভাল্লুক-নাচ-দেখানেওয়ালারা প্রত্যেকে নিজের-নিজের ভাল্লুক নিজেই পোষ মানিয়ে নিত, যখন কারপেথিয়ান পাহাড়ের ভাল্লুকেরা ছিল সত্যিই ভাল্লুক এবং সেকালের মানুষেরাও ছিল মানুষ নামের যোগ্য। অর্থাৎ তারা একালের মত ছিল না। একালে ভাল্লুকেরা হচ্ছে পোষমানা বিড়ালী আর শিকারী মরদেরা হচ্ছে সব বুড়ী আওরত।

দৈবক্রমে কোসটাব ছেলেদের মধ্যে কেউই বাপের উপযুক্ত হয়নি। বুড়ো মানুষটি ভাল্লুকদের পোষ মানিয়ে দিলে তবেই ওরা তাদের নিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলার কৌশল শেখাতে পারত। অবশ্য অন্য কোন জিপসী-ক্রেতা ভাল্লুক কিনতে এলে তার সঙ্গে ওরা চমৎকার দর কষাকষি করতে পারত। কিন্তু বাপের মত ওদের তীক্ষ্ণ বোধশক্তিওলা নাক ছিল না। ওরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে ভাল্লুকের বাসা বার করতে পারত না। আর বাপের মত ওরা দুঃসাহসীও ছিল না। সময় হলে প্রত্যেকেই বাপের ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র পৃথকভাবে বাসা করেছিল এবং ভাল্লুকের খেলা দেখিয়ে রোজগার করত।

একমাত্র মেয়ে মার্গারিটা। ও না থাকলে কোসটা ছেলেদের ব্যবহারের জন্যে জীবনে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ত। মেয়েটির মা ছিল তার অনেকগুলি স্ত্রীর মধ্যে একজন,—আকৃতিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গড়ন, প্রকৃতিতে বন্য; আধা তাতারী আধা চেক জাতীয়। কোসটা একজন ঘোড়াবিক্রিওয়ালা যাযাবর সর্দারের কাছ থেকে ওকে কিনেছিল। কিন্তু মার্গারিটা যখন খুব ছোট তখন তার মা মারা যায়। মেয়ে একদিকে পেয়েছিল মায়ের সুদৃঢ় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গড়ন আর একদিকে বাপের তীক্ষ্ণ, প্রায় মিশরীয় আকৃতি। তাই মেয়েকে নিয়ে কোসটার মনে খুব গর্ব ছিল।

অবশ্য, বাপের মত নিজে শিকার করতে যাওয়া বা বাপের সঙ্গে শিকারে যাওয়ার বয়স তার তখনও হয়নি, তবু সে বাপের মতই তাড়াতাড়ি এবং পুরোপুরি একটা বড় ভাল্লুককে পোষ মানাতে পারত। তার যখন বয়স প্রায় আট বছর ছুঁই-ছুঁই, তখন থেকেই বাপের ধরে-আনা ভাল্লুক ছানাদের পোষ মানাবার কাজ আরম্ভ করেছিল। যখন তার দশ বছর বয়স হয়েছিল, তখন চেনে-বাঁধা, বাসায়-রাখা, বাচ্চা-থেকে-বড়-হওয়া জানোয়ারকে বিশেষভাবেই বশ করতে পারত। এমন কি দড়িতে বেঁধে তার বাপের টেনে-আনা কোন কোন বড় জানোয়ারকেও পোষ মানাবার চেষ্টা করতে দ্বিধা করত না—যদি না তারা খুব ভয়ংকর আর জেদী লড়াকু হত। ওঃ, সেক্ষেত্রে সত্যিই জীবনটা ওর চোখে বড় আকর্ষণীয় মনে হত। ওর বাবা ওকে ডেকে বলত, দেখ-দেখ, মার্গারিটা, এই জানোয়ারটাকে একটা সত্যিকার জানোয়ারের মত বলে মনে হচ্ছে।

জিপসী মেয়েটি খালি পায়ে অগোছালোভাবে পোশাক পরে বাদামী রঙের খালি হাতখানিতে গরুর চামড়ার তৈরী চাবুক নিয়ে জানোয়ারটার মুখোমুখি হয়ে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করত। ভাল্লুকটি যদি আক্রমণ করার ভাব দেখাত, তাহলে সে আনন্দে নেচে উঠত, বাবার গালে চুমু খেয়ে আদর করত, তার গোঁফের চুল ছিঁড়ে দিত এবং দাড়ির চুল কামড়ে ধরত।

—আরে বাপরে! আরে বাপরে! এবার দেখছি সত্যিকারের একটাকে পাকড়ানো গেছে!

তারপর দিনের পর দিন বহুদিন ধরে ভোর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত বাপ আর মেয়ে সেই সত্যিকারের জানোয়ারটিকে নিয়ে ওদের নিজেদের শিক্ষাকেন্দ্রে সময় কাটাত। এদিকে বাসায় বিস্ময়-ভরা চোখ নিয়ে এক ডজন ক্রেতা কোসটার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চেঁচামেচি করত কিংবা আকাশ থেকে তুষারপাত হত অথবা ভাইগুলো নিজেদের মধ্যে চাকু আর চাবুক নিয়ে মারামারি করত। সেসব দিকে এদের কোন খেয়াল থাকত না। শেখানোর কাজটি শেষ হলে তবেই মাত্র বাসায় তাদের আবির্ভাব ঘটত। ওরা রোগা হয়ে যেত, চোখ দুটি জলজল করত, হাতে-পায়ে আলস্যের রেশ আর শেখানোর কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার জন্যে মনে গর্ববোধ—এইভাবে বাপ আর মেয়ে কোন সম্ভাব্য ক্রেতাকে ডেকে বলত, জানোয়ারটাকে নিয়ে যাও, একটু জল খেতে দিও। ও তোমার হাত থেকেই সোজাসুজি খাবার খাবে। বুঝলে?

আর সম্ভাব্য ক্রেতা সত্যিসত্যিই তা-ই করত। যে কোন দু-পাওয়ালা

জানোয়ার দেখলেই কোসটা আর তার মেয়ের নিজস্ব স্কুল থেকে পাশ-করা শিক্ষক ভয়ে কুঁকড়ে যেত।

তারপর বাপ মার্গারিটাকে ডেকে বলত, এই নাও, ওটা তোমার, অথবা এটা হচ্ছে আমার।

পরস্পরের মধ্যে কোন প্রশংসাসূচক কথাবার্তার আদান-প্রদান হত না। কোন কিছু বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকত না। কে যে কি করেছে, কখন করেছে, চাবুকের কটা ঘায়ে কাজটা হয়েছে—এসব বিষয়ে দুজনের প্রত্যেকেই সব কথা স্বভাব গুণে আপনা আপনি বুঝতে পারত। মুখে বলাবলি করে নিজের নিজের দম্ভ প্রকাশের আগ্রহ কারো মনে জাগত না।

মার্গারিটার বয়স যখন চৌদ্দ বছর হল, দৈবক্রমে সেবারের বসন্তকালে তার বাবার শিকারগুলো হল সব মরণ-রোগে আক্রান্ত বাচ্চা। তাদের ওপর গরুর চামড়ার চাবুক মিথ্যে-মিথ্যে ব্যবহার করা যে বড় দুঃখজনক কাজ! প্রচণ্ড বৃষ্টি-বাদলার পর সেবার শীতকালটা অপ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘ হওয়ায় ভাল্লুকগুলো ক্ষুধায় এবং ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়ে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তাদের দেখলে বোধ হত, তারা যেন ভেড়ার দল—মানুষ-খেকো-ভাল্লুক নয়।

মার্গারিটা প্রত্যেক দিন সত্যিকার জীবন্ত একটা জানোয়ার পাওয়া যাবে বলে আশা করে বসে থাকত, কিন্তু তার সে আশা সফল হত না। ধরাপড়া ভাল্লুকগুলো প্রত্যেকটাই হত রোগাক্রান্ত। যখন তার বাপ বাইরে কোথাও যেত, সে সদর্পে পা ফেলে হাতে চাবুক নিয়ে একটার পর একটা জানোয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়াত, তাদের উত্যক্ত করত, কারো কারোকে বা আঘাত করত; তারপর কাঁচা মাংস খেতে দিত যাতে তাদের রক্ত খাবার ইচ্ছে জেগে ওঠে। আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছানাদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানাটানি করত, যাতে তারা হিংস্রতায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তবে কোন ক্ষেত্রেই তার চেষ্টা সফল হত না। এক-এক সময় কোন মেয়ে-ভাল্লুক রাগের বশে থাবা তুলে ধরত এবং তার ছেঁদা-করা নাকের সঙ্গে-বাঁধা চেনে সজোরে টান দিত। তা দেখে মার্গারিটার মনের আশা বেড়ে উঠত, সে উল্লাসে চিৎকার করে বিচিত্র আদুরে নামে ওকে ডাকতে শুরু করত। কিন্তু দু-দুবার চাবুক মেরেও জানোয়ারটাকে শেষ পর্যন্ত অবসাদ থেকে খুঁচিয়ে জাগানো যেত না।

যখন বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল, বুনো ভাল্লুকগুলো তখন পাহাড়ী খাত

থেকে চূড়োয় উঠে ভেড়া, হরিণ কিংবা বুনো ছাগল সন্ধান করে বেড়াতে লাগল। তা দেখে বাপ আর মেয়ে কেউই কোন উত্তেজনা অনুভব করলে না।

পোষ মানানো আর খেলা শেখানো দুরকম কাজ শেষ হয়ে গেলে ভাল্লুক-গুলোকে বেচে ফেলা হল।

এরপর কোসটা এক সরাইখানা থেকে আর এক সরাইখানায়, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, মদ খেয়ে, হল্লা করে, তাস খেলে, কখনো-বা অন্য জিপসীদের সঙ্গে মারামারি করে দিন কাটাতে লাগল। কখনো-বা কারপেথিয়ান পর্বতশ্রেণীর রুমানিয়া দেশের দিকটায়, আবার কখনো-বা হাঙ্গেরী দেশের দিকটায় সীমান্ত-প্রহরীদের বোকা বানিয়ে বেশ খানিকটা উত্তেজনা উপভোগ করত।

বাসায় কি ঘটছে এবং আর কোনো জানোয়ারকে খেলা শেখাবার দরকার হয়ে পড়েছে কিনা—শুধু এইটুকু জানবার উদ্দেশে সে মাঝে-মাঝে বাসায় ফিরে আসত। কিন্তু কোন জানোয়ারকে খেলা শেখাবার প্রয়োজন হলে মার্গারিটা নিজেই আগে থেকে শেখানোর কাজ সেরে রেখে দিত; তার বাবাকে আর সে কাজ করার জন্যে প্রয়োজন হত না।

মার্গারিটার মনে কোন সন্তুষ্টি ছিল না। সতাতো বোনের স্বামীরা আর নিজের ভাইয়েরা মাঝে-মাঝে বাসায় তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। সে তখন ঝগড়া বাধিয়ে বসত। তার সতাতো বোনেদের সকলেরই অবস্থা সচ্ছল ছিল, তবে ওরা বয়সে বুড়ী হয়ে গিয়েছিল। এদিকে যারা জানোয়ার কিনতে আসত, তাদের সঙ্গে মামুলি কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া করে মার্গারিটার মন ভরে উঠত না। ও বিশ্রীভাবে তাদের অপমান করত। ও বলত, তোমরা ভাল্লুক পাবার জন্যে নিজেরা শিকারে যাও না কেন? তোমরা কেবল পোষমানা ভাল্লুক কিনতে চাও, কারণ নিজেরা ত মরদ নও, পোষমানা জীব আর কি!

লোকেরা ওর কড়া কথার উত্তর দিত না। তারা বরং বলত, ওর চোখ দুটি সুন্দর, দাঁতগুলি চমৎকার আর ওর হাতদুটিও যেমন সুডোল তেমনি উজ্জ্বল রঙের। কেউ কেউ তামাশা করে বলত, তোমার বাবার কাছ থেকে তোমাকে কিনে নিলে কেমন হয়, বলত?

—তুমি আমাকে কিনবে? তোমার হাতে আমাকে বিক্রি করা হবে? বল কি? একটা ভেড়ার কাছে বাঘিনী বিক্রি? তোমাকে আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব! না, না, তা করব না। শুধু তোমার গায়ে থুতু দেব। এই যে এমনি করে—থুঃ—থুঃ।

অপর পক্ষ থেকে উত্তর এল, না, না, তোমাকে আমি কিনে নেব না। দান হিসাবে পেলেও তোমাকে গ্রহণ করব না।

—তা ত বটেই, তুমি আমাকে গ্রহণ করবে না ত। তুমি যে ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছ! তোমার মুখের ওপরই আমি বলছি, শোন, তুমি ভয় পেয়ে গেছ। তুমি ত চাও পোষা ভাল্লুক, আমিই নিজে ওকে পোষ মানিয়েছি। এখন তুমি ওর পাশে বসে একই থালা থেকে নিশ্চিন্তে খাবার খেতে পার। না, না, ওটা কেন, এই দিকেরটা বরং তোমার উপযুক্ত হবে। ও পোষ-মানা হয়েই জন্মেছে,—যেমন তুমি আর কি! ওব বাপ তোমাব বাপের মতই ভেড়া ছিল। তাই তুমি এই রকম জানোয়ার পছন্দ কব। তুমি পোষ-মানা জানোয়ার কিনতে চাও, নাঃ? এমন কি তোমবা পোষ-মানা মেয়েও কিনতে চাও। কেন, যুদ্ধ করে বাপের বাড়ি থেকে মেয়েদের লুঠ কবে নিয়ে যেতে পার না? তোমরা যে ভীতু, কাপুরুষ, তোমরা দড়ি দিয়ে বেঁধে পোষ-মানা মেয়ে কিনতে চাও।

মার্গাবিটা এইভাবে কড়া কথা বলত; সে বেপরোয়া ভঙ্গীতে ঝগড়া করত। কিন্তু এতে কোন ফলই ফলত না। লোকেরা চোখেব কোণ থেকে বাঁকা দৃষ্টি হেনে তার দিকে তাকাত বটে। কিন্তু তাকে এড়িয়ে চলত। একজনও কখনো তার বাপের কাছে সত্যি-সত্যি খোঁজ কবেনি যে, সে মেয়েকে বিক্রি করবে কি না।

একদিন ভোরবেলা। তখন হিমেল হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। শীতের সঙ্গী কুয়াশাজাল কচি আঙুর আরকুলের ডালগুলি আচ্ছন্ন করে রাখছিল। ভাল্লুকশিকারী উরস্থুর ছেলে পেট্রাককিও কোসটা আর তার মেয়ে যেখানে বাস করত, সেই বস্তিতে এসে হাজির হল। উরস্থু ছিল কোসটার পুরোতন প্রতিদ্বন্দ্বী। তার বাসা আর ভাল্লুক শিক্ষা দেবার স্কুল বিশ মাইল দূরে ছিল। এই দুজন ভাল্লুকশিকারীর মধ্যে ভয়ংকর শত্রুতা ছিল। সকলেই জানত যে, দুজনের যদি পাহাড়ী অঞ্চলে নিরালায় একলা-একলা দেখা হয়, তাহলে সেখান থেকে একজনই মাত্র ফিরে আসবে। উরস্থুর ছেলে পেট্রাককিও যে কোসটার বাসার কাছে আসার সাহস করবে—এ ছিল তার পক্ষে খুব ঔদ্ধত্যের কাজ। তার বাপ উরস্থু দু-সপ্তাহেরও বেশী সময় নিজের বাসায় ছিল না এবং তাকে কোসটার বস্তির কাছে আসর্তে কেউই ইতিমধ্যে দেখতে পায়নি। এই দুটি কারণের জন্যেই সে শেষ পর্যন্ত মার্গারিটার কাছে আসতে পেরেছিল।

কোসটা তাকে দেখতে পেলে নিশ্চয়ই হত্যা করবে, সে জানত। তবু ছেলেটি এসেছিল বাপের হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। পেট্রাককিও এবং মার্গারিটা এর

আগে কেউ কারোকে দেখেনি। তরুণ জিপসী কোসটার বস্তির চারপাশে অন্য কোন মানুষের গন্ধ না পেয়ে কিছুক্ষণ দম্ভ-ভরে ঘুরে বেড়াল। দিনটা ছিল রবিবার। হঠাৎ মার্গারিটা তাঁবু থেকে বার হয়ে এসে মাথার ওপরে দুহাত উঁচু করে তুলে ধরে হাই তুললে।

আগন্তুক চিৎকার করে ওকে বললে, আরে, এযে তুমি দেখছি! তোমার বাবা কি মারা গেছে? না, ইতিমধ্যেই শীতকালের ঘুম শুরু করে দিয়েছে?

মেয়েটি জবাব দিলে, না, যে খোকারা পাহাড়ের মধ্যে পথ হারিয়েছে, তাদের খাওয়াবার জন্যে ছাগলের দুধ দুইছেন তিনি।

কথা বলতে বলতে মার্গারিটা তরুণের আরো কাছে এসে তার চোখের ওপর চোখ রেখে তাকিয়ে দেখলে। ওঃ, এ যে, একেবারে নতুন ধরনের মুখ!

ছেলেটি পা বেশ ফাঁক করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার ঘাড় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ছিল আর ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যাচ্ছিল। মার্গারিটার অঙ্গে-অঙ্গে শিহরণ খেলে গেল। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে বিদ্রোহ করবার মত এ যে একটা জীবন্ত জীব। এতদিন ধরে ও সহজে পোষ-মানবে-না এমন একটা ভাল্লুক পাবার আশায় বসে ছিল! যে তরুণটি সোজা খাড়া হয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে ও তার চাবুকটা আনবার জন্যে প্রায় দৌড়ে চলে গেল। তারপর ফিরে এল।

এখন ওঁার সামনে যে রয়েছে, এর চেয়ে বেশী যুদ্ধবাজ আর বড় শিকারী মানুষের মুখ সে ত আগে আর কখনো দেখেনি।

তরুণ মেয়েটির তীক্ষ্ণ চাহনির উত্তরে নিজে তীক্ষ্ণতর ভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কে বটে?

এক ইঞ্চিও না নড়ে ও উত্তর দিলে, আমি কোসটার মেয়ে। আর, তুমি কে বটে?

ও ব্যঙ্গ-ভরে আরও বললে, তুমি কি পোষমানা,—খুব পোষমানা একটা ভাল্লুক কেনবার জন্যে এখানে এসেছ? এমন পোষমানা ভাল্লুক যে তোমার ডাক শোনামাত্র নাচতে আরম্ভ করবে?

তরুণ উত্তর দিলে, তুমি যে জানোয়ারকে পোষ মানিয়েছ, তেমনি কোন জানোয়ারের প্রয়োজন আমার নেই। আমার ভাল্লুক দরকার হলে, আমি সোজা বনে গিয়ে খালি হাতে তার গর্তের মধ্যে হাজির হই।

কিছুক্ষণ পরে সে কথা বলতে বলতে চোখ দুটি পিটপিট করে আবার শুরু

করলে, তাহলে, তুমিই হচ্ছ মার্গারিটা? কোসটার মেয়ে, কি বল, তুমিই মার্গারিটা? সেই চেকজাতীয় মেয়েমানুষটা তোমার মা? আরে,—আরে! বেশ তবে শোন, আমার নাম পেট্রাককিও, উরস্থর ছেলে। আর আমি এসেছি প্রতিশোধ নিতে। তোমার বাবা কোথায়?

মার্গারিটা ঝগড়ার কাহিনীটা জানত,—ভালভাবেই জানত। ও আরও জানত যে, তার বাবা 'দোক্রজা' অঞ্চলে এক মাসের ওপর কাটিয়ে সবেমাত্র কাল রাত্তিরে ফিরে এসেছে। ও এ খবরটা পেট্রাককিওকে বলে আশ্বস্ত করতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে ও এদিকে ওদিকে মাথা নেড়ে দাঁতের পাটির মধ্যে দিয়ে হিস্-হিস্ শব্দ করে ছেলেটির দিকে ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল, বললে, তুমি আরও কুড়ি বছর অপেক্ষা কর না কেন? তখন আমার বাবা খোঁড়া আর অন্ধ হয়ে যাবে, আর তখন তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এস। উরস্থর বেটা, তুমি এমন লড়াই চাও কেন? লড়াই ত হবে দুজন বুড়ো মানুষের পরস্পরের সঙ্গে। তুমি লড়াই যদি করতে চাও, আমার সঙ্গে লড়াই কর না কেন?

—তোমার সঙ্গে? তুমি যে একটা মাদী-বাচ্চা।

চকিতে আগুন জ্বলে উঠল,—উত্তেজনায় ঝলসে উঠল মার্গারিটা। মুহূর্তের মধ্যে ওর তাঁবুতে গিয়ে আবার ফিরে এল। ফেরার সময় হাতে করে নিয়ে এল ওর চাবুক। ওর দেহটা যেন ইস্পাতের তৈরী, একখণ্ড স্প্রিং-এর মত শক্ত হয়ে উঠল।

তাহলে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা এই যে, তোমার সঙ্গে লড়াই করার যোগ্য আমি নই! বেশ, আমি যে কিসের যোগ্য, তা তোমাকে দেখাব।

কিছুদূরে একটা শক্ত গাছের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল একটি বড় বাদামী রঙের ভাল্লুক। কোমরের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওটা ঘোঁত ঘোঁত করছিল। কি যে ঘটল, পেট্রাককিও তা জানবার আগেই মার্গারিটা শিকলে একটা ঝটকা টান দিয়ে জানোয়ারটার নাক থেকে গোল আংটাটি ছিঁড়ে ফেললে। যন্ত্রণার জ্বালায় রক্তাক্ত ভাল্লুকটা ওর মাথা সজোরে আগে পিছে নাড়তে নাড়তে থাবা দিয়ে আঁচড়ে, লাথি মেরে মেয়েটিকে আক্রমণ করলে। মেয়েটির হাতে গরুর চামড়ার চাবুক ছাড়া আর কিছু অস্ত্র ছিল না। যখন জানোয়ারটা খুব কাছে এসে পড়েছে, তখন মার্গারিটা তার মাথার ওপর বারবার চাবুক দিয়ে আঘাত করতে লাগল, ওর হাত দুখানি পিসটনের দণ্ডের মত কাজ করতে লাগল।

ভাল্লুকও বারবার আক্রমণ করে তেড়ে এল, তবু মেয়েটি কিছুতেই হার মানলে না, জানোয়ারের মাথার ওপর চাবুকের পর চাবুক মেরেই চলল। শেষে জন্তুটা কাঁপতে কাঁপতে গাছের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলে।

তারপর মার্গারিটা বন্য উগ্রতার স্বরে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এখন আমার সঙ্গে লড়াই করবে?

ছেলেটি তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল; সে বললে, না, আমি একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়াই করি না।

—তার মানে, তুমি ভয় পেয়েছ। তুমি চাও একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে, নাঃ?

—ভয় পেয়েছি,—আমি? তুমি কি কখনো পেট্রাককিওর নাম শোননি? আমি তোমার একজন ভাই-এর সঙ্গে একাই লড়ব। একজন ভাই কেন, তোমাদের গুষ্ঠির সব লোকগুলোর সঙ্গেই লড়ব।

—আমাদের বস্তিতে কোন লোক নেই। কেবল বুড়ো বুড়ো মেয়েরা আছে। সাহস থাকে আমার সঙ্গে লড়বে, এস। এই দেখ, আমি লড়াই শুরু করে দিলুম।

এই কথা বলতে বলতে মার্গারিটা ছেলেটির মুখের ওপর শপাং করে চাবুক বসিয়ে দিলে।

ছেলেটির দেহে চকিতে জেগে উঠল যেন এক হাজার মৌমাছির হুল ফোটানোর জ্বালা। এ যেন এক দ্রুত-ঘুবন্ত চাকার গায়ে আগুন লাগার কাজ করল। এদিকে কি ঘটছে, তা বুঝতে পারার আগেই চাবুকটা আলগা হয়ে একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে মার্গারিটার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আর সে ধুলোর ওপর মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল। লোকে যেমন দাঁত-ফোটানো, বিষাক্ত সাপকে মোচড়াতে মোচড়াতে চেপে ধরে, তেমনিভাবে পেট্রাককিও ওর দুই কাঁধের মাঝখানে হাঁটু দিয়ে সজোরে মাটির ওপর ওকে চেপে ধরলে।

মেয়েটা ঘাড়ের ওপর একটা ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলার স্পর্শ যেন অনুভব করলে। তার মনে হল, এই বুঝি তার শেষ নিঃশ্বাস।

—সাপিনী, আমি তোমাকে জানে মারব না। কেন না, আমি মেয়েদের জান নিই না। আমি যে এখানে এসেছিলুম, এই খবরটা তোমার বাবা জানুক, —শুধু এইটুকু আমি চাই। তুমি নিশ্চয়ই তাকে বলবে। আর যাতে তুমি আমার কথা না ভোল, সেইজন্যে তোমার চুলের গোছাগুলো সঙ্গে নিয়ে যাব।

যখন মার্গারিটা মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তার বোধ হল, ছাড়া-পাওয়া ঘাড়ের ওপর দিয়ে যেন ঠাণ্ডা-শীতল হাওয়া বয়ে গেল। ইতিমধ্যে পেট্রাককিও ওর মাথার চুল কেটে নিয়ে লাফ দিয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে উঠে জোর কদমে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। ও তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গর্জাতে লাগল। হাত মুঠো করে নাড়তে নাড়তে মাটির ওপর পা ঠুকতে লাগল আর শয়তানকে এবং শয়তানের বাপকে সহস্র রকমের পীড়ন করবার পরিকল্পনা মনে-মনে গড়ে তুলতে লাগল।

ওই দিন রাত্রের মধ্যেই ও আব ওর বাবা কোসটা পেট্রাককিওদের এলাকায় বাজ পাখির মত ছুটে গিয়ে ওদের তুজনকে ধরে নিজেদের তাঁবুতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে আনবে আর নাচ শেখাবে। আঃ, পেট্রাককিওকে তার শয়তানির জন্যে দারুণ দাম দিতে হবে। মার্গারিটা তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে তার ওপরের ঠোঁট ছেঁদা করে রিং পরিয়ে দেবে! তারপর তাকে নানা খেলা শেখাবে—যেমন ও ভাল্লুকদের ক্ষেত্রে করে থাকে।

তারপরে—আঃ, তারপরে—সে জানতে পারবে মার্গারিটা কে! ও ওদের তাঁবুর ভেতরে ছুটে ফিরে গেল, ওর বাপের দেওয়া, রূপোর হাতল-আঁটা আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে আবার চিৎকার করে উঠল। এ কি! শয়তান যে ওর মাথার চুল কেটে নিয়ে চলে গেছে! কি নীচ, কি কাপুরুষ! হা পোড়া কপাল, মার্গারিটাকে জানে মেরে ফেললে যে এব চেয়ে ঢের ভাল কাজ করা হত!

এখন—এ ব্যাপারের পর কেমন করে ও গোষ্ঠীর লোকদের কাছে নিজের মুখ দেখাবে? অপরে যাতে ওর মুখ দেখতে না পায়—তার জন্যে সারা শীতকালটা ওকে যে ওদের কুঁড়ে ঘরের মধ্যে আটকে থাকতে হবে! আঃ, কেন সে আমাকে জানে মেরে রেখে গেল না! যাহোক, যে কু-কাম করেছে, তার দাম তাকে দিতে হবে। ওঃ, নিশ্চয়ই দিতে হবে।—ও আশপাশের কুকুরগুলোকে এবং চরে-বেড়ানো ঘোড়াদের বেপরোয়া লাথি মারতে শুরু করলে। আর উত্তেজনাবশে ঝড়ো হাওয়ার মত তাঁবুর চালে গর্ত করে ফেলতে লাগল।

একটু পরে উন্মাদিনী প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশে তখুনি-তখুনি যাত্রা করার উত্তেজনায় বাপকে ডাক দেবার জন্যে শিঙায় ফুঁ দিলে। কিন্তু কিছুক্ষণ কেটে গেলে যখন ও কাছাকাছি একটা পর্বত থেকে বাপকে নীচে নামতে দেখতে পেলে, তখন কুঁড়ে ঘরের মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল। তারপর মাথায় একটা 'ব্যাসমা' অর্থাৎ

রঙিন শাল জড়িয়ে বাইরে এসে কোসটার সামনে দাঁড়িয়ে ভান করলে যে, ও খুব মনমরা বোধ করছিল, তাই বাবাকে ডাকছিল। পেট্রোকিকিওর হামলার কথা আদৌ উল্লেখ করলে না। কোসটা জিজ্ঞাসা করলে, খুকু, তুমি মাথায় 'ব্যাসমা' চড়িয়েছ কেন?

—আমার চুলগুলোয় সাবান দিয়েছিলুম, বাবা।

—মার্গারিটা, তুমি আমায় ডাকছিলে কেন? কি চাই তোমার? ওহো, এখানে এই যে ভাল্লুকটার 'ক হয়েছে? আবার এর বাঁধনও আলগা হয়ে রয়েছে, দেখছি। শয়তানের বাচ্চাদের যত সব কাণ্ড! মার্গারিটা, তুমি এতক্ষণ কি করছিলে?

—ওঃ, ভাল্লুকটার কথা ছেড়ে দাও। ও আবার বিড়াল-বাচ্চার মত হয়ে গেছে। ওর কথা ছেড়ে দাও, বাবা। তুমি এখন আর আগের মত সত্যিকার জোরালো ভাল্লুক ধরে আন না কেন? এবার কিন্তু বসন্তকাল এলেই আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাব।

—বেশ ত! তবে ভাল্লুকটার কি হয়েছে, শুনি না। ও কি তোমায় ঠেলা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল? ভাল্লুকটার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে—সেই ভয়ে কি তুমি আমাকে ডাকছিলে? শয়তানী, স্পষ্ট করে কথা বলছ না কেন?

—কি, আমি ভয় পেয়েছি? এই দেখো।

এই কথা বলে ও ভাল্লুকটার খুব কাছে গিয়ে হাজির হল।

—তবে তুমি আমাকে ডাকাডাকি শুরু করেছিলে কেন?

—আমি কি চাইছি, জানো?—তুমি আমাকে শহরে সঙ্গে করে নিয়ে চল, বাবা।

—আরে, আরে, সে ত অন্য কথা। যাক্, চল তবে। এখন শেখানোর কাজ বন্ধ থাক্। ফিরে এসে যাহোক করা যাবে। শহরে যাবার জন্যে তৈরী হও। তোমার ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগাবার পর আমার ঘোড়ার মুখে লাগাও, মার্গারিটা।

কথা বলতে বলতে কোসটা ভাল্লুকটার নাকের বাঁধন আঁট করে ওটাকে পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

—এই হচ্ছে মেয়েদের কাণ্ড! দরকারের সময় মেয়েরা সবাই একরকম। ওদের পায়ের পাতায় যেন জলুনি ধরে! ওরা ঘোরাফেরা করতে কত যে ভালবাসে। আমাদের রিটাও অন্য মেয়েদের মত হয়েছে, দেখছি।

কোসটা হাতের কাজ শেষ করতে-করতে বিড়বিড় করে আপন মনে বকতে লাগল।

বাপ বা বেটি—কেউই তেমন বাকপটু ছিল না। নিরালার প্রভাবে মানুষের মনে জন্মায় চুপচাপ ভাব। বাপের ঘোড়ার পেছনে-পেছনে মার্গারিটা তার ছোট ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে তার মনে জেগে উঠল পেট্রাককিওর ভাবনা। নিশ্চয়ই একজন সত্যিকার মরদ বটেক! কিন্তু সে নিজে? সেও কি একজন বীর রমণী? ওঃ, কি অদ্ভুতভাবে ও তার হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়েছিল, আর তাকে মাটির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কাজটা এত হঠাৎ এবং এত বিদ্যুদ্‌বেগে করেছিল যে, মার্গারিটা বোঝবার মত বিন্দুমাত্র সময় পায়নি।

কিন্তু ওর মনে হচ্ছিল, এখনো ও যেন পেট্রাককিওর হাতের মুঠোর চাপ নিজের হাতের ওপর বেশ অনুভব করছে। অনুভব করছে ওর কাঁধের মাঝখানে তার হাঁটুর কঠিন স্পর্শ আর তার দয়ার শিকার হয়ে মাটিতে পড়ে থাকার সময় কথা কাটাকাটির ফাঁকে-ফাঁকে ওর গরম নিঃশ্বাসের ছোঁয়া।

সে বলেছিল, নাগিন, আমি মেয়েদের জানে মারি না। আমি শুধু এইটুকু চাই, এখানে যে এসে হাজির হয়েছিলুম, সেই খবর তোমার বাবা জানুক।

হাঁ, এই ত বীরবাহাদুরের কথা! তবে ও ছাড়বে না, তার সঙ্গে লড়াই করবেই,—একলা-একলা লড়বে। ও তাকে পোষ মানাবেই। কিন্তু ভাল্লুককে যেভাবে পোষ মানানো হয়, সে রকমভাবে নয়। ওটা ঠিক কাজ হবে না। যা হোক, সে একটা মরদ, একটা বাহাদুর বটেক।

ও গ্রাম্য শহরের হাটে গিয়ে পৌঁছবার আগেই সকালবেলার ঘটনাটা আগাগোড়া মনে-মনে ভেবে দেখেছিল আর দুজনের পরস্পরের আচরণ হুঁশিয়ার হয়ে বিবেচনা করেছিল। নিজের আচরণ সম্বন্ধে নিজেকে ধিক্কার দেবার মত কিছুই ওর চোখে পড়েনি। যা উচিত ছিল, তা-ই মাত্র ও করেছে! আর সে? সে ত···সে ত! তার উচিত ছিল, মার্গারিটাকে স্রেফ জানে মেরে ফেলা। না, না! বাহাদুরকা কাম তা ত হত না। বরং ওর মাথার চুল কেটে নিয়ে ওকে অপমান করে ওর বাপকে উত্তেজিত করাই আরো ঠিক কাজ—আরো বাহাদুরির কাজ হয়েছে।

সরাইখানার সামনের গাছটায় ঘোড়া দুটোকে বাঁধবার সময় মার্গারিটা

আগে থেকে মনে মনে তার সম্বন্ধে বিবেচনা বেশ সাবধানে শেষ করে ফেলেছিল। ও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, পেট্রাককিও একজন সত্যিকার বীর!

তবে বাপকে আজকের ঘটনা সম্বন্ধে একটাও কথা বলার প্রয়োজন নেই। ওসব ব্যাপারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেবে। যা কিছু করবে, একলাই করবে। উরস্থর সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে কোসটার মনে একটা রাগ পোষা আছে। সে ত বাবার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। পেট্রাককিওর বিরুদ্ধে ওর যে পোষা রাগ, এ ত স্বতন্ত্র বস্তু।

—হোয়া, হোয়া, কে এখানে এসে গেছে, দেখো, দেখো।

কতকগুলি কিসান কোসটাকে সরাইখানায় উপস্থিত হতে দেখে চেঁচামেচি শুরু করে দিলে।

সরাইখানার মালিক মার্গারিটাকে দেখে বলে উঠল, এস, ফ্যাটাম্যায়ার, ভেতরে এস। তোমার চোখদুটি আমাদের দেখতে দাও।

সঙ্গে-সঙ্গে গ্রাম-শহরের পুরোহিতমশাই সে কথা অনুমোদন করলে। তারপর মার্গারিটার হাতে একটা চিমটি কাটবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলে, ফ্যাটাম্যায়ার, এখনো ভাল্লুকছানাগুলোকে পোষ মানিয়ে নানা কলাকৌশল শেখাচ্ছ?

কোসটা চিৎকার করে উঠল, ভাল্লুকছানা? ভাল্লুকছানা কি রকম? আর ছানাপোনা নয়, ও এখন আমার মতনই সবচেয়ে বুনো ধাড়ী জানোয়ারকেই পোষ মানাতে পারে।

চকিতে বাপ মেয়ের সম্বন্ধে খুব গর্ব অনুভব করে আরো বলতে লাগল, আমার মতন কি? আমি বলছি, আমার চেয়েও বেশ ভালভাবেই ও এ কাজ করতে পারে। ও এখন এই সরাইখানায় সব মরদদের পাশে একসঙ্গে বসতে পারে। শুধু সরাইখানাতেই বা কেন? যে-কোন জায়গায়। আয়, মার্গারিটা, আমার পাশে এসে বস্। ওহে কেলিন, সরাইখানার মালিক,—হাত সাফাই-এর কাজে ওস্তাদ মালিক, শোন, গেলাস নিয়ে এস,—বড়-বড় গেলাস, হাঙ্গেরী দেশের চালে। আমাদের প্রত্যেকের জন্যে—আমার মেয়ের জন্যেও। বুঝেছ?

তারপর মার্গারিটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, তুই কি গান শুনবি? আমি কি ইয়াঙ্কু লটারু বা অপর কোন ভাল গাইয়ে—যাকে তোর পছন্দ হয়, তাকে আনাবার জন্যে লোক পাঠাব? কি বলছিস্,—নাঃ? আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা ইচ্ছে করবি, তা-ই হবে।

সরাইখানার মালিক কেলিন গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বললে, জানলে ওস্তাদ, মাত্র এক ঘণ্টা আর কি, এক ঘণ্টা আগে উরস্থ এখান থেকে চলে গেছে।

কোসটা রাগে গরম হয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠল, তুমি ওসব খবর আমাকে বলছ কেন ? আমি কি তোমার কাছে কখনো ওর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছি ?

সরাইমালিক বললে, না ভাই কোসটা। তবে পাহাড়ী অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে ওকে একটা সাপে কামড়েছিল। ওর এক পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলতে হয়েছে। ওর ডান পাটা হয়ত আর ফিরে পাবে না। এত তাড়াতাড়ি ফুলে উঠছে ! হয়ত ও চিরদিনের মত খোঁড়া হয়ে যাবে।

সমবেত কিসানেরা আরো খবর জানার জন্যে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তা-ই নাকি ? আরো খবর বল, কেলিন ভাই। আর কি তুমি জান ?

মালিক জবাব দিলে, মাত্র ওইটুকুই আমি জানি। খানিকটা খাঁটি ব্র্যাণ্ডি ও আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গেল। শেষ সময়ে হাতের কাছে ব্র্যাণ্ডি রাখা ভাল। উরস্থকে বেশ বুড়ুটে আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ও যেন শিলা-বৃষ্টি হবার পর গাছের ডালপালা যেমন হয়, তেমনি হয়ে গেছে।

—আচ্ছা কেলিন, ও ত অন্য কথা।

কোসটা আবার বসে পড়ে তার লম্বা দাড়ির চুলের প্রান্ত কামড়াতে কামড়াতে বিড়বিড় করে বললে। ও যখন ভয়ংকর রাগ দমন করে রাখতে বাধ্য হয়, তখন এমনিধারা অশান্তভাবে দাড়ির প্রান্ত কামড়াতে থাকে।

এরপর ও জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ, কি বলছিলে, কেলিন ? ও সারাজীবন খোঁড়া হয়ে থাকবে ?

—আমার ত ভাই মনে হচ্ছে।

বাপের সঙ্গে মেয়ের চোখাচোখি হল। মার্গারিটা জানত, ওর বাপ উরস্থকে কি ভয়ংকরভাবে ঘৃণা করে। বাপ ওর দিকে চাইতেই ও সবকিছু বুঝতে পারলে। প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে ওর বাপ আজ বঞ্চিত হয়ে পড়ল। একজন খোঁড়া লোকের সঙ্গে ত আর তার মত মরদ যুদ্ধ করতে পারে না। কোসটা কিন্তু মেয়ের চোখের চাহনির অর্থ বুঝতে পারেনি। সে তখন মানুষ, ভাল্লুক আর নিজের জীবনের বিরুদ্ধে রাগ ও ক্ষোভের প্রকোপে অন্ধ হয়ে পড়েছিল। তার কাছে কিছুদিন ধরে জীবনটা বোধ হচ্ছিল ভয়ানক শান্ত এবং গতানুগতিক। চারপাশের মানুষগুলো সব নির্জীব,—ভাল্লুকগুলোও তা-ই। কোথাও লড়াইয়ের কোন ডাক নেই। নেকড়ের আক্রমণ নেই। ডাকাতদলের সঙ্গে মোকাবিলা করার সুযোগ

ঘটছে না। কোন স্ত্রীলোককে চুরি করার ঘটনার কথা শোনা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় তার জীবনে একমাত্র আগ্রহ ছিল—একটিমাত্র মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। এখন সে আশাও নির্মূল হল—সেই মানুষটিই হয়ে পড়ল খোঁড়া।

—উরস্থর জোয়ান ছেলেটি বেশ চমৎকার হয়েছে।

পুরুতমশাই মার্গারিটার দিকে তাকিয়ে এবং অন্যান্য লোকেদের দিকে পিট-পিট করে চোখ ফেলতে-ফেলতে বলে চলল, সত্যি ছেলেটা হয়েছে ওর বাপের চেয়েও বড় শিকারী।

কোসটা জবাব দিলে, সে আর এমন কি কথা!

অপর সকলে জিপসী কোসটার ব্যঙ্গ-ভরা কথা শুনে তার পাঁজরের হাড়ে টোকা মেরে হাসতে লাগল। পুরুতমশাই ব্যাখ্যা করে বলতে লাগল, না, না, হাসির কথা নয়। ছেলেটা এই বয়সেই এমন পালোয়ান হয়ে উঠেছে যে, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ওর জোড়া মেলে না। শান্ত অথচ শক্তিমান, আবার প্রকৃতিও সৎ। শুধু ভাল্লুক নয়, ও যে-কোন মানুষকেও কাবু করে ফেলতে পারে।

পুরুতমশাই কদাচিৎ লোকের কাছে উল্লেখ করত যে, সে নিজে একজন ভাল্লুক-শিকারীর সন্তান। এখন স্পষ্টই বোঝা গেল, ভাল্লুকশিকারী পেট্রাককিও তার খুব প্রিয়।

কোসটা বললে, আচ্ছা, তা যেন হল। কিন্তু আমি একটা সোনার মোহর বাজি রাখছি, আমাব মেয়ে মার্গারিটা ওই ছোঁড়াটাকে তুলে আছড়ে ফেলে দেবার ক্ষমতা রাখে।

—না, না, না!

কোসটার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই আপত্তি জানিয়ে হৈ-চৈ করে উঠল।

—আমি একশটা সোনার মোহর বাজি রাখছি।

পুরুতমশাই চিৎকার করে উঠল, একশ ছেড়ে হাজার মোহর বাজি রাখ না কেন, কোসটা। আমার চেয়ে বেশী ভাল করে ছেলেটাকে কেউ জানে না। ও কোন মেয়ের সঙ্গে লড়াই করে না।

—বটে। আমি তোমাকে বলছি, শোন। আমার মেয়ে যে-কোন পুরুষ বাচ্চাকে তুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

নেশার ঘোরে কোসটা তর্ক করে যেতে লাগল। মদপানকারী হিসাবে তার

বদনাম ছিল। কয়েক পাত্র মদ খাবার পর সে ভয়ংকর ঝগড়াটে ও হুল্লোড়ে হয়ে পড়ত।

একজন বুড়ো কিসান মদের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়বার সময় বললে, যাহোক, কেলিন, এটা কিন্তু তোমার দোষ। তুমি এমন একজন লোকের খবর দিলে, যার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের আগ্রহ নেই।

কোসটা নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে বক্তাকে অনুমোদন করে বলতে লাগল, হাঁ, এই ত ঠিক কথা, মিরনভাই ঠিক কথা বলেছে। এখানে আমি এসেছি মদ খেতে; একটু গান শুনতে; বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজোব করতে আর আমার মেয়েকে খুশী রাখতে। কেলিন আমাকে কিনা বলার মতন আর কোন কথা পেলে না। বললে কি, না উরস্থ এখান থেকে চলে গেছে। —আরে, এই নাও, এই মোহরটা ভাঙিয়ে তোমার পাওনা মিটিয়ে নাও। —আয়, আয় বিটী, চলে আয়। ভাইসব, তোমাদের শুক্রিয়া জানাচ্ছি।

অন্য কেউ বেরিয়ে যাবার আগেই কোসটা সরাইখানার বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

মার্গারিটা মুখ বুজে বাপের পেছনে-পেছনে ঘোড়ায় চেপে যেতে লাগল। একদল সোনালী সূর্যকিরণ ভেড়ার দলের মত হঠাৎ অন্ধকার চিরে কনকনে ঠাণ্ডা-ভরা রূপোলী পাহাড়ের চূড়োগুলির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মাঝে-মাঝে কোন ছুটে-যাওয়া জানোয়ারের পা লেগে কোন পাথরখণ্ড পাহাড়ের গা বেয়ে নীচেয় পড়ার সময় উপত্যকাকে তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনির শব্দে ভরিয়ে তুলছিল।

হঠাৎ কোসটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলে। এক গেলাস মদ খাবার পর সে সহজেই কেঁদে ফেলত। এটাই ছিল তার চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বলতা। তার কান্না শুনে মনে হত যেন, চারপাশের পর্বতগুলোও তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে তার সঙ্গে কাঁদতে শুরু করেছে।

মার্গারিটা ওর স্বপ্ন থেকে চকিতে জেগে উঠে ঘোড়াকে বেগে চালনা করলে।

—তুমি কেন বিশ বছর ধরে অপেক্ষা করে রইলে, বাবা?

ও বাবার দুঃখের কারণ কি তা জানত। তাই তিরস্কার করে বলে যেতে লাগল, আমার যদি এরকম কোন প্রতিহিংসা নেবার ব্যাপার থাকত, তাহলে আমি কিন্তু এত বেশী দিন অপেক্ষা করতুম না। দিনের দিনই প্রতিহিংসা নিতুম,—ঠিক সেইদিন না হয়ত বড়জোর পরের দিন।

কোসটার মুখ থেকে শব্দ যেন গুমরে উঠল, আঃ বিটি, বড় দুর্বচ্ছর যাচ্ছে রে। এ একটা ঘোর দুর্বচ্ছর! বউ চলে গেল। শিকার করতে গিয়ে মিলছে যত নির্জীব

ভাল্লুক-ছানা! তার ওপর উরস্থ খোঁড়া—খোঁড়া হয়ে পড়ল! হায়-হায়! বিটী, ওঃ হোঃ-হোঃ-হোঃ, বড়ই দুর্বচ্ছর রে!

মেয়ে পুনরায় তিরস্কারের সুরে বলতে লাগল, আজকাল তুমি একটাও তেমন জীবন্ত জানোয়ার ধরে আনতে পারছ না। এর কারণ কি? তুমি কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ? না, ভাল্লুকগুলো আর মানুষেরা সকলেই নির্জীব হয়ে পড়ছে? তুমি মেয়েমানুষের মতন কাঁদছ? শোন, পর্বতগুলোও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছে! এ যে বড় লজ্জার কথা, বাবা।

—আমি বুড়ো? কি বলছিস, আমি বুড়ো? তুই কি পাগলী হয়ে গেলি, বিটী? গত বছর ভাল্লুকগুলো নির্জীব ছিল। বড় বেশীদিন ধরে শীতকালটা যেতে চাইছিল না। কি বলব? বড় বেশীদিন ধরে। তারপর বউ চলে গেল। আর, উরস্থ খোঁড়া হয়ে পড়ল!

কথাগুলো বলতে বলতে বুড়ো মানুষটি পুনরায় ফুঁপিয়ে উঠল, বললে, পাহাড়-গুলোকে আমার সঙ্গে কাঁদতে দে; ওরা যে আমার মন বুঝতে পারে।

বাপ ও বেটী শেষে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এল। ইতিমধ্যে চারপাশ ঘন অন্ধকারে ভরে গেছল। গাদা-করা খড়ের ওপর কোসটা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

মার্গারিটা ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে জল খাইয়ে খাবার ধরে দিলে। তারপর আবার নিজের সম্বন্ধে ভাবনায় ওর মন ভরে গেল। ও নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে আঙ্গুলগুলি ছুঁইয়ে অনুভব করলে, সেখানে চমৎকার গোছা-গোছা চুল ছিল, তা সব কাটা হয়ে গেছে! পেট্রাককিওকে ওর মনে পড়ল। এমনভাবে বে-ইজ্জতি করার দরুন ও তাকে অভিশাপ দিতে লাগল।

ওর বোধ হল, তার ইস্পাত-কঠিন আঙুলগুলোর বজ্র-আঁটুনি যেন এখনো দেহের ওপর রয়েছে, তবু নিজেকে মুক্ত করার ইচ্ছে আদৌ জাগল না। কল্পনায় দেখতে পেলে, একটা সুদৃঢ় হাঁটু ওর কাঁধে নিঃশ্বাস-বন্ধ-করা ভাবে চাপ দিচ্ছে, তবু ঝটকা মেরে তা হটিয়ে দেবার বাসনা হল না। বরং মুখে সহস্র অভিশাপ আর চোখে ভয়ংকর রাগ-তপ্ত জল নিয়ে ও মনের দর্পণে দেখতে লাগল পেট্রাক-কিওর সুস্পষ্ট দীঘল গড়ন, চোখ দুটি চমৎকার টানা-টানা, ছোট-ছোট কানগুলো দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন আর সারা মুখখানিতে নাকে ও কপালে সাহস এবং স্থির সংকল্পের রেখা।

মার্গারিটার চোখে ঘুম এল না। সকালের ঘটনাকে পুনরায় বিচার-বিবেচনা করে দেখতে গিয়ে দুঃখে ওর বুক ভরে গেল, এই ভেবে যে, শয়তানটাকে যতবার

চাবুক মেরেছিল, তার চেয়ে বেশী বার মারলে না কেন ? তাহলে যে অনেক ভাল হত। তার এইটুকু জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল যে, কোসটার মেয়েটা একটা খেলনার জিনিস নয়। তারপর সে হয়ত তাদের বাসায় ফিরে যেত আর দেখতে পেত, তার বাবা সেখানে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। পেট্রাককিও হয়ত মার্গারিটাকে দেখবার লোভে আবার আসত। কাজটা খুব ভাল হত, যদি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যেত যে, কোসটার মেয়েকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা সম্ভব নয়। ওর উচিত ছিল, হাতের চাবুক আরো তাড়াতাড়ি ব্যবহার করা। তা করলে হয়ত ওর কত সাধের লম্বা-লম্বা চুলের গোছাগুলো রক্ষা পেয়ে যেত।

ছেলেটা যখন ওর হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে ওকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তের ঘটনাগুলোকে ও স্মরণে আনবার চেষ্টা করলে। ভাবতে ভাবতে ওর দৃঢ় বিশ্বাস হল, ছেলেটা শক্তিমান,—সত্যিই শক্তিমান মরদ। ওই সময়ে সে মার্গারিটাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারত। ইচ্ছে করলে ওকে মেরেই ফেলতে পারত।

মার্গারিটা তখন নিজেদের তাঁবুর সামনের জমিতে বসেছিল। হঠাৎ দূর থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। ও কান পেতে রইল। যখন নিশ্চয় করে বুঝতে পারলে যে, ঘোড়-সওয়ার লোকটি ওদের বস্তির এলাকার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ থেমে গেল। একটা কুকুর সহসা চিৎকার করে উঠল। তারপর ও একটা টানা, তীক্ষ্ণ শিশ্ দেওয়া আওয়াজ শুনতে পেলে। মার্গারিটার কান সে রকম আওয়াজের তাৎপর্য বুঝতে অভ্যস্ত ছিল। ও শীঘ্রই বুঝতে পারলে, চারপাশে চেস্টনাট গাছে-গাছে পাখিরা বিপদের ভয় করছে। কাঠবিড়ালীর ছোটাছুটি করা দেখে জানতে পারলে যে, আক্রমণকারী মোটামুটি তাঁবুর কাছেই এসে পড়েছে।

আবার কুকুরটা ডেকে উঠল। শুধু একটা ছোট্ট, তীক্ষ্ণ ডাক। তারপরে আর সাড়া-শব্দ নেই। কে যেন তার সামনে এক টুকরো কাঁচা মাংস ছুঁড়ে দিয়েছে। টুকরোটা মাটিতে পড়বার সময় ধুপ করে যে আওয়াজ হল, তা সে শুনতে পেলে। তারপর কে যেন খুব কাছ থেকে আস্তে আস্তে শিশ্ দিলে। মার্গারিটা উল্লাসভরে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না। এ যে পেট্রাককিও ! ও সত্যিই একটা বীরবাহাদুর ছেলে ! আর সে ওকে পোষ মানাচ্ছে ! এ যেন সেই ভাল্লুকদের পোষ মানাবার সময়ের আনন্দ, আর তার সঙ্গে হাজার রকমের নতুন-নতুন উল্লাসের চমক।

মার্গারিটা তার কাটা চুলের শোক ভুলে গেল। ওতে কি আর এমন এসে গেছে—যখন এই অন্তহীন, অজানা আনন্দের সঙ্গে তুলনা করা যায় ? সে বাহাদুর ছেলেটার কাছে ছুটে গিয়ে কথা বলবার জন্যে বুকের মধ্যে আবেগ অনুভব করলে। কিন্তু আরো শক্তিশালী একটা আবেগ তাকে সংযত করে রাখলে। সে যদি চুপ করে বসে পোষ মানাবার কাজটা লক্ষ করতে থাকে, তাহলে যে আরো প্রবলতর উল্লাস ভোগ করতে পারবে! এ যেন আনন্দভোগকে দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশে ভাল মদ কম পরিমাণে বারবার গিলে খাবার মত।

শিশ্ দেওয়ার শব্দ বারবার তার কানে এল। প্রত্যেকবারই মনে হল তীক্ষ্ণ শব্দটা যেন এক অজানা সুরের ধ্বনি। সবচেয়ে ভয়ংকর ভাল্লুককে পোষ মানাতে গিয়ে জানোয়ারের মুখ থেকে যে উগ্রতম গর্জন বার হয়, তার সঙ্গে কি এর তুলনা হতে পারে ? ও অর্থাৎ পেট্রাককিও সত্যিই যে একজন মরদের মত মরদ, আর সে ওকে পোষ মানাবার চেষ্টা করছে। গরুর চামড়ার কোন চাবুক নেই। ভাল্লুককে জোর করে নাচাবার জন্যে একখণ্ড লোহার পাত আর রাঙা ডগডগে আগুন-ভরা যে কয়লা দরকার হয়, তা নেই। না, না, এ যে অন্য এক অস্ত্র—এমন অস্ত্র যা চোখ দিয়ে দেখা যায় না। বরং আরো তীক্ষ্ণতর,—আরো শক্তিশালী। তার ইচ্ছে হল, আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে রাখলে। এই নিস্তব্ধতার চাপে অস্ত্র যেন আরো ধারালো হয়ে উঠল। তার চেয়েও বেশী। এ যে সত্যি এক সত্যিকার অস্ত্র!

তাঁবুর মাথার ওপর ক্যামবিসের বুকে ছোট-ছোট ফাঁক থেকে ভোরের আলো উঁকি মারতে লাগল। শিকারমত্ত পেঁচার শেষ কয়েকটি কর্কশ ডাক। তারপর বুনো, রঙিন 'ফেজনট' পাখির 'ক্লিক ক্লিক' আওয়াজ জানান দিলে যে, বাগানের উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে একজন লাল-মুখ তরুণের মতন সূর্যটা পর্বতের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি মারতে শুরু করেছে। ও অর্থাৎ পেট্রাককিও তাকে যে ডাকছে! হাঁ, ও তাকে ডাকছে। কিন্তু সে ত কোন উত্তর দেবে না।

তারপর ছুটে এল 'ওহো, ওহো' শব্দের শেষ অনুনয়। শব্দটা আসছে মার্গারিটার তাঁবুর পেছন থেকেই। এরপর কিছুক্ষণ ধরে সব চুপচাপ। তারও পরে ? তারপরে উপত্যকার মধ্যে অনেক কিছু ডাক-ডাকনির আওয়াজ ওঠবার আগেই একটা চলে-যাওয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ মার্গারিটার কানে এল। ক্লান্ত, তপ্ত সে ঘুমিয়ে পড়ল।

—হো, হো,—হো-ও।

তাঁবুর বাইরে বাবার গলার আওয়াজ শুনে সে হঠাৎ চোখ মেলে জেগে উঠল। কোসটা বলতে লাগল, সূর্য ত হাঙ্গারী দেশের দিকে ঢলে পড়েছে, আর তুই এখনো ঘুমুচ্ছিস ? কাল রাত্তিরের মদটা কি তোর কাছে খুব কড়া লেগেছিল ?

—হাঁ। না, না, টাটুকা। আমাকে ঘুমুতে দাও। আমি একটু ঘুমুতে চাই। আমার মাথা ব্যথা করছে।

—তার কারণ হচ্ছে, তুমি যে বারবার মাথা ধুয়ে মর।

চলে যাবার আগে বাপ উত্তর দিলে। তারপর নিজেব মনে বিড়বিড় করে বললে, সময় হলে মেয়েরা সবাই ওই রকম।

মার্গারিটা শুনতে পেলে, সন্ধ্যে হবাব আগে পর্যন্ত তার বাপ কয়েকবার তার তাঁবুর কাছে ঘুরে গেল। কিন্তু সে এমন ভাব দেখালে যে, সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বাপ একসময়ে মেয়ের খাটের কাছে কিছু খাবার রেখে গেল। কিন্তু সত্যিকার একটা ভাল্লুককে একটানা পোষ মানাবার সময়ে যেমন বোধ করত, তেমনই এ সময়েও মেয়ের কিছু খেতে ইচ্ছে হল না। শুধু ভয়ংকর জলতেষ্টা।

সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে মার্গারিটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনার আশায় কান পেতে রইল। কিন্তু কিছু শুনতে পেলে না। গতকালের উল্লাসের চেয়ে আরো তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল এখনকার যন্ত্রণা। সে অপেক্ষা করে বইল, মাঝরাত পর্যন্ত কোন কিছু শব্দ শোনা গেল না। শেষে তাঁবুব বাইরে এসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে।

পায়ের কাছে পড়েছিল তার চাবুকটা—এতদিন বছরের পর বছর ধরে এই চাবুকের ওপর তার কত-না বিশ্বাস ছিল। আজ সে চাবুকটাকে ঘৃণা করতে শুরু করলে। তার মনে হল, এটা যেন ছোট ছেলের একটা খেলনার মতন অকেজো।

কান পেতে অপেক্ষা করতে করতে অনেকগুলো ক্লান্তিভরা ঘণ্টা কেটে গেল। সে জোরে জোরে লম্বা-টানা শিশ্ দিতে লাগল। সেই শব্দ প্রতিধ্বনি তুললে এক পাহাড়ের গা থেকে আর-এক পাহাড়ের গা পর্যন্ত। তারপর আবার সে ধ্বনি ফিরে এল। শেষে দূরের কোন জিপসী বস্তিতে গিয়ে তা থেমে যেতে লাগল। এ যেন কোন বন্য পশুর ডাক।

সে চুপচাপ আরো অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবে রইল। তার ডাকের কোন জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু যখন পরের দিন ভোরবেলা তার তাঁবুর পর্দা তুললে, দেখতে পেলে, তার খাটের কাছে দু-গোছা চুল পড়ে বয়েছে।

পরম বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে বাক্যহীন মার্গারিটা পাগলের মত এক এক হাতে

এক গোছা করে চুল তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। তাকে দেখতে পাবার মত কেউ কোথাও ছিল না ; কুকুরটা শান্তভাবে খাবার চেটে চেটে খাচ্ছিল। মেয়েটা মাতালের মত তাকাতে তাকাতে চারপাশটা দেখে নিলে। অদম্য রাগের বশে হঠাৎ চাবুকের খোঁজে ভেতরে গেল এবং ফিরে এসে চামড়ার ফিতেগুলো দিয়ে কুকুরটাকে সপাসপ মারতে লাগল।

—হা-হা, কেমন লাগছে? তুমি চোরদের খুশিমত আর আসতে দেবে? দেবে? হা-হা-হা! এই নাও আর এক ঘা। আবার নাও এক ঘা।

—কুকুরটাকে তুমি মারছ কেন?

কোসটা ওর তাঁবু থেকে বার হয়ে এসে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে। কুকুরের কাতরানির চোটে ওর ঘুম ভেঙে গেছল।

—কেন মারছি? কেন? তার কারণ এই দেখ। দেখছ আমার চুলের দিকে? যখন ঘুমুচ্ছিলুম, একজন লোক আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে চুল কেটে নিয়ে চলে গেছে। আর ও কিনা তিলমাত্র নড়েনি,—একটা চিৎকার পর্যন্ত করেনি। কিচ্ছু করেনি, বাবা!

কোসটা চিৎকার করে উঠল, কি? কি হয়েছে? কে এ কাজ করলে? কে করলে? উরস্থ খোঁড়া হয়ে গেছে—যদি এ খবর না জানতুম, তাহলে দেখতে কি ঘটত আজ! মার্গারিটা আবাগী, বল্, কে এ কাজ করতে পারে? আমি তার খোঁজে দুনিয়ার শেষ কিনারা পর্যন্ত গিয়ে হাজির হব।

—একটা চোর, বাবা। একটা ভীরু, কাপুরুষ। জঘন্য কাপুরুষ। দিনের আলোয় সে আমার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পায় নি।

মার্গারিটা গলার আওয়াজ শেষ পরদায় চড়িয়ে চিৎকার করে উঠল। সে জানত, পেট্রাকিও কাছাকাছি কোথাও রয়েছে এবং তার সব কথা শুনতে পাচ্ছে।

কোসটা তিলমাত্র দেরি না করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।। দূরে চলে যাবার আগে শুধু বললে, সেই চোরটা, সেই কাপুরুষটাকে খুঁজে বার না করে ফিরে আসব না।

কোসটা অদৃশ্য হয়ে যাবামাত্র পেট্রাকিও সামনে এসে দাঁড়াল ; মেয়েটির পেছন দিকে কয়েক পা দূরে একটা গাছের আড়ালে ও লুকিয়েছিল।

—আচ্ছা, কিছুক্ষণ আগে তুমি আমাকে ডাকছিলে—শুনতে পেলুম। তাই ঈগল পাখির মতন জোরসে ছুটে এসে হাজির হয়েছি৭ আর তোমার তাঁবুর

মাথার ফাঁক দিয়ে তোমার খাটের ওপর তোমার চুলের গোছাগুলো ফেলে দিয়েছি। তুমি আমায় কেন ডাকছিলে, বলত।

—তোমাকে ডাকছিলুম? আমি তোমাকে ডাকছিলুম?

—আমি তোমার শিশ্ শুনতে পাচ্ছিলুম যে!

—ও ত কুকুরের জন্যে দিচ্ছিলুম।

পেট্রাককিও কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, যা বলছ, তা-ই হয়ত সত্যি। আচ্ছা, বেশ, তাহলে আমি এখন যেতে পারি। শোন, কোসটার মেয়ে, আমি যা তোমার কাছ থেকে একদিন নিয়ে গেছলুম, তা ফেরত দিয়ে গেলুম।

ও তাকে ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করতে করতে আরো বললে, আমার ভয় হয়েছিল, তোমার বাবা হয়ত চুলের জন্যে তোমাকে মারধর করবে। যাক্, আমি দুঃখিত, জানলে?

—আমি কি তোমার কাছ থেকে চুল ফেরত চেয়েছিলুম? না, তা চাইনি।

মেয়েটির দিকে না চেয়ে ও ব্যঙ্গ-ভরে বললে, আমার মনে হয়েছিল, তুমি হয়ত ফিরে চাইছ। তাই এখান দিয়ে যাবার সময় তোমার তাঁবুর মধ্যে ওগুলো ফেলে দিয়েছিলুম।

—তুমি মিছে কথা বলছ। তুমি চুলগুলো ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিলে।

মার্গারিটা উত্তর দিলে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে বুকে একটা ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলে এই দেখে যে, তার চাবুকটা ওর মুখের ওপর সেদিন আঘাত করে বেশ গভীর একটা কাটা দাগ করে ফেলেছে।

ইতিমধ্যে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে পরস্পরকে দেখে নিলে। একদিন আগে ওর ইস্পাত-দৃঢ় বজ্রমুঠির চাপের চেয়ে বেশী জোরালো আকর্ষণ যেন ওর চোখের ঝলকানি মেয়েটার চোখদুটিকে আকৃষ্ট করে রাখলে। এদিকে লাফাতে লাফাতে ছুটে-আসা ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমে কাছ থেকে আরো কাছে শোনা যাচ্ছিল। মেয়েটি বুঝতে পারলে, তার বাবা ফিরে আসছে। সে পেট্রাককিওর দিকে আবার তাকালে। ছেলেটিও ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। ইতিমধ্যে কোসটা হয়ত বস্তির এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, মার্গারিটার মত সেও এ কথা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তবু ও এক-পাও নড়ল না। ও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মার্গারিটার দিকে। যখন কোসটার গলার শব্দ শুনতে পাওয়া

গেল, অথচ ছেলেটা গাছের সারির পেছনে লুকোবার উদ্দেশে পালিয়ে গেল না, মার্গারিটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছেলেটাকে বললে, লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়, ভগবানের দোহাই ! বাবা যে এসে পড়ল !

পেট্রাককিও গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে শান্তভাবে বললে, রবিবারে সরাইখানায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, বুঝলে ?

তারপর ভাল্লুকশিকারীর মেয়ে যে গাছে একটা ভাল্লুক চেন দিয়ে বাঁধা ছিল, তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় অনুভব করলে, সে নিজে যেন হয়ে পড়েছে একটা পোষ-মানা ভাল্লুক, অথবা একজন শিক্ষক যে সত্যিকার জীবন্ত একটা ভাল্লুকের কাছে পোষ মেনেছে—পোষ মেনেছে মনিবের ইচ্ছেমত খেলা দেখাবার জন্যে। তবু তার মনের কোণে দুঃখের সীমা ছিল না। সে ভাবছিল, আজ থেকে রবিবার ! এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে যে, অনেকগুলো লম্বা দিন আর লম্বা রাত !

॥ ককেশাসের বন্দী ॥

॥ লিও নিকোলায়েভিচ টলসটয়-এর লেখা ॥

[আজ পর্যন্ত মাত্র কয়েকজন মহান্ কথাশিল্পী সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলে খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাশিয়া দেশের লিও নিকোলায়েভিচ টলসটয় হচ্ছেন একজন। হয়ত তিনিই প্রধানতম। এই বইখানির লেখকদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র ফরাসী দেশের অনরা ছ বালজাককে তাঁর সমকক্ষ সাহিত্যরথী বলা যেতে পারে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার 'তুলা' প্রদেশে রাজপরিবারের আত্মীয় এক জমিদার বংশে তাঁর জন্ম হয়। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন।

তাঁর লেখা "ওয়ার অ্যাণ্ড পিস", "এ্যানা কারেনিনা", "রিজা-রেকসন" প্রভৃতি উপন্যাস এবং ছোটগল্পগুলি পৃথিবীর দেশে-দেশে আজও বেশ জনপ্রিয়। তিনি 'শিল্পের জন্যই শিল্প—জীবনের জন্য নয়'—এই মতবাদের অনুগামী ছিলেন না। তাঁর চারপাশের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বাস্তব জীবনের ছবি এঁকে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। দেশের গরিব, দুঃখী, উপদ্রুত, অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি তাঁর হৃদয়ে ছিল অপরিসীম সহানুভূতি। রাশিয়ার দাস-প্রথা রদ হলে তিনি সৈন্যবিভাগের অফিসারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের জমিদারিতে ফিরে গিয়ে প্রজাদের উন্নতিকল্পে বিবিধ হিতকর কাজে ব্রতী হন।

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ফ্লাবয়ার তাঁকে 'দ্বিতীয় সেকসপীয়র' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। সেকসপীয়র এবং টলসটয় দুজনেই ছিলেন বিরাট সত্তার মহামানুষ এবং অনন্যসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। মানবসমাজ সম্বন্ধে দুজনেরই ছিল অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। সমাজের সকল স্তরের বিচিত্র মানুষের চরিত্র দুজনেই চরম দক্ষতার সঙ্গে এঁকে গেছেন। কিন্তু সেকসপীয়র নিজের সৃষ্টি-করা নরনারীর সঙ্গে কখনো একাত্ম হয়ে যান নি। শিল্পী হিসাবে তিনি সব সময়ে নিজেকে দূরে-দূরে রাখতেন—

ব্যক্তিগত সত্তার চারিদিকে সৃষ্টি করে তুলেছিলেন কঠোর নিরাসক্তির অদৃশ্য আবরণ। তাঁর সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে মতামত সঠিকভাবে আজ পর্যন্ত কোন সাহিত্য-বিচারক জানতে পারেন নি। টলস্টয় ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীতজাতের শিল্পী। তিনি ছিলেন চির-বিদ্রোহী। প্রচলিত কোন মতামতকেই বিনাবিচারে গ্রহণ করেন নি। যা তিনি সত্য বলে বুঝেছিলেন, তা তাঁর সৃষ্টি-করা চরিত্রগুলির সাহায্যে অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করে গেছেন।

সাহিত্য সমালোচকদের মতে "ককেশাসের বন্দী" বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এর নায়িকা তাতার-কিশোরী দীনার চরিত্র যেমনি মধুর, তেমনি সজীব। তাকে কোন অজানা দূরাঞ্চলের উদ্ভট, কল্পনা-মূর্তি বলে আদৌ মনে হয় না।

এক সময়ে তাতারীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যে রুশীয়দের সঙ্গে প্রবল বিরুদ্ধতায় লিপ্ত ছিলেন। কারণে-অকারণে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটত। একবার টলস্টয় রুশ সৈন্যদলের অফিসার হিসাবে তাতারীদের হাতে বন্দী হন। হয়ত সেই স্মৃতির প্রভাব মহাশিল্পীর এই রচনার ভিতকে বিচিত্র বর্ণে-গন্ধে-রসে সমৃদ্ধ করেছে। ছোট্ট দীনার অতি-ছোট কাহিনীর রেশ পাঠকদের মনে যেন অশেষ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, টলস্টয়ের এই শ্রেণীর ছোটগল্পগুলির ভাষা খুব অনাড়ম্বর। তাছাড়া, কাহিনীর স্বাভাবিক গতিকে কোথাও কৃত্রিম মোচড় দিয়ে জটিল করার চেষ্টা এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। শিল্পী যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তা সরলভাবেই আঁকার চেষ্টা করেছেন। উগ্র রং ব্যবহার করে কোথাও তা অতি-রঞ্জিত করেন নি।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে টলস্টয়-এর তিরোভাব ঘটে।]

ককেশাস পাহাড়ী অঞ্চল। সিলিন সেখানকার সৈন্যবিভাগে অফিসরের কাজ করতেন।

একদিন তাঁর বাড়ি থেকে একখানা চিঠি এল। মা লিখেছিলেন, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আর বেশী দিন বাঁচব না। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। মরবার আগে তোমাকে একবার খুব দেখতে ইচ্ছে করে, বাবা। বাড়িতে এসে আমার শেষ কাজ করে যাও। আমার কবরে মাটি দিয়ে আমার আশীর্বাদ নিয়ে

ভগবানের ইচ্ছে হয় ত আবার চাকরিতে ফিরে যেও। আর একটা কথা। তোমার জন্য একটি পাত্রী দেখে রেখেছি। সুন্দরী, কাজকর্মজানা মেয়েটি। তার নামে কিছু বিষয়-সম্পত্তিও আছে। মেয়েটি যদি তোমার মনের মত হয় ত তাকে বিয়ে করে বাড়িতেই এসে থাকতে পার।

সিলিন প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আগাগোড়া ভেবে দেখলেন। তাঁর মনে হল, মার শরীর যে-রকম ভেঙে পড়েছে, তাতে বেশী দিন আর বাঁচবেন বলে ত বিশ্বাস করা যায় না। এ সময়ে বাড়ি যাওয়াই আমার উচিত। তাছাড়া মার-দেখা মেয়েটি যদি ভাল হয় ত বিয়ে করতেই বা দোষ কি!

তিনি করনেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর ছুটি মঞ্জুর হল। তিনি সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বিদায়ের সময়ে শুভ ইচ্ছার চিহ্ন হিসাবে চার মগ ভডকা খেয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

সে সময়ে ককেশাস অঞ্চলে তাতারীদেব সঙ্গে রাশিয়ানদের যুদ্ধ চলছিল। দিনে বা রাতে কোন সময়েই পথঘাট নিরাপদ ছিল না। যদি নিজেদের দুর্গ থেকে একটু দূরে কোন রাশিয়ান পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেত, তাতারীরা তাকে ধরে সদ্য-সদ্য মেরে ফেলত কিংবা দূরেব পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখত। তাই রুশীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন, যাত্রীরা সৈন্যদের পাহারায় সপ্তাহে দুদিন এক দুর্গ থেকে আর এক দুর্গে যাতায়াত করতে পারবে।

তখন গরমের সময়। সেদিন সবেমাত্র ভোব হয়েছে। একদল যাত্রী গাড়িতে মাল বোঝাই করে প্রহরী সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে দেশের দিকে যাত্রা করলে। সিলিনও ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গ নিলেন। তাঁর জিনিসপত্রের ঠেলাখানি মাল-বোঝাই গাড়িগুলির সঙ্গে রইল। সিলিনদের যাবার কথা ছিল মাত্র ষোল মাইল পথ। কিন্তু মালবোঝাই গাড়িগুলি এগোতে লাগল আস্তে আস্তে। সৈন্যরাও মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্যে দাঁড়াতে লাগল। পথের মাঝখানে একটা মালগাড়ির চাকা খুলে গেল। একটা ঘোড়াও কিছুক্ষণ দুষ্টুমি করে সময় নষ্ট করলে। এইসব নানা কারণে পথে যাত্রীদের দেরী হতে লাগল। ফলে দুপুর প্রায় পার হয়ে গেল, তবু তাদের পক্ষে অর্ধেক পথও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। যেমনি গরম, তেমনি পথে ছিল ধুলো। রোদের উত্তাপও খুব খর হয়ে উঠেছিল। কাছাকাছি কোথাও বিশ্রাম করার মত চটিও পাওয়া গেল না। চারিদিকে ধু-ধু করছে খোলা মাঠ। রাস্তার দুধারে না ছিল গাছ, না-বা কোন ঝোপ জঙ্গল।

সিলিন দল থেকে অনেকটা পথ এগিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একটা নিরিবিলি

জায়গায় দাঁড়িয়ে সঙ্গী আর মালগাড়িগুলির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই সময়ে পেছনে বাঁশি বাজার শব্দ শোনা গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, যাত্রীরা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছেন। অতএব এগিয়ে আসতে দেরী হবে। তাঁর মনে হল, এখন কি করা যায়? আমার ঘোড়া ত বেশ তেজী। শত্রু তাতারীরা যদি আক্রমণ করে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে পারব। অতএব সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা না করে এগিয়ে যাই না কেন? হঠাৎ তাঁর মনের গোপন কোণে কে যেন সাবধান করে দিয়ে বললে, না, না, বরং সঙ্গীদের জন্যে তোমার অপেক্ষা করাই উচিত হবে!

ঠিক এই সময়ে বন্দুক হাতে একজন অফিসর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর নাম কসটিলিন। তিনি বললেন, চল, সিলিন, আমরা এগিয়ে যাই। এখানে বসে অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। আমার ত বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে! তাছাড়া, গরমও অসহ্য। আমার কামিজটা ত ভিজে জবজব করছে।

কসটিলিন ছিলেন বেজায় মোটা। রোদে তাঁর রক্তবর্ণ মুখ থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছিল। সিলিন কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বন্দুক ভরা আছে ত?

—হাঁ, হাঁ। ভরা আছে।

—তাহলে চল, এগিয়ে যাওয়া যাক। তবে একটা শর্ত রইল। দুজনে কখন ছাড়াছাড়ি যেন না হই, দেখো।

তাঁরা ঘোড়ার পিঠে বসে গল্প করতে করতে মাঠের মধ্যে এগিয়ে চললেন। দুজনেই আশেপাশে সতর্ক চোখ রাখলেন। চারিদিকে খোলা মাঠের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। মাঠের পারে রাস্তাটা দুটো পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছল। সিলিন তা দেখে বললেন, দেখ বন্ধু, পাশের পাহাড়টার ওপর উঠে আমাদের একবার চারদিকটা ভাল করে দেখে নেওয়া উচিত। তা না হলে কখন তাতারীরা অতর্কিতে আমাদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে, বুঝতেও পারব না।

কসটিলিন জবাব দিলেন, দেখো অত হাঙ্গামা করার কি দরকার? চল সোজা এগিয়ে যাই।

সিলিন রাজী হলেন না। তিনি বললেন, না ভাই, তুমি না-হয় এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি ওপরে উঠে দেখে আসি।

এই বলে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে বাঁদিকের পাহাড়টার ওপরে চড়তে শুরু করলেন। তাঁর ঘোড়াটা খুব তেজী ছিল। সে যেন পাখির মত উড়তে উড়তে

পাহাড়ের ওপরে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ সিলিন প্রায় একশ গজ দূরে ত্রিশজন তাতারী ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেলেন। তিনি তখনই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতারীরা তাঁকে আগেই দেখতে পেয়েছিল। তারা চকিতের মধ্যে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে তীর বেগে তাঁর পেছনে তাড়া করলে। সিলিন পাহাড থেকে নামতে নামতে চিৎকার করতো লাগলেন, কসটিলিন, শিগ্‌গির বন্দুক তৈরী করে নাও। একটুও দেরী করো না। ওরা এসে পড়েছে! তিনি মনে মনে নিজের ঘোড়াকে উদ্দেশ করে বললেন, যেভাবে হোক, আজকের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর্, বাবা। যেন হোঁচট খাস নি। তুই হোঁচট খেয়ে পডলে আমার সব আশা ঘুচে যাবে! একবার কসটিলিনের কাছে পৌঁছে বন্দুকটা হাতে তুলে নিতে পারি! তাহলে শয়তানরা কিছুতেই আমাকে বন্দী করতে পারবে না।

কিন্তু কসটিলিন দূর থেকে তাতারীদের দেখবামাত্রই ঘোড়াটাকে প্রাণপণে চাবুক মারতে মারতে দুর্গের দিকে পালালেন। ধুলোর পরদার আবছায়া অন্ধকারে শুধু সেই চাবুকের রশি চোখে পডতে লাগল।

সিলিন বুঝতে পারলেন, বিপদ এবার ঘনিয়ে উঠল। বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করার আশা ঘুচে গেল। এখন শুধু একমাত্র সহায় রইল তাঁর নিজের তরোয়াল। তা দিয়ে আর তিনি কতটুকু আত্মরক্ষা করতে পারবেন! তিনি শেষে কসটিলিনের পেছনে পেছনে পালাবার জন্যে ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন। কিন্তু সেদিক থেকেও এল বাধা। ছ-জন তাতারী ঘোডসওয়ার ছুটে এসে তাঁর পথ আগলালে। সিলিনের ঘোড়া যতই তেজী হোক, তাতারীদের ঘোডাগুলো ছিল আরও তেজী। তিনি তখন লাগাম কষে ধরে ঘোড়ার মুখ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘোড়াটা এমন তীর বেগে ছুটছিল যে, কিছুতেই থামতে পারলে না, একেবারে সোজা দুশমনদের সামনে গিয়ে পড়ল। সিলিন দেখতে পেলেন, একটা ছাই রঙের ঘোড়ার ওপর বসে একজন লাল দাড়িওয়ালা তাতারী বন্দুক উঁচিয়ে দাঁত খিচোতে খিচোতে ছুটে আসছে। তিনি মনে মনে বললেন, শয়তান, তোমাদের খুব চিনি। যদি আমাকে জীবন্ত ধরতে পার, তাহলে ত গর্তের মধ্যে ফেলে চাবুক মেরে শেষ করবে। প্রাণ থাকতে তোমাদের হাতে কিছুতেই ধরা দেব না।

সিলিন দেখতে লম্বা চওড়া না হলেও বেশ সাহসী ছিলেন। তিনি ভাবলেন, হয় ওটাকে মাড়িয়ে চলে যাব, না-হয় তরোয়াল দিয়ে ওর মাথা কেটে পালাব।

তিনি লাল দাড়িওয়ালাকে আক্রমণ করার উদ্দেশে তরোয়াল খুলে এগিয়ে গেলেন।

তখনও লোকটা একটু দূরে ছিল, এমন সময়ে পেছন থেকে অপর একজন তাতারীর গুলিতে সিলিনের ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আছাড় খেয়ে ধরাশায়ী হলেন। চকিতের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু পারলেন না। ইতিমধ্যে দুজন তাতারী তাঁর পিঠে চড়ে তাঁকে বাঁধতে শুরু করে দিলে।

সিলিন তবুও দমলেন না। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁকা মেরে পুনরায় দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। তাঁর ঝাঁকানির চোটে পিঠের ওপরকার তাতারী দুজন দূরে ছিটকে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আরও তিনজন দুশমন ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে বন্দুকের বাঁট দিয়ে সজোরে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সিলিনের চারিদিক ঘোর অন্ধকারে ভরে গেল। তিনি আধা-অচেতন অবস্থায় মাটিতে শুয়ে পড়লেন। তখন তাতারীরা তাঁকে জাপটে ধরে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেললে। তারা একে একে তাঁর মাথা থেকে টুপিটা টেনে ফেলে দিলে, পা থেকে জুতো খুলে নিলে, জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেললে। তারপর তাঁর টাকাকড়ি আর ঘড়িটা কেড়ে নিলে।

সিলিন নিজের ঘোড়ার দিকে একবার শেষ বারের মত তাকিয়ে দেখলেন। কিছুদূরে ঘোড়াটা পাশ ফিরে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, আর পা দুটো শূন্যে তুলে ওপরের দিকে ছুঁড়ছিল। গুলি লেগে তার মাথায় একটা গর্ত হয়ে গেছল। সেই গর্ত থেকে ফিনকি দিয়ে কাল রক্ত ঝরে পড়ছিল। ঘোড়ার রক্তে পথের ধুলো ভিজে গিয়ে কাদা হয়ে উঠেছিল।

একজন তাতারী সাজ খুলে নেবার উদ্দেশে ঘোড়াটার কাছে গেল। তাকে অনবরত পা ছুঁড়তে দেখে নিজের কোমর থেকে ছোরাটা বার করে তার গলায় বসিয়ে দিলে। ঘোড়াটার মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল, সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রাণও বেরিয়ে গেল। তাতারীরা তার সাজ আর লাগাম খুলে নিল। তারপর লাল দাড়িওয়ালা লোকটা নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। তার সঙ্গীরা সিলিনকে ধরে ঘোড়ার পেছনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলে। বাঁধা শেষ হলে তারা সকলে মিলে পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলে।

সিলিন ঘোড়ার পিঠে এপাশ ওপাশ দুলতে দুলতে এগিয়ে চললেন। তাঁর মাথার সঙ্গে কেবলই তাতারীর দুর্গন্ধভরা পিঠের ধাক্কা লাগতে লাগল। লোকটির

শক্ত ঘাড় আর পিঠের সবল পেশীগুলি ছাড়া আর কিছুই তাঁর দেখার উপায় ছিল না। সিলিনের মাথায় আঘাত লেগেছিল। সেই রক্ত গড়িয়ে পড়ে তাঁর চোখের ওপর শুকিয়ে গেছল। শত্রুরা এমন আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁকে বেঁধেছিল যে, তাঁর একটু নড়ে বসবারও সুযোগ ছিল না, চোখের রক্ত মুছে ফেলবারও উপায় ছিল না। অথচ বাঁধনের জ্বালায় তিনি ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন।

শত্রুরা পাহাড়ী পথে অনেক খাড়াই উতরাই পার হয়ে একটি নদীর ধারে পৌছল। নদীতে জল ছিল না। তারা পায়ে হেঁটে নদী পার হল। তারপর পাথরের উঁচু-নীচু পথ ধরে একটি উপত্যকায় এসে উপস্থিত হল।

শত্রুরা কোথায় যাচ্ছে দেখবার জন্যে সিলিন চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর চোখের পাতায় রক্ত জমে তা আটকে গেছল। তিনি চোখ খুলতে পারলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া পড়তে আরম্ভ করলে। তাতারীরা আর একটা নদী পার হয়ে পাথরভরা পাহাড়ী অঞ্চলে এসে পৌছল। সেখানে ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া গেল। চারপাশে বস্তির কুকুরগুলো ডাকতে লাগল। সেটা ছিল তাতারীদের গ্রাম। তারা গ্রামে পৌছে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। এক পাল ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এসে কৌতুকভরে সিলিনকে ঘিরে দাঁড়াল। এই অচেনা মানুষটাকে নিয়ে ওদের যেন বিস্ময়ের সীমা ছিল না, সিলিনকে দেখতে দেখতে কখন ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠতে লাগল, কখন-বা তাকে ঢিল ছুঁড়ে মারতে লাগল।

তাতারীরা শেষে ছেলেমেয়েগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে সিলিনকে ঘোড়া থেকে নামালে। তারপর একটি বুনো পাহাড়ী চাকরের নাম ধরে ডাক দিলে। চাকরটি এসে হাজির হল। তার গালের ওপরকার হাড় দুটো ছিল বিশ্রী উঁচু। সে পরেছিল একটি শতছিন্ন কামিজ।

মনিবের হুকুমে চাকরটা বেড়ি নিয়ে এল। শত্রুরা সিলিনের হাতের বাঁধন খুলে দুপায়ে সেই বেড়ি পরিয়ে দিলে। তারপর তাঁকে একটা খামারের কুঁড়ে ঘরের কাছে এনে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল।

সিলিন ধাক্কার তাল সামলাতে পারলেন না, গিয়ে পড়লেন এক গাদা গোবরের ওপর। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইলেন।

তারপর অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা পছন্দমত জায়গা পেয়ে সেখানে আশ্রয় নিলেন।

*

* *

রাত্রে সিলিনের একটুও ঘুম হল না। বছরের এই সময়টায় রাত খুব ছোট হয়ে যায়। তাই কিছুক্ষণ পরে কুড়ে ঘরের দেওয়ালের একটা ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো দেখা গেল। সিলিন দাঁড়িয়ে উঠে সেই ফাঁকটা আরো বড় করে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন।

তাঁর চোখে পড়ল, একটি রাস্তা এঁকে বেঁকে ক্রমে পাহাড়ের তলার দিকে নেমে গেছে। ডান দিকে বড় দুটি গাছের পাশে ছিল তাতারীদের একটি বাড়ি। একটা কালো রঙের কুকুর সেই কুটিরের দরজায় শুয়েছিল। সামনের উঠোনটায় একটা ছাগল আর তার বাচ্চাগুলো লেজ নাড়তে নাড়তে এদিকে ওদিকে চরে বেড়াছিল। একজন তাতারী তরুণী লম্বা, ঝলমলে সালোয়ার পরে মাথায় একটা কুর্তা চাপিয়ে তার ওপর এক কলসী জল ভরে নিয়ে আসছিল। তার পায়ে ছিল ঢিলে পাজামা আর ছিল উঁচু জুতো। তার হাত ধরে এগিয়ে চলেছিল একটি নেড়া-মাথা তাতারী ছোট ছেলে। ছেলেটির গায়ে ছিল একটা কামিজ। জল ভরতি কলসীটা মাথায় করে যেতে যেতে তরুণীকে মাঝে মাঝে টাল সামলাতে হচ্ছিল, সে সময়ে তার পিঠের পেশীগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সে জল নিয়ে কুটিরের ভেতরে ঢোকবার পর কালকের সেই লাল দাড়িওয়ালা লোকটি বাইরে বেরিয়ে এল। আজ তার পরনে ছিল রেশমী কুর্তা, কোমরে রূপোর বাঁটওয়ালা ছোরা, পায়ে মোজা ছিল না, শুধু জুতো ছিল। সে মাথায় পরেছিল একটা লম্বা, কাল রঙের ভেড়ার চামড়ার টুপি। লোকটি বাইরে এসে একটা হাই তুলে আলস্য ভাঙলে, তারপর লাল দাড়িতে কয়েকবার হাত বুলোলে। শেষে বুনো চাকরটাকে ডেকে কি যেন হুকুম করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সিলিন দেখতে পেলেন, দুটি ছেলে ঘোড়াকে জল খাইয়ে নিয়ে তাঁর বন্দিশালার পাশ দিয়ে চলে গেল। ঘোড়াগুলোর মুখ তখনও ভিজে ছিল। ওদিকে কতকগুলো নেড়ামাথা ছোট ছেলে শুধু কামিজ পরে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। তারা একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের ফাঁক দিয়ে সিলিনের দিকে গুঁজে দিতে লাগল। সিলিন একটা ধমক দিয়ে উঠলেন। তারা তখনই ভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল।

সিলিনের খুব তেষ্টা পেয়েছিল। গলা শুকিয়ে গেছল। তাঁর ইচ্ছে হল, এই সময়ে ওরা যদি কেউ একবার আমায় দেখতে আসত বেশ হত!'

হঠাৎ তাঁর কানে গেল কুঁড়ে ঘরের তালা খোলার শব্দ। লাল দাড়িওয়ালা লোকটি একজন সঙ্গীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গীটি দেখতে ছিল বেঁটে, কাল। তার দাড়ি বেশী লম্বা ছিল না। চোখে ঘন কাল রঙের উজ্জ্বল তারা দুটি জ্বলজ্বল করছিল। তার পরনে দামী পোশাক—গায়ে সোনার কাজ-করা, নীল রেশমী কুর্তা, কোমরে রূপো-বাঁধানো ছোরা, পায়ে লাল রঙের মরক্কো চামড়ার চটি জুতো, মাথায় সাদা ভেড়ার চামড়ার টুপি।

লাল দাড়িওয়ালা লোকটি রাগত ভাবে ঘরে ঢুকে বিড়বিড় করে আপন মনে কি সব বকলে। তারপর দরজার বাঁশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আড়চোখে সিলিনের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের ছোরাটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। কাল রঙের তাতারীটি খুশির আবেগে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সিলিনের পিঠে একটা চাপড় মারলে। তারপর নিজের ভাষায় খুব চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করলে। সে মাঝে মাঝে জিভে একটা টা-টা শব্দ করে বলতে লাগল, হাঁ, হাঁ, আচ্ছা রুশী আছে, ভালা রুশী আছে।

সিলিন দুজনের কথার এক বর্ণও বুঝতে পারলেন না। তবু সাহস ভরে বললেন, জল খাব। আমাকে জল এনে দাও।

কাল রঙের লোকটি তাঁর কথা শুনে কেবল হাসতে লাগল। একবার বললে, আচ্ছা রুশী, ভালা রুশী। তারপর আবার দুজনে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে লাগল।

সিলিন ঠোঁট দেখিয়ে ইশারা করে জানালেন, খাবার জল চাই।

কাল তাতারীটি এবার তাঁর ইশারা বুঝতে পারলে। সে দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ডাকলে, দীনা।

ডাক শুনে একটি মেয়ে দৌড়ে ভেতরে এল। তার বয়স প্রায় তের বছর, রোগা ছিপছিপে। তাকে দেখতে প্রায় কাল তাতারীটির মত। চেহারার সাদৃশ্যে বোঝা যায়, দীনা তাতারীটির মেয়ে। এরও চোখ দুটিতে ছিল জ্বলজ্বলে, কাল তারা। মুখখানি করুণামাখা। তার পরনে ছিল চওড়া হাতার ঢিলে, লম্বা, নীল রঙের সালোয়ার। পায়ে ছিল পাজামা আর চটি জুতো। তার গলায় ছিল রুশদেশের রূপোর টাকার একটি মালা। মাথায় কোনো টুপি ছিল না। মাথার কুচকুচে কাল চুলের রাশির মধ্যে বাঁধা ছিল একটি ফিতে।

তার বাবা মেয়েটিকে কাছে ডেকে কি যেন বললে। সে তখনই একটি ধাতুর তৈরী পাত্র করে জল নিয়ে এল। তারপর পাত্রটি সিলিনের হাতে দিয়ে সামনে

হাঁটু গেড়ে বসে এক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল। তার চোখে ভেসে উঠল ঘোর বিস্ময়। সিলিন যেন তার কাছে এক অজানা, অদ্ভুত জীব।

সিলিন জল খেয়ে খালি পাত্রটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিলে। দীনা তা হাতে করে ছাগলছানার মত এমন একটা লাফ দিয়ে বাইরে চলে গেল যে, তার বাবা পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারলে না। তারপর বাবার হুকুমে ও বাড়ি থেকে কয়েকখানা মোটা-মোটা রুটি এনে বন্দীর সামনে রেখে দিলে।

শেষে তাতারীরা সকলে দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে চাকরটি ভেতরে ঢুকে বললে, আয়ডা, আয়ডা। সে রুশ ভাষা জানত না। সিলিনও তার কথা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলেন না। তিনি অনুমান করলেন, চাকরটা তাঁকে যেন কোথাও যেতে বলছে। তিনি চাকরটির পেছনে পেছনে চললেন। বেড়ি-বাঁধা পা নিয়ে চলা কষ্টসাধ্য। তাঁর খুব কষ্ট হতে লাগল। তিনি খামারের বাইরে গিয়ে দেখতে পেলেন, গ্রামখানিতে খান দশেক বাড়ি আর ছোট মিনারওয়ালা একটি মসজিদ রয়েছে। একটি বাড়ির সামনে তিনটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াদের পিঠে রয়েছে জিন। আর ছোট-ছোট ছেলেরা তাদের লাগাম ধরে রয়েছে। কাল রঙের লোকটি সেই বাড়ি থেকে বাইরে এসে সিলিনকে তার পেছনে পেছনে যেতে ইশারা করলে। তারপর সে হেসে উঠে নিজের ভাষায় কত কি বলতে বলতে বাড়ির মধ্যে ফিরে গেল।

সিলিন তার পেছনে পেছনে একটি ঘরের ভেতরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘরখানি ছিল বেশ চমৎকার। দেওয়ালগুলো মাটি দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছিল। সামনের দেওয়ালটির কাছে এক গাদা পাখির পালকের তোশক পড়েছিল। অন্যান্য দেওয়ালের গায়ে দামী কার্পেট টাঙিয়ে তার ওপর রূপো-লাগানো বন্দুক, পিস্তল, তরোয়াল সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। মাটির মেঝেটি ছিল তক্‌তকে-নিকোনো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এক কোণে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে পশমের চাটাই পেতে কম্বল বিছিয়ে তার ওপর রাখা পাখির পালকের পাঁচটি কুশনে পাঁচজন তাতারী বসেছিল। কাল রঙের লোকটি, লাল দাড়িওয়ালা লোকটি আর তাদের তিনজন অতিথি। তাদেব পায়ে ছিল বাড়িতে পরবার চটি জুতো। তারা সবাই একটি করে নরম কুশনে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসেছিল। তাদের সামনে রাখা হয়েছিল খাবার।—গোল থালার ওপর ছিল কেক, বাটিতে গলা মাখন আর লম্বা পাত্রের মধ্যে তাতারী বিয়ার-মদ, নাম বুর্জা। তাতারীরা হাতে করে কেক, মাখন খেলে।

কাল রঙের লোকটি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সিলিনকে মাটির ওপর এক পাশে বসিয়ে দেবার জন্যে হুকুম করলে। তারপর আবার বসে পড়ে অতিথিদের কেক আর মদ পরিবেশন করতে লাগল। চাকরটি ইতিমধ্যে সিলিনকে মেঝের ওপর বসিয়ে দিয়ে নিজের জুতো জোড়া বাইরে খুলে রেখে এসে কম্বলের এক কোণে বসে পড়ল, আর মনিবদের খাওয়া দেখতে দেখতে মাঝে-মাঝে নিজের ঠোঁট চাটতে লাগল।

তাতারীরা যত পারলে খেলে। তাদের খাওয়া শেষ হলে একজন তাতারী স্ত্রীলোক এসে বাকী খাবারগুলো নিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটির মাথায় ছিল রুমাল বাঁধা, পরনে সালোয়ার আর পাজামা। সে ভেতর থেকে একটি গামলা আর গাড়ুর মত একটা পাত্রে জল ভরে আনলে। তাতারীরা হাতমুখ ধুয়ে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে চারপাশে ফুঁক দিতে দিতে প্রার্থনা করলে। তারপর তারা কিছুক্ষণ ধরে নিজেদেব মধ্যে আলোচনা করতে লাগল।

হঠাৎ একজন অতিথি লাল দাড়িওয়ালা লোকটিকে দেখিয়ে সিলিনকে রুশ-ভাষায় বললে, ইনি কাজী মহম্মদ। এঁর হাতে তুমি ধরা পড়েছিলে। এঁর কাছ থেকে তোমাকে কিনে নিয়েছেন আবদুল মুরাদ।

দোভাষী কাল রঙের তাতারীব দিকে আঙুল দেখিয়ে তার কথা শেষ করলে, ইনি আবদুল মুরাদ, এখন তোমার মনিব।

সিলিন চুপ করে রইলেন। আবদুল হাসতে হাসতে অতিথিদের অনেক কিছু বলে গেল। মাঝে-মাঝে সিলিনকে লক্ষ করে মন্তব্য করলে, বাহাদুর রুশ, আচ্ছা রুশ।

দোভাষী আবার বললে, আবদুল মুবাদের হুকুম, তুমি টাকা পাঠাবার জন্যে তোমার বাড়িতে চিঠি লেখ। টাকা এসে পৌছলেই ইনি তোমাকে মুক্তি দেবেন।

সিলিন এক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভেবে নিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ও কত টাকা চায়?

তাতারীরা আবার নিজেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি কথা বলে আলোচনা করতে লাগল। শেষে দোভাষী বললে, তিন হাজাব রুবল।

—না। অত টাকা দেবার সাধ্য আমার নেই।

আবদুল তা শুনে লাফিয়ে উঠে সিলিনের মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলে গেল। দোভাষী তা অনুবাদ করে জানালে, তুমি কত দিতে পারবে?

সিলিন নিজের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বললেন, পাঁচ শ রুবল দিতে পারি।

তাঁর কথা শুনে তাতারীরা একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি কথাবার্তা বলতে লাগল। আবদুল লাল দাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে শুরু করলে। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে থুথু ছিটকে পড়তে লাগল। লাল দাড়িওয়ালা লোকটি চোখ খুব জোরে বুজে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে তাদের তর্কাতর্কি থামলে দোভাষী বললে, মাত্র পাঁচশ রুবল পেলে আবদুল মুরাদের চলবে না। তিনি ইতিমধ্যে তোমার দাম হিসেবে দুশ রুবল খরচ করেছেন। তাঁর কাছে কাজী মহম্মদ দেনা করেছিল। তোমাকে দিয়ে সেই দেনা শোধ হল। অতএব তিন হাজার রুবল চাই। এর চেয়ে এক কড়ি কম হলে চলবে না। বুঝলে? আর তুমি যদি চিঠি লিখতে রাজী না হও, তোমাকে গর্তের মধ্যে ফেলে চাবুক মারা হবে।

সিলিনের মনে হল, ওঃ, এদের যত ভয় করব, তত দুর্গতির শেষ থাকবে না। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে দর্পভরে বললেন, তুমি ঐ কুত্তাকে বলো যে, আমাকে এই রকমভাবে ভয় দেখালে, আমি কিছুতেই বাড়িতে চিঠি লিখব না। ফলে ও এক পয়সাও পাবে না। তোমরা ত কুত্তার মত। মনে রেখো, আমি কোনদিন তোমাদের ভয় করি নি, কোনদিন করবও না।

দোভাষী তাঁর কথাগুলো অনুবাদ করে তাতারীদের বললে। তারা আবার চিৎকার করে আলোচনা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে তাদের আলোচনা চলল। তারপর আবদুল লাফিয়ে উঠে সিলিনের কাছে এসে বললে, ডিজিট্ রুশ, ডিজিট্ রুশ। ওদের ভাষায় 'ডিজিট্' শব্দের মানে বীর। সে হাসতে হাসতে দোভাষীর দিকে ফিরে কয়েকটি কথা বললে। দোভাষী অনুবাদ করে সিলিনকে জানালে, আবদুল বলছেন, এক হাজার রুবল পেলেই খুশী হবেন।

সিলিন জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমি পাঁচ শ'র বেশী কিছুতেই দেব না। আর তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেল, এক পয়সাও তোমাদের হাতে আসবে না।

তাতারীরা আবার নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করলে। শেষে চাকরকে কি যেন আনতে পাঠিয়ে একবার দরজার দিকে একবার সিলিনের দিকে তাকাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই চাকরটি ফিরে এল। তার পেছনে পেছনে এল একজন মোটাসোটা, খালি-পা, পায়ে মোটা বেড়ি-পরা লোক।

লোকটির দিকে চেয়ে দেখে বিস্ময়ে সিলিনের দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল। এ যে কসটিলিন! তাহলে কসটিলিনও ধরা পড়েছে!

তাতারীরা ওদের দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে দিল। তখন তাঁরা পরস্পরকে নিজেদের বন্দী হবার গল্প বলতে শুরু করলেন। তাতারীরা অবাক হয়ে তাঁদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে রইল। সিলিন তাঁর সব কথা বললেন। কসটিলিন জানালেন, তাঁর ঘোড়া হঠাৎ থেমে পড়েছিল, তাঁর বন্দুকের গুলি ঠিক তাক করতে পারেন নি। এবং এই আবদুলই শেষে তাঁকে ধরে ফেলে বন্দী করেছিল।

এই সময় আবদুল লাফিয়ে উঠে কসটিলিনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কয়েকটা কথা বলে গেল। দোভাষী অনুবাদ করে বন্দী দুজনকে জানালে, তোমাদের দুজনেরই এখন এক মনিব। তোমাদের মধ্যে যে প্রথমে মুক্তির টাকা দিতে পারবে, সে-ই আগে মুক্তি পাবে।

তারপর সে সিলিনের দিকে ফিরে বললে, দেখ ত, তুমি কত না রাগ করছ! অথচ তোমার বন্ধু কি রকম ভাল লোক! সে পাঁচ হাজার রুবল পাঠাবার জন্যে বাড়িতে চিঠি লিখে দিয়েছে। তাই ওকে ভাল খাবার খাওয়ানো হবে, ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হবে।

সিলিন জবাব দিলেন, আমার বন্ধু তাঁর যা ইচ্ছে, তা-ই করতে পারেন। হয়ত তিনি বড় লোক। আমি কিন্তু বড়লোক নই। যদি তোমাদের ইচ্ছে হয়, আমাকে মেরে ফেল। তাতে অবশ্য তোমাদের কোন লাভ হবে না। তবে একথা ঠিক জেনো, আমি পাঁচশ-র চেয়ে বেশী রুবল পাঠাবার জন্যে বাড়িতে চিঠি লিখব না।

তাতারীরা চুপ করে বসে রইল। তারপর হঠাৎ আবদুল লাফিয়ে উঠে একটা ছোট বাক্স নিয়ে এসে তার ভেতর থেকে কালিকলম আর এক টুকরো কাগজ বার করলে। সেগুলো সিলিনকে দিয়ে তার পিঠে সজোরে একটা চাপড় মেরে ইঙ্গিতে জানালে, এখনই চিঠি লিখে দাও। আমি পাঁচশ রুবলই নিতে রাজী।

সিলিন দোভাষীকে বললেন, ওকে বলো, যেন আমাদের ঠিক মত খেতে পরতে দেয় আর দুজনকে একসঙ্গে থাকতে দেয়। দুজনে একসঙ্গে থাকলে আমাদের দিন সুখে কেটে যাবে। আর এই বেড়িগুলো আমাদের পা থেকে খুলে দিতে হবে।

কথা বলতে বলতে সিলিন আবদুলের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন।

আবদুলও সঙ্গে-সঙ্গে হাসলে। তারপর দোভাষীর মুখ থেকে সব কথা শুনে বললে, আমি ওদের সেরা জামাকাপড় পরতে দেব। বিয়ে করতে যাবার মত সুন্দর জুতো আর চাদর দেব। রাজপুত্তুরের উপযুক্ত খাবার খাওয়াব। আর যদি ওদের ইচ্ছে হয়, দুজনে খামারের কুঁড়ের মধ্যে এক সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু পায়ের বেড়ি খুলে দিতে পারব না। তাহলে যে ওরা পালাবে। তবে এক কাজ করতে পারি। রাত্তির বেলা বেড়ি খুলে রাখার ব্যবস্থা করতে পারি।

এই কথা বলে সে লাফিয়ে উঠে সিলিনেব কাঁধে চাপড় মেরে চিৎকার করে উঠল, তুমি ভাল ত আমিও ভাল। বুঝলে?

সিলিন চিঠি লেখা শেষ করে ঠিকানা ভুল লিখে দিলেন। তিনি ভাবলেন, চিঠি ঠিক জায়গায় পৌছবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি নিশ্চয়ই পালাবার ব্যবস্থা করতে পারব।

তারপর বন্দী দুজনকে সেই খামারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁদের খড়ের বিছানা, এক ঘটী খাবার জল, কয়েকখানি রুটি, দুটো পুরোতন গায়ের চাদর আর কয়েক জোড়া ছেঁড়া জুতো দেওয়া হল। দেখেই বোঝা গেল, এসব যুদ্ধে মরা রুশী সেনাদের গা থেকে খুলে নেওয়া মাল। মনিবের হুকুম অনুসারে রাত্রে দুই বন্ধুর পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হল। তবে কুঁড়ে ঘরের দরজায় তালা দেওয়া রইল।

*

* *

এইভাবে একটা পুরো মাস কেটে গেল। মনিব আবদুল সব সময়ে হেসে বলত, তুমি আইভ্যান ভাল ত, আমি অবদুলও ভাল। বুঝলে? কিন্তু মুখে যাই বলুক, সে তার বন্দীদের বিশ্রী খাবার খাওয়াত। কখন খমির-না-দেওয়া, বাজরার মোটা রুটি, কখন-বা কেবল জলে-গোলা আটা।

ইতিমধ্যে কসটিলিন টাকা পাঠাবার তাগাদা করে বাড়িতে দ্বিতীয়বার চিঠি লিখলেন। টাকার অপেক্ষা করে হতাশায় তাঁর দিন কাটতে লাগল। দিনের পর দিন তিনি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে বসে কেবল ঢুলতেন অথবা চিঠি পাবার আশায় দিন গুনতেন।

আর সিলিন জানতেন, তাঁর চিঠি কারোর হাতে পৌছবে না। তাই তিনি আর দ্বিতীয়বার চিঠি লিখতে রাজী হলেন না। তিনি ভাবলেন, মা আমার মুক্তির পণ দিতে এত টাকা কোথায় পাবেন? আমি বিদেশ থেকে যা কিছু পাঠাতুম, তা-ই ত তাঁর প্রধান সম্বল ছিল। যদি পণের এত টাকা যোগাড়

করতে হয়, তাহলে তাঁকে ভিটেমাটি সব খোয়াতে হবে। ভগবানের কৃপায় আমি যে করেই হোক পালাবার ব্যবস্থা করব।

তাই সিলিন সুযোগের অপেক্ষা করে পালাবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। তিনি কখন-বা তাতারীদের বস্তির চারিধারে শিশ্‌ দিতে দিতে ঘুরে বেড়াতেন। কখন-বা কুঁড়ের মধ্যে বসে মাটির পুতুল তৈরী করতেন। আবার কখন-বা বেতের ঝুড়ি বুনতেন। হাতের কাজে তাঁর খুব দক্ষতা ছিল।

একদিন তিনি একটি চমৎকার পুতুল গড়লেন। তার হাত, পা, নাক তৈরী করে, তাতারী মেয়েদের মত জামা পরিয়ে ঘরের ছাদের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলেন। যখন তাতারী মেয়েরা দল বেঁধে জল তুলতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল, দীনার চোখে পড়ল সেই পুতুলটা। সে কৌতুকভবে সঙ্গিনীদের ডেকে দেখালে। তারা ঘড়া মাটিতে নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুতুলটা দেখতে লাগল আর হাসিঠাট্টা করতে লাগল। সিলিন তখন পুতুলটা ছাদ থেকে পেড়ে তাদের দিকে তুলে ধরলেন। তাবা মজা পেয়ে খুব হাসাহাসি করতে লাগল। কিন্তু সিলিনের হাত থেকে পুতুলটা নিতে কেউই সাহস করলে না। তিনি শেষে পুতুলটা মাটিতে নামিয়ে রেখে চালার মধ্যে ঢুকে গেলেন। ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত মেয়েগুলো কি করে।

কিছুক্ষণ পরে দীনা পুতুলটার কাছে ছুটে এগিয়ে এল। তারপর চারদিক সন্তর্পণে দেখে নিয়ে পুতুলটা হাতে করে দৌড়ে পালাল।

পরের দিন ভোরবেলা বাইরের দিকে তাকাতেই সিলিনের চোখে পড়ল, দীনা বাড়ির বাইরে এসে পুতুলটা নিয়ে দরজার সামনে বসল। ইতিমধ্যে সে পুতুলটাকে লাল রঙের টুকরো-টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরী পোশাক পরিয়ে দিল। দীনা পুতুলটাকে কোলে শুইয়ে দোলাতে দোলাতে গুনগুন করে তাতারী ভাষায় ঘুম-পাড়ানী গান গাইতে আরম্ভ করলে। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে একজন বুড়ী বেরিয়ে এসে তাকে খুব বকতে লাগল। শেষে বুড়ী পুতুলটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে ফেলে বললে, যা এখান থেকে। কাজ করগে যা।

সিলিন আগের চেয়ে আরো সুন্দর একটা পুতুল গড়ে দীনাকে উপহার দিলেন। দীনার খুশির সীমা রইল না। এর পরে দীনা একদিন একটি ছোট ঘটী নিয়ে এসে মাটিতে রাখলে আর ঘটীটি দেখিয়ে সিলিনের দিকে তাকিয়ে অনবরত মুচকে মুচকে হাসতে লাগল।

সিলিন অবাক হয়ে মনে-মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও এত হাসছে কেন?

তিনি ঘটীটিতে জল আছে ভেবে হাতে তুলে নিতেই দেখতে পেলেন, তার মধ্যে দুধ রয়েছে। তিনি ঢকঢক করে দুধটুকু খেয়ে ফেলে বললেন, আঃ, কি চমৎকার খেতে!

দীনার মুখে হাসি আর ধরে না। সে আনন্দে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে বারবার বলতে লাগল, আইভ্যান, বাঃ, বাঃ, বেশ ভাল ছেলে।

তারপর ঘটীটা থপ্ করে তুলে নিয়ে দৌড়ে পালাল। সেদিন থেকে সে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আইভ্যানকে দুধ দিয়ে যেতে লাগল।

তাতারীরা ছাগলের দুধ দিয়ে এক রকম পনির তৈরী করে। বাড়ির ছাদে তা শুকুতে দেয়। দীনা কয়েকবার সেই পনির চুরি করে এনে সিলিনকে খাইয়ে গেল। আর একদিন আবদুল একটা ভেড়া জবাই করেছিল। সেদিন দীনা জামার ভেতর লুকিয়ে খানিকটা রান্না মাংস এনে হাজির করলে।

দীনা সাধারণতঃ জিনিসগুলো মাটিতে রেখেই ছুটে পালাত।

একদিন খুব ঝড় উঠল। একঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেল। পাহাড়ী নদীগুলি জলে ভরে উঠল। গ্রামের বাঁধটির কাছে প্রায় সাত ফুট জল উঁচু হয়ে উঠল। স্রোতের জোরে বড় বড় পাথরগুলো এদিকে ওদিকে ভেসে গেল। ছোট ছোট নালাগুলোতে ত বন্যার জল উপচে উঠল। সেই দুরন্ত স্রোতের কলকল শব্দে দিগ্‌বিদিক্ মুখর করে তুললে। ঝড় থামলে সেই জল এসে গ্রামের পথঘাট ডুবিয়ে দিলে।

সিলিন আবদুলের কাছ থেকে ছুরি চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে একটা ঘূর্ণিযন্ত্র তৈরি করলেন। মোটা বোর্ডের একখানি চাকা কেটে তার দুপাশে দুটি পুতুল আটকে দিলেন। ছোট মেয়েদের কাছ থেকে পুরোতন কাপড় চেয়ে নিয়ে তা পরিয়ে একটি পুতুলকে চাষী আর একটিকে চাষীবউ-এর মতন সাজালেন। তারপর ঘূর্ণিযন্ত্রটি জলের মধ্যে এমন করে বসালেন যে, স্রোতের টানে চাকাটি ঘুরতে শুরু করলে আর পুতুল দুটি সঙ্গে-সঙ্গে নাচতে লাগল।

গ্রামে হইচই পড়ে গেল। রাজ্যের ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী এসে সেখানে জমা হল। তারা এই অদ্ভুত খেলনা দেখে অবাক হয়ে বলতে লাগল, আরে, বাঃ রুশী, বাঃ আইভ্যান!

আবদুলের একটি ঘড়ি ছিল, রাশিয়ায় তৈরী। তা ভেঙে গেছল। একদিন ও জিব দিয়ে টা-টা আওয়াজ করতে করতে সিলিনকে ভাঙা ঘড়িটা দেখালে।

সিলিন বললেন, আমাকে দাও, আমি মেরামত করে দেব।

সিলিন ছুরি দিয়ে ঘড়ির টুকরো-টুকরো য গুলো খুলে ফেলে মেরামত করে দিলেন। ঘড়িটা বেশ চলতে লাগল। আবদুল খুব খুশী হয়ে তাঁকে নিজের একটি শতছিন্ন পুরোতন পাজামা উপহার দিলে। সিলিনকে বাধ্য হয়ে তা নিতে হল। তিনি ভাবলেন, অন্ততঃ রাত্তির বেলা ত এটা বিছানায় পেতে শুতে পারব।

এরপর সিলিনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। তাতারীরা দূর দূর গ্রামাঞ্চল থেকে নানা জিনিস মেরামত করাব জন্যে তার কাছে আনতে লাগল। কেউ-বা আনলে একটা বন্দুক বা পিস্তলের কোনো অংশ, কেউ-বা ঘড়ি। আবদুল তাঁকে কতক-গুলো যন্ত্রপাতি দিলে, সাঁড়াশি, তুরপুন আর একটি উকো।

একদিন একজন তাতারীর অসুখ হল। তার আত্মীয়েরা এসে সিলিনকে ধরলে, বললে, তুমি এসে ওকে ভাল করে দাও। চিকিৎসাবিদ্যা সিলিনের একটুও জানা ছিল না। তবু তিনি রোগী দেখতে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, লোকটা যা হোক করে বেঁচে গেলেও যেতে পারে!

তিনি তাঁর কুঁড়ে ঘরে ফিরে একটু জলে বালি মিশিয়ে তাতারীদের সামনে তাতে মন্ত্র পড়তে পড়তে রোগীকে খেতে দিলেন। তাঁর অদৃষ্টক্রমে রোগীটা ভাল হয়ে উঠল।

সিলিন তাতারীদের ভাষা কিছু-কিছু শিখতে লাগলেন। ক্রমে কতকগুলি তাতারীর সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব জমে গেল। দরকার পড়লেই তারা চিৎকার করে ডাকত, আইভ্যান। অপর তাতারীরা কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলেই হুঁশিয়ার হয়ে উঠত—যেমন লোকে বুনো জানোয়ার দেখলে হয়ে ওঠে।

লাল দাড়িওয়ালা লোকটি সিলিনকে মোটে দেখতে পারত না। সে সিলিনের সঙ্গে দেখা হলেই ভ্রূ কুঁচকে চলে যেত, না-হয় বকবক করে গালি পাড়ত।

আর একজন বুড়ো লোক ছিল, সে ঐ বস্তিতে বাস করত না, নীচের পাহাড়তলি থেকে ওপরে উঠে আসত। সে যখন পথ দিয়ে মসজিদের দিকে এগিয়ে যেত, সিলিন তাকে দেখতে পেতেন। লোকটা ছিল বেঁটে, তার টুপিতে এক টুকরো সাদা কাপড় জড়ানো থাকত। তার গোঁফদাড়ি ছিল ছাঁটা আর বরফের মত সাদা। রেখায় ভরা মুখখানি ইটের মত পোড়া লাল রঙের। বাজপাখির নাকের মত নাক, চোখদুটি নিষ্ঠুরতায় ভরা; দুটি গজদন্ত ছাড়া আর কোনো দাঁত ছিল না। সে মাথায় পাগড়ি পরে লাঠির ওপর ভর দিয়ে চারপাশ

নেকড়ে বাঘের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে হাঁটত। আর সিলিনকে দেখতে পেলে রাগে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে চলে যেত।

লোকটা কোথায় থাকে দেখবার উদ্দেশে একদিন সিলিন পাহাড়ের নীচেয় নেমে গেছলেন। তিনি পায়ে চলার পথ দিয়ে সোজা নেমে গিয়ে একটি পাথরের পাঁচিল-ঘেরা বাগানে এসে হাজির হয়েছিলেন। বাগানে চেরী ফুল আর বাদামের গাছ ছিল; আর ছিল সমতল ছাদওয়ালা একখানি কুটীর। তিনি পাঁচিলের আরো কাছে এসে উঁকি মারতে খড়কুটো দিয়ে তৈরী সার-সার মৌমাছির চাক দেখতে পেয়েছিলেন। তাদের চারিদিকে মৌমাছির দল গুনগুন করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বুড়ো লোকটি হাঁটু গেড়ে বসে একটি চাক নিয়ে ব্যস্তভাবে কি যেন করছিল। সিলিন তা দেখবার জন্যে মুখ বাড়াতেই তাঁর পায়ে-বাঁধা বেড়ির শব্দে বুড়ো লোকটি মুখ ফিরিয়ে তাকালে; তারপর সিলিনকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল আর কোমর থেকে পিস্তল বার করে গুলি ছুঁড়লে। সেদিন সিলিন অতিকষ্টে পাথরের পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন।

পরে বুড়ো লোকটি সিলিনের মনিবের কাছে এসে নালিশ করলে। মনিব সিলিনকে ডেকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি বুড়োর বাসায় কেন গেছলে?

সিলিন জবাব দিয়েছিলেন, আমি ওর কোন অনিষ্ট ত করিনি। ও কেমনভাবে বাস করে, তা-ই শুধু দেখতে গেছলুম।

মনিব সিলিনের কথা বুড়োকে বুঝিয়ে বললে, তা শুনে বুড়ো তাঁর গজ দাঁত খিচিয়ে সিলিনের দিকে ঘুষি পাকিয়ে রাগে গজগজ করতে লাগল।

সিলিন বুড়োর সব কথার মানে স্পষ্ট ধরতে পারলেন না। তবে এটুকু বুঝতে পারলেন, তাতারী বস্তির মধ্যে একজন রুশীকে আশ্রয় না দিয়ে তাকে মেরে ফেলার জন্যে বুড়ো আবদুলকে বলছে। শেষে বুড়ো চলে গেল।

সিলিন মনিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ বুড়ো লোকটা কে?

আবদুল জবাব দিলে, উনি মহাত্মা লোক। আমাদের এ অঞ্চলের সবচেয়ে সেরা বীর। উনি অনেক রুশী লোককে মেরেছেন। এককালে ওঁর বেশ টাকা-কড়ি ছিল। ওঁর তিনজন স্ত্রী আর আটটি ছেলে সকলে একই গাঁয়ে থাকত। রুশীরা এসে সে গাঁ লুঠ করে আর ওঁর সাত-সাতটা ছেলেকে হত্যা করে। কেবল একজন ছেলে বাকী ছিল, সে রুশীদের কাছে ধরা দেয়। তখন এই বুড়ো লোকটি নিজের ইচ্ছেয় রুশীদের হাতে বন্দী হয়ে তিন মাস তাদের কাছে কাটান। সেই

সময়ে ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের হাতে হত্যা করে পরে পালিয়ে আসেন। এরপর যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে মক্কায় হজ করতে যান। তাই উনি পাগড়ি পরেন। যিনি মক্কা থেকে হজ করে ফিরে আসেন, তাঁকে লোকে 'হাজী' বলে। হাজীকে পাগড়ি পরতে হয়। ওই বুড়ো লোকটি রুশীদের মোটে দেখতে পারেন না। উনি তোমাকে মেরে ফেলার জন্যে আমাকে বলে গেলেন। কিন্তু আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি না। আইভ্যান, তোমার জন্যে আমাকে টাকা দিতে হয়েছে। তাছাড়া, তোমার ওপর আমার মন পড়েছে। মেরে ফেলা ত দূরের কথা, যদি তোমাকে মুক্তি দেব বলে আগে থেকে কথা না দিতুম, তাহলে হয়ত তোমাকে আর যেতেই দিতুম না।

তারপর আবদুল রুশভাষায় বললে, তুমি আইভ্যান, তুমিও ভাল; আর আমি আবদুল, আমিও ভাল!

*

* *

এইভাবে সিলিনের আরো একমাস কেটে গেল। দিনের বেলা তিনি বস্তির চারিদিকে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতেন অথবা কোন হাতের শিল্প কাজ করতেন; আর রাতের বেলা বস্তি নিঝুম হয়ে গেলে কুড়ে ঘরের মেঝে খুঁড়ে গর্ত করতেন। মেঝে পাথর দিয়ে তৈরী ছিল। তাই তা খোঁড়া সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তিনি উকো দিয়ে পাথর ঘষতে ঘষতে শেষকালে পালাবার মত একটা বড় গর্ত করতে পেরেছিলেন।

সিলিন ভাবলেন, যদি এ অঞ্চলের চৌহদ্দির পরিচয় জানা যেত অথবা কোন্ পথ দিয়ে পালাতে হবে, তার খোঁজ পেতুম ত বেশ হত! কিন্তু এ বিষয়ে কোনো তাতারীর কাছ থেকে একটি কথাও জানা যাবে না।

একদিন আবদুল বস্তিতে ছিল না। সিলিন সুযোগ বুঝে দুপুরের খাবার পর বস্তির সীমা ছাড়িয়ে পাহাড়ের চূড়োয় উঠে চারিদিক দেখবার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু মনিব বাইরে যাবার আগে সবসময়ে সিলিনের ওপর কড়া নজর রাখবার জন্যে ছেলেকে হুকুম দিয়ে যেত। তাই সিলিনকে পাহাড়ে উঠতে দেখে ছেলেটি চিৎকার করতে করতে তাঁর পেছনে ছুটে এল, খবরদার, ওদিকে যেওনা, বলছি। বাবার হুকুম নেই। যদি তুমি ফিরে না আস ত আমি পাড়ার লোকদের ডাকবার জন্যে হাঁক দেব।

সিলিন ছেলেটিকে বললেন, আমি বেশী দূর যাচ্ছি না। মাত্র ঐ পাহাড়টার

ওপর উঠতে চাইছিলুম। ওষুধ তৈরি করার জন্যে একটা গাছের শিকড় খুঁজে আনতে চাই। তোমার ইচ্ছে হয় ত আমার সঙ্গে আসতে পার। পায়ে-বাঁধা এই বেড়ি নিয়ে কেমন করে পালাব? কাল তোমাকে একটি তীর-ধনুক তৈরি করে দেব, জানলে?

এইভাবে ছেলেটিকে বুঝিয়ে শেষে দুজনেই এগিয়ে গেলেন। যেখান থেকে পাহাড়ের চারিদিক দেখা যায়, সেই চূড়োটা খুব দূরে ছিল না। তবে পায়ে-বেড়ি-বাঁধা অবস্থায় সেখানে ওঠা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। তবু পথ চলতে চলতে সিলিন একসময়ে চূড়োয় গিয়ে হাজির হলেন। তিনি সেখানে বসে চারিদিকের অঞ্চল-গুলির অবস্থান লক্ষ করতে লাগলেন। খামার ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে একটি উপত্যকা রয়েছে, সেখানে একদল ঘোড়া চরছে আর সেই উপত্যকার নীচেয় একটি তাতারী গ্রাম দেখা যাচ্ছে। তার ওধারে রয়েছে একটি খাড়াই পাহাড। আবার তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে আর একটি পাহাড়। পাহাডগুলির মাঝখানে সবুজ অঞ্চলগুলিতে রয়েছে ঘন বনের সারি। আরো দূরে ঢেউ খেলানো পর্বতশ্রেণী ওপর থেকে ওপরে উঠে গেছে। সবচেয়ে উঁচু পর্বতটির চূড়ো চিনির মত সাদা বরফে ভরা। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এই রকম আরো পাহাড রয়েছে। এখানে ওখানে ছডানো গিরিপথগুলি থেকে তাতারী বস্তিব ধোঁয়া উঠছিল।

সিলিন ভাবলেন, হুঁ-হুঁ, এদিককার সব এলাকাটাই তাতার দেশ। তারপর তিনি রাশিয়ার দিকে চোখ ফেরালেন। পায়ের নীচে দূরে দেখতে পেলেন একটি নদী আর যেখানে তিনি থাকেন সেই বস্তিটি। বস্তিটি ঘিরে চারিদিকে ছোট-ছোট বাগবাগিচা। পুতুলের মত দেখতে তাতারী মেয়েলোকেরা দূরে নদীর ঘাটে বসে জামাকাপড় কাচছিল। বস্তি পেরিয়ে একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। তা দক্ষিণদিকের পাহাড়টির চেয়ে নীচু। এর পারে ছিল ঘন বনে-ভরা আরো দুটি পাহাড়। আর তাদের মাঝখানে একটি নীল রঙের সমতলভূমি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সেই সমতলভূমির পারে খুব দূরে ছিল শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলি। সিলিন যখন দুর্গে থাকতেন, তখন কোন্ দিক থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হত, তা মনে করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর ধারণা হল, তিনি ভুল করেন নি, নিশ্চয়ই ঐ সমতল ভূমিতে আছে রুশীদের দুর্গ। পালাবার সময় ঐ দুটি পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই তাঁকে পথ খুঁজে এগিয়ে যেতে হবে।

ক্রমে সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। সাদা বরফে-ঢাকা পর্বতশ্রেণী রক্তিম হয়ে উঠল। আর ছোট-ছোট পাহাড়গুলি গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেল। গিরিপথটি হল

কুয়াশায় আচ্ছন্ন। আর যে সমতল ভূমিতে রুশ দুর্গ আছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল, তার ওপর সূর্যাস্তের লাল আভা লেগে যেন তাতে আগুন লেগেছে, বোধ হতে লাগল। সিলিন মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর বোধ হল, সমতলভূমিতে যেন চিমনির ধোঁয়ার মত কিছু নড়ছে। ক্রমে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, ওখানেই রুশ দুর্গ রয়েছে।

দেরি হয়ে গিয়েছিল। মোল্লার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। মাঠ থেকে জানোয়ারদের তাড়িয়ে বস্তিতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল। গরুর পাল চরছিল। রাখাল ছেলেটি ওদের 'হট্, হট্, ঘরে চল্' বলে তাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু সিলিনের বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

যা হোক, শেষকালে ওরা ফিরে এল। সিলিন ভাবলেন, যখন পথের খোঁজ পেয়েছি, এবার পালাবার পালা। আজ রাতেই পালাতে হবে। তখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত ছিল। চাঁদ হয়ে গেছল ক্ষীণ। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা তাতারীরা গ্রামে ফিরে এল। সাধারণতঃ, ওরা স্ফূর্তি করতে করতে একদল জানোয়ার তাড়িয়ে নিয়ে বস্তিতে ফিরত। কিন্তু সেদিন ওদের সঙ্গে কোনো জানোয়ার ছিল না। তাতারীরা লাল দাড়িওয়ালা লোকটির ভাই-এর লাশ শুধু সঙ্গে করে এনেছিল। তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তাই তাতারীদের মন খুব বিষণ্ণ ছিল। তারা লাশটিকে কবর দেবার জন্যে সমবেত হল। সিলিনও কবর দেওয়া দেখার উদ্দেশে সেখানে এসে হাজির হল।

কোন শবাধার ছিল না। লাশটিকে একখানি সুতী কাপড জড়িয়ে গ্রামের বাইরে এনে মামুলী কয়েকটি গাছের তলায় ঘাসের ওপর রাখা হল। মোল্লা এল, আর দাড়িওয়ালা বুড়োটিও এল। ওরা মাথায় পাগড়ি বাঁধলে, পা থেকে জুতো খুলে ফেললে, লাশের কাছে পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসল।

মোল্লা সবচেয়ে সামনে ছিল। তার পেছনের সারিতে পাগড়ি-মাথায় তিনজন বুড়ো। এদের পেছনে অপরাপর তাতারীরা বসেছিল। সকলেরই চোখ নত, সকলেই চুপচাপ। এইভাবে ওরা অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর মোল্লা মাথা তুলে বললে, আল্লাহ্। সে শুধু এই একটিমাত্র শব্দই উচ্চারণ করলে। তখন আবার সকলে চোখ নত করে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। কেউ একটুও নড়ল না, বা টুঁ শব্দটি করলে না।

পুনরায় মোল্লা মাথা তুলে বললে, আল্লাহ্। তারাও সকলে 'আল্লাহ্, আল্লাহ্' উচ্চারণ করে আবার চুপচাপ বসে রইল।

এতক্ষণ লাশটি ঘাসের ওপর নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। তাতারীরাও সকলে এমন নিশ্চল হয়ে বসে রইল, যেন তারা সকলেই প্রাণ হারিয়েছে। হাওয়া লেগে গাছের পাতাগুলি থেকে শুধু মর্মর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। শেষে মোল্লা প্রার্থনা করলে। তখন সকলে উঠে পড়ল। তারা হাত ধরাধরি করে লাশটিকে তুলে নিয়ে তার পা দুটি দুমড়ে দিয়ে আর হাত দুটি সামনের দিকে জোড় করিয়ে দিয়ে বসার মত ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে তা একটি গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

নোগে চাকরটি কয়েক আঁটি সবুজ ঘাস এনে দিলে। তাতারীরা তা দিয়ে গর্ত ভরাট করে তাড়াতাড়ি ওপরে মাটি বিছিয়ে কবরের মাথার দিকে একটি পাথর পুঁতে দিলে। তারপর পা দিয়ে গর্তের মাটি শক্ত করে বসিয়ে আবার কবরের পাশে সারি সারি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

শেষকালে তারা উঠে পড়ে ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগল, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্।

লাল দাড়িওয়ালা লোকটি বুড়োদের টাকা দান করলে, তারপর একটা চাবুক নিয়ে নিজের কপালে তিনবার মারলে, শেষে বাড়ি চলে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা সিলিন দেখতে পেলেন, লাল দাড়িওয়ালা লোকটি আরো তিনজন লোকের সঙ্গে একটি ঘুড়ীকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেল। তারপর নিজের জোব্বা খুলে ফেলে আস্তিন গুটিয়ে একখানি ছোরা বার করে পাথরে ঘষে ঘষে শান দিয়ে নিলে। তার সঙ্গীরা ঘুড়ীটার মুখ উঁচু করে তুলে ধরলে, আর সে ছোরা দিয়ে জানোয়ারটার গলা কেটে মাটিতে ফেলে তার ছাল ছাড়াতে লাগল। তাতারী মেয়েমানুষ আর ছোট ছোট মেয়েরা এসে নাড়ীভুঁড়ি সাফ করতে শুরু করল। ছাল ছাড়ানো শেষ হলে মাংস টুকরো-টুকরো করে কেটে বাসায় নিয়ে যাওয়া হল। লাল দাড়িওয়ালার বাসায় শ্রাদ্ধের ভোজ উপলক্ষে সারা বস্তির লোকেরা জমা হল।

কবর দেওয়া শেষ হলে বাড়ি ফিরে এসে তিনদিন ধরে তারা ঘুড়ীর মাংস খেলে, বুজা মদ পান করলে। আর মৃতের সদ্গতির জন্যে প্রার্থনা জানালে। এই কদিন তাতারীগুলো সকলেই বস্তিতে ছিল। চতুর্থ দিনে দুপুরে খাবার সময়ে সিলিন দেখতে পেলেন, ওরা বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ঘোড়া আনা হল। লাল দাড়িওয়ালা লোকটিসুদ্ধ জন দশেক ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। কিন্তু আবদুল গেল না, বাড়িতে রইল। সেদিনটা ছিল প্রতিপদ তিথি। রাত তখনো ঘোর অন্ধকার।

—আঃ, আজ রাতই পালাবার উপযুক্ত সময়। সিলিন ভাবলেন।

তিনি কসটিলিনকে সে কথা জানালেন। কিন্তু কসটিলিনের সাহস হল না। বললেন, কেমন করে পালানো সম্ভব? আমরা যে রাস্তা পর্যন্ত চিনি না!

সিলিন জবাব দিলেন, আমি রাস্তা চিনি।

কসটিলিন বললেন, যদি-বা তুমি রাস্তা চেন, তাতেই বা কি? এক রাত্তিরের মধ্যে আমরা দুর্গে পৌছতে পারব না।

সিলিন বললেন, যদি পৌছতে না পারি, আমরা জঙ্গলে ঘুমুব। এই দেখো, আমি কয়েক টুকরো পনির জমিয়ে রেখেছি। এখানে বসে বসে হতাশায় দিন কাটিয়ে লাভ কি? যদি তোমার পণের টাকা এসে পৌছয়, ভাল। কিন্তু ভেবে দেখো, যদি তোমার বাড়ির লোক অত টাকা যোগাড় করতে না পারে, তাহলে? এখন তাতারীরা রেগে রয়েছে, তাদের একজনকে রুশীরা মেরে ফেলেছে। তারা আমাদের দুজনকে মেরে ফেলবার কথা বলাবলি করছিল।

কসটিলিন বেশ করে ভেবে দেখলেন, তারপর বললেন, তবে চল, যাওয়া যাক।

*

* *

সিলিন হামাগুড়ি দিয়ে গর্তের ভেতরে ঢুকে তা আর একটু চওড়া করলেন, যাতে কসটিলিন তার ভেতর দিয়ে পালাতে পারেন। তারপর বস্তি একবারে নিঝুম হওয়া পর্যন্ত দুজনে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সব নিঝুম হলে সিলিন দেওয়ালের নীচে হামাগুড়ি দিকে ঢুকে বাইরে গিয়ে চুপিচুপি ডাকলেন, কসটিলিন, এস। কসটিলিন হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু পাথরে তাঁর পা লেগে আওয়াজ হল। পাহারা দেবার জন্যে আবদুলের একটি 'বাঘা' শিকারী কুকুর ছিল। গায়ে তার চাকা-চাকা দাগ, নাম উল্যাশিন। হুঁশিয়ার সিলিন কিছুদিন আগে থেকে কুকুরটাকে খাবার খাওয়াচ্ছিল। উল্যাশিন শব্দ পেয়েই ডেকে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে অন্য কুকুরগুলোও ডাকতে শুরু করলে। সিলিন আস্তে-আস্তে শিস্ দিয়ে এক টুকরো পনির ছুঁড়ে দিলেন। উল্যাশিন সিলিনকে চিনত, সে ডাক বন্ধ করে লেজ নাড়তে লাগল।

কিন্তু আবদুল কুকুরের ডাক শুনতে পেয়েছিল। তাই তার বাড়ি থেকে চিৎকার করে উঠল, হায়াত, হায়াত, উল্যাশিন।

সিলিন তখন কুকুরটার কানের পাশ চুলকে দিতে লাগলেন। কুকুরটা চুপটি করে লেজ নাড়তে নাড়তে তাঁর পায়ে গা ঘসতে শুরু করলে।

সিলিনরা দুজনে কিছুক্ষণ এক কোণে চুপ করে লুকিয়ে বসে রইলেন। আবার সব নিঝুম হয়ে গেল। কেবল একটি ভেড়া কোনো গোয়ালে যেন কেশে উঠল।

চারিদিক অন্ধকার। আকাশে অনেক দূরে তারাগুলো জ্বলছিল। পাহাড়ের গায়ে অস্ত-যাওয়া প্রতিপদের একফালি চাঁদ লাল দেখাচ্ছিল। আর উপত্যকায় উপত্যকায় ছিল দুধের মত সাদা কুয়াশা। সিলিন দাঁড়িয়ে উঠে সঙ্গীকে বললেন, বন্ধু, এবার চলো।

দুজনে যাত্রা করলেন।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই মোল্লা মসজিদের ছাদ থেকে চিৎকার করে উঠলেন, "আল্লাহ্, বিসমিল্লা, ইলরহমান।" তার মানে তাতারীরা এখন মসজিদে নমাজ পড়তে যাবে। তখন দুজনে একটি পাঁচিলের পেছনে লুকিয়ে বসে রইলেন। যতক্ষণ না সবলোকে মসজিদে চলে গেল, ততক্ষণ তাঁদের অপেক্ষা করতে হল। তারপর আবার সবকিছু নিঝুম হয়ে গেল।

—এবার চল। ভগবান আমাদের সহায় হন!

তাঁরা আবার যাত্রা করলেন। ক্রমে একটি মাঠ পার হয়ে পাহাড়ের নীচে নামতে নামতে নদীর ধারে এলেন; তারপর নদী পার হয়ে উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললেন।

কুয়াশার জাল খুব ঘন হলেও বেশী ওপরে ওঠেনি। তাই মাথার ওপরে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছিল! সিলিন নক্ষত্র দেখে পথ ঠিক করছিলেন। কুয়াশা থাকার জন্যে তাঁরা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আরামে হাঁটছিলেন, কিন্তু তাঁদের পুরোতন, ক্ষয়ে-যাওয়া জুতোগুলির জন্যে অসুবিধা হচ্ছিল। সিলিন তাঁর জুতো খুলে ফেলে দিলেন, শুধু পায়ে পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে এগিয়ে চললেন। কসটিলিন পেছনে পড়ে গেলেন।

—আস্তে চল। এই হতচ্ছাড়া জুতোগুলোর জন্যে আমার পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে।

—ওগুলো খুলে ফেলে দাও। শুধু পায়ে পথ চলা ঢের সহজ হবে।

কসটিলিন শুধু পায়ে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু তাতে আরো খারাপ ফল হল। পাথরে তাঁর পা কেটে যেতে লাগল। তিনি আরো পিছিয়ে পড়লেন।

সিলিন বললেন, তোমার পা কেটে যাচ্ছে, ওষুধ দিলে তা সেরে যাবে। কিন্তু তাতারীরা আমাদের ধরলে আর আস্ত রাখবে না, একেবারে মেরে ফেলবে।

কসটিলিন কোন জবাব না দিয়ে খুব কষ্টে থপথপ করে হাঁটতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা উপত্যকার ভেতরে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ ডানদিক থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। সিলিন থেমে গিয়ে চারদিকটা দেখতে লাগলেন।

—আঃ, আমরা পথ ভুল করে ডানদিকে চলে এসেছি। কাছাকাছি একটি তাতারী বস্তি রয়েছে যে। মনে পড়ছে, সেদিন পাহাড়ের ওপর থেকে এই বস্তিটা দেখতে পেয়েছিলুম। চল, আমরা বাঁদিক ঘেষে পাহাড়ের ওপরে উঠি। ওদিকে একটা জঙ্গল নিশ্চয়ই পাব।

—একটু দাঁড়াও। দম নিতে দাও। আমার পা দুটো ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরছে। কস্‌টিলিন বললেন।

—কুছ পরোয়া নেই। এগিয়ে চলো, বন্ধু। পায়ের ঘায়ে ওষুধ পড়লে তা ভাল হয়ে যাবে। তুমি একটু হালকাভাবে লাফ দিতে দিতে চল। এই রকমভাবে আর কি, দেখো।

সিলিন আবার লাফাতে লাফাতে পিছু হটে বাঁদিকের জঙ্গলে পৌছবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন।

কসটিলিন যন্ত্রণার জ্বালায় গোঙাতে গোঙাতে আরও পিছিয়ে পড়লেন।

সিলিন যা অনুমান করেছিলেন, তাই সত্য হল। তাঁরা পাহাড়ের ওপর উঠে একটি বন পেলেন। সেই বন দিয়ে যেতে যেতে কাঁটা গাছে তাঁদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল। শেষে তাঁরা একটি পথ দেখতে পেয়ে তা ধরে এগিয়ে চললেন।

—এই খবরদার!

তাঁরা হঠাৎ পায়ের খুরের শব্দ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে রইলেন। মনে হল যেন, ঘোড়ার খুরের শব্দ। কিছুক্ষণ পরে তা থেমে গেল। তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। আবার খুরের শব্দ শোনা গেল। তারপর যেই তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন, খুরের শব্দও থেমে গেল। সিলিন চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন, দূরে রাস্তার মাঝখানে একটা কিছু যেন দাঁড়িয়ে আছে। সেখানটা অন্ধকার কম ছিল। একবার মনে হল, বুঝি এটা ঘোড়া। তারপর দেখলেন, ঘোড়া ত নয়। তবে মানুষও নয়।

একবার ঘোড়ার নাম ডাকার মত শব্দ শোনা গেল।

—কি হতে পাবে? সিলিন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন। তারপর তিনি খুব আস্তে আস্তে শিস্ দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটা এক দৌড়ে রাস্তা ছেড়ে ঘন বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আর বনের ভেতর থেকে মড়মড় করে ডালপালা

ভাঙার শব্দ আসতে লাগল। যেন হঠাৎ একটা দমকা ঝড়ে গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ছে।

কসটিলিন ভয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু সিলিন হেসে উঠে বললেন, আরে, এ যে একটা হরিণ! ওর শিঙ লেগে ডালপালা ভাঙছে, সে শব্দ পাচ্ছ না? আমরা ওকে দেখে ভয় পেয়েছিলুম, আবার ওটাও আমাদের দেখে ভয় পেয়েছিল।

তাঁরা আবার এগিয়ে চললেন। আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল অস্ত যাচ্ছিল। ভোর হয়ে এসেছিল। অথচ ঠিক পথ ধরে যাচ্ছেন কিনা, তখনো তাঁরা জানতে পারেন নি। সিলিনের মনে হল, এই পথেই তাতারীরা তাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল, আর রুশী দুর্গ কমসে কম এখনও সাত মাইল দূরে। তবে নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। রাত্তিরের অন্ধকারে পথ ভুল করা ত খুবই সহজ।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা একটি ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হলেন। কসটিলিন ধপ করে বসে পড়ে বললেন, যা খুশি তুমি কর, ভাই। আমি আর এক পাও যেতে পারব না। আমার পা দুটো যেন শক্তি হারিয়ে অসাড হয়ে গেছে।

সিলিন তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

—না, আমি দুর্গে গিয়ে কিছুতেই পৌছতে পারব না। আমার শক্তি নেই।

সিলিন রেগেমেগে বন্ধুকে কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন।

—আচ্ছা, আমি তাহলে একাই চললুম। তুমি পড়ে থাক।

কসটিলিন লাফিয়ে উঠে তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। ক্রমে তাঁরা আরো তিন মাইল পথ এগিয়ে গেলেন। বনের কুয়াশা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিল। সামনে দুহাত দূরের কোন জিনিস তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন না। আকাশে তারাগুলো ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

হঠাৎ তাঁরা সামনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেলেন। পাথরে পায়ের ক্ষুর লেগে শব্দ হচ্ছিল। সিলিন মাটির ওপর সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে কান পেতে শুনতে লাগলেন।

—হাঁ, ঘোডার ক্ষুরের শব্দই বটে। একজন ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দিকে আসছে।

তাঁরা রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে গিয়ে গুড়ি মেরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সিলিন হামাগুড়ি দিয়ে পথের ধারে। এসে তাকাতে তাকাতে দেখতে পেলেন, একজন তাতারী ঘোড়ার পিঠে চড়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে

একটা গরুকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। ক্রমে তাতারীটা পথ দিয়ে এগিয়ে চলে গেল। তখন সিলিন কসটিলিনের কাছে ফিরে এলেন। বললেন, ভগবানের দয়ায় তাতারীটা চলে গছে। উঠে পড়, চল আবার এগিয়ে যাওয়া যাক।

কসটিলিন উঠতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না; পুনরায় পড়ে গেলেন। বললেন, সত্যি বলছি, আমি উঠতে পারছি না। আমার একটুও শক্তি নেই।

তাঁর দেহ যেমন মোটাসোটা, তেমনি ভারী ছিল; তিনি দরদর করে ঘামছিলেন। কুয়াশার শীতের দরুন আর পা ফেটে রক্ত পড়বার জন্যে তিনি একেবারে কাবু হয়ে পড়েছিলেন।

সিলিন হতাশ হয়ে পড়লেন।

—তুমি চিৎকার করে মরছ কিসের জন্যে? তাতারীটা এখনও বেশী দূর যায় নি, তোমার চিৎকার তার কানে গিয়ে হয়ত পৌছবে।

সিলিন নিজের মনে ভাবলেন, ও সত্যিই কাবু হয়ে পড়েছে। এখন ওকে নিয়ে কি করা যায়? সঙ্গীকে ত ফেলে রেখে চলে যাওয়া উচিত হবে না।

—আচ্ছা, তাহলে আমার পিঠে উঠে পড। সত্যিই যদি হাঁটতে না পার, তোমাকে পিঠে করে বইতে হবে বই-কি।

তিনি কসটিলিনকে উঠতে সাহায্য করলেন। তাঁর উরুতে নিজের হাত লাগিয়ে তাঁকে পিঠে তুলে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

সিলিন বললেন, ভগবানের দোহাই, হাত দিয়ে আমার গলা চেপে ধরে দম বন্ধ করে দিও না। বরং আমার কাঁধ দুটো বাগিয়ে ধরো।

সিলিন বুঝতে পারলেন, সঙ্গীর ওজন কম নয়। তার ওপর কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত নিজের পা থেকেও রক্ত ঝরছিল। তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝাঁকানি দিয়ে কসটিলিনকে আরো পিঠের ওপর তুলে নিয়ে ভারের সমতা করে নিচ্ছিলেন। তারপর পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করছিলেন।

এদিকে তাতারীটা নিশ্চয়ই কসটিলিনের চিৎকার শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ সিলিনের কানে গেল, কে যেন তাতারা ভাষায় চিৎকার করতে করতে পেছন দিক থেকে ঘোড়ায় চেপে আসছে। তিনি দৌড়ে ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তাতারীটা তার বন্দুক তুলে ধরে গুলি ছুঁড়লে, কিন্তু গুলি সিলিনদের লাগল না। তখন সে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

সিলিন বললেন, এবার আমরা গেছি! ঐ কুত্তাটা অন্যান্য লোক জড করে

এনে আমাদের খুঁজে বার করবে। এখান থেকে অন্ততঃ দু মাইল আগে পালিয়ে যেতে না পারলে আমাদের রক্ষে নেই।

তিনি নিজের মনে ভাবলেন, কি কুক্ষণেই আমি এই আহাম্মকটার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছি! একলা থাকলে অনেক আগেই বহু দূরে পালাতে পারতুম।

কসটিলিন বললেন, তুমি একলাই পালাও, ভাই। কেন তুমি আমার জন্যে মরবে?

—না, যাব না। বন্ধুকে ফেলে চলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি পুনরায় কসটিলিনকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে অতিকষ্টে হাঁটতে লাগলেন। সেদিকে প্রায় আরো আধ মাইল পথ পার হলেন। তবুও বনের শেষ দেখতে পেলেন না। কিন্তু কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে আসছিল। আকাশে আর তারা দেখা যাচ্ছিল না, দু-এক টুকরো মেঘ যেন জমা হয়েছিল। সিলিন একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ক্রমে তাঁরা পথের পাশে পাথরের পাঁচিল-ঘেরা একটি ঝরনার ধারে এসে উপস্থিত হলেন। সিলিন কসটিলিনকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বললেন, এস, একটু বিশ্রাম করি, জল খাই। কয়েক টুকরো পনিরও খাওয়া যাক। আর বেশী দূর বাকী নেই।

কিন্তু জল খাবার উদ্যোগ করতেই পেছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ তাঁর কানে গেল। আবার তাঁরা ডানদিকের ঝোপের মধ্যে দৌড়ে পালালেন এবং একটা খাড়া জায়গায় এসে লুকিয়ে রইলেন।

তাতারীদের গলার স্বর তাঁদের কানে গেল। পথের যেখান থেকে তাঁরা জঙ্গলে পালিয়ে এসেছিলেন, তাতারীরা ঠিক সেই জায়গায় এসে থেমে পড়ল। ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করে শুঁকে শুঁকে খোঁজবার জন্যে একটি কুকুর ছেড়ে দিলে। তারপর ঝোপঝাড়ের ডালপালা ভাঙার শব্দ হতে লাগল। পেছনের ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ একটা অচেনা কুকুর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকতে শুরু করল।

তারপর অপরিচিত তাতারীরা এসে সিলিন ও কসটিলিনকে ধরে বেঁধে ফেলল এবং ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে গেল।

দু-মাইল পথ যাবার পর আবদুলের সঙ্গে ওদের দেখা হল। আবদুলের সঙ্গে ছিল আরও দুজন তাতারী। আবদুল ওদের সঙ্গে কথা বলার পর সিলিন এবং কসটিলিনকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিজের গ্রামে নিয়ে চলে গেল।

সে সিলিনদের সঙ্গে একটি কথাও বললে না। একবারও হাসলে না। ভোরবেলা তাঁরা গ্রামে এসে পৌছলেন। তাঁদের রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে

রাখা হল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা দলদল তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, কখনো-বা পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল। কখনো-বা চিৎকার করতে শুরু করল, কখনো-বা তাঁদের বেত মারতে লাগল।

তারপর তাতারারা সকলে গোলাকার হয়ে জমায়েত হল। তাদের মধ্যে নীচেকার পাহাড়তলির সেই বুড়ো লোকটিও ছিল। তারা সকলে মিলে আলোচনা করতে লাগল। সিলিন শুনতে পেলেন, তাঁদের দুজনকে নিয়ে কি করা যায়—সে বিষয়ে ওরা আলোচনা করছে। কেউ কেউ বললে, বন্দীদের পার্বত্য অঞ্চলের আরো ভেতরে নিয়ে রাখা হোক। কিন্তু বুড়ো লোকটি মত প্রকাশ করল, ওদের মেরে ফেলা হোক।

আবদুল এই কথা জানিয়ে তার সঙ্গে তর্ক করতে লাগল, আমি ওদের জন্যে টাকা দিয়েছি। ওদের মুক্তিপণ ত আমার পাওয়া চাই।

কিন্তু বুড়ো লোকটি বললে, ওরা তোমায় কিছুই দেবে না। ওদের জন্যে তোমার শুধু বিপদের পর বিপদ ঘটবে। রুশীদের খাওয়ানো পাপ কাজ। ওদের মেরে ফেলে সব ল্যাটা চুকিয়ে দাও।

তাতারীরা সকলে চলে গেল। তারা চলে গেলে আবদুল সিলিনের কাছে এসে বলল, দুসপ্তাহের মধ্যে তোমাদের মুক্তিপণের টাকা না এলে তোমাদের বেত মারব। আর তোমরা যদি ফের পালাবার চেষ্টা কর, তোমাদের কুকুরের মত মেরে ফেলব। একখানা করে চিঠি লিখে দাও, চিঠিখানা ঠিকভাবে লিখবে।

কাগজ এনে তাঁদের হাতে দেওয়া হল। তাঁরা চিঠি লিখলেন। তারপর তাঁদের পায়ে বেড়ি লাগানো হল। মসজিদের পেছনে বার বর্গফুটের একটি গভীর গর্তের ভেতর রাখা হল।

জীবন এখন বেশ দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তাঁদের বেড়ি আর মোটেই খুলে দেওয়া হত না। বাইরের তাজা হাওয়াতে আর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হত না। না-সেঁকা, মাখা ময়দা তাদের খাবার জন্যে ওপর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হত। যেন তারা কুকুর। একটা পাত্র করে জলও নীচে নামিয়ে দেওয়া হত।

গর্তটা ছিল সংকীর্ণ, সেঁতসেঁতে আর দুর্গন্ধে ভরা। কস্টিলিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর ফুলতে লাগল, সারা দেহে বেদনা। সারাদিন হয় যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকেন, না-হয় ঘুমিয়ে কাটান। সিলিনও হতাশ হয়ে পড়লেন।

তিনি দেখলেন, এই জায়গাটা থেকে কিছু লক্ষ করা মুশকিল। তিনি পালাবার কোনো উপায়ের কথা ত ভাবতেই পারতেন না।

সিলিন একটা সুরঙ্গ কাটার চেষ্টা করলেন। কিন্তু খোঁড়া মাটি ফেলে দেবার কোনো জায়গা ছিল না। তাই মাটি তাঁর মনিবের চোখে পড়ল। সে ওঁকে মেরে ফেলব বলে ভয় দেখাল। একদিন সিলিন গর্তের জমির ওপর খুব হতাশ হয়ে বসে মুক্তির কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ তাঁর কোলের ওপর একখান পিঠে এসে পড়ল, তারপব আর একখানি, তারপর অনেকগুলো পনিরের টুকরো। তিনি ওপরের দিকে তাকাতেই দীনাকে দেখতে পেলেন। দীনা ওঁর দিকে হো-হো কবে হেসে পালিয়ে গেল। তিনি তখন ভাবলেন, আচ্ছা. দীনা কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে না?

সিলিন গর্তের একপাশের একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে খানিকটা মাটি খুঁড়ে খেলনা গড়তে শুরু করে দিলেন। তিনি কয়েকটা মানুষ, ঘোড়া, আর কুকুর গড়লেন। ভাবলেন, দীনা এলে ওকে এগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবেন।

কিন্তু দীনা পরের দিন এল না। সিলিন অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। একদল তাতারী গর্তেব পাশ দিয়ে গিয়ে মসজিদের কাছে একটি পরামর্শ সভায় জমা হল। তারা চিৎকার করে তর্ক করতে লাগল। 'রুশী' শব্দটা অনেকবার বলা হচ্ছে, শোনা গেল। তিনি বুড়ো লোকটির গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন। যদিও কি কথাবার্তা হচ্ছিল, তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না, তবু তিনি অনুমান করলেন, রুশী সৈন্যরা কাছাকাছি এসে কোথাও হাজির হয়েছে। আর তাতারীরা ওদের এই বস্তিতে রুশী সৈন্যদের আক্রমণ-আশঙ্কা করে বুঝতে পারছিল না, বন্দীদের নিয়ে এখন কি করা উচিত।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর তারা চলে গেল। হঠাৎ সিলিন মাথার ওপবে একটা খসখস আওয়াজ শুনতে পেলেন। দেখতে পেলেন দীনা ওপরে গর্তের কিনারায় বসে উঁকি মেরে ঝুঁকছে। ওর চোখ দুটো আকাশের তারার মত জ্বলজ্বল করছিল। সে জামার হাতা থেকে দু-টুকরো পনির বার করে ওঁর দিকে ছুঁড়ে দিলে। সিলিন তা নিয়ে বললেন, তুমি আগে আসনি কেন? তোমার জন্যে কতকগুলো পুতুল তৈরী করে রেখেছি। এই নাও, ধরো। এই বলে তিনি একটি-একটি করে পুতুলগুলি ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু দীনা পুতুলগুলির দিকে চেয়েও দেখল না, মাথা নাড়তে লাগল। সে বললে, আমি ওসব চাই না। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল, আইভ্যান, ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে চায়। এই বলে সে তার গলায় হাত দিয়ে দেখাল।

—কে আমাকে মেরে ফেলতে চায় ?

—বাবা। বুড়োরা তাঁকে বলেছে, তোমাকে মেরে ফেলতেই হবে। তোমার জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

সিলিন জবাব দিলেন, তোমার মনে যদি আমার জন্যে কষ্টই হয়ে থাকে, আমাকে একটা লম্বা বাঁশ এনে দাও না।

দীনা মাথা নাড়লে। যেন জানালে, আমি পারব না। সিলিন হাত জোড় করে অনুনয় করলেন, দীনা, লক্ষ্মী দীনা, তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।

সে বললে, আমি পারব না। ওরা বাঁশ আনতে আমায় দেখে ফেলবে। ওরা সকলেই বাসায় রয়েছে।

এই বলে সে চলে গেল।

তারপর যখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, তখন সিলিন গর্তের ওপরের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে ভাবতে লাগলেন, এরপর কি ঘটবে, কে জানে! আকশে ছিল তারার দল। কিন্তু চাঁদ তখনও ওঠেনি। মোল্লার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। তারপর চারপাশ নিঝুম হয়ে গেল। সিলিন তন্দ্রায় ঝিমুতে ঝিমুতে ভাবতে লাগলেন, মেয়েটি একাজ করতে ভয় পাচ্ছে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, ওপর থেকে খানিকটা মাটি তাঁর মাথায় এসে পড়ল। তিনি ওপরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন, একটা লম্বা বাঁশ গর্তের ওদিকের গায়ে কে যেন ঠুকছে। খানিকক্ষণ ঠোকাঠুকির পর [illegible]টা সঁত করে গর্তের ভেতর চলে গেল। সিলিন খুব খুশী হলেন। তিনি বাঁশটিকে ধরে নীচে নামালেন। বাঁশটা সত্যি-ই খুব মজবুত ছিল। এমনি একটি বাঁশ তিনি মনিবের আটচালার মাথার ওপর দেখেছিলেন।

সিলিন ওপরের দিকে তাকালেন। ওপরেব আকাশের গায়ে তারাগুলো ঝকমক করছিল। আর ঠিক গর্তের ওপর দিকে দীনার চোখ দুটি যেন বিড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বল কবছিল। দীনা একেবারে গর্তের কিনারার কাছে তার মুখ নীচু করে ফিসফিস স্বরে বললে, আইভ্যান, ও আইভ্যান।

সিলিন যাতে খুব আস্তে কথা বলে তা ইঙ্গিতে জানাবার উদ্দেশে সে তার মুখের সামনে হাত দোলাতে লাগল।

সিলিন জিজ্ঞাসা করলেন, কি ?

—দুজন ছাড়া আর সকলে চলে গেছে।

তখন সিলিন বললেন, কসটিলিন, এসো, একবার শেষ চেষ্টা করা যাক। আমি তোমাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করব।

কিন্তু কসটিলিন তাঁর কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন, না, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমার দ্বারা এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়। আমি কেমন করে যাব? এদিক থেকে ওদিকে নড়বার শক্তিও আমার নেই।

—আচ্ছা, বেশ। তাহলে আমি চললুম, বিদায়। আমার সম্বন্ধে খারাপ কিছু যেন ভেব না, ভাই।

বিদায়ের মুহূর্তে তাঁরা পরস্পরকে চুমু খেলেন! সিলিন বাঁশটায় হাত রেখে দীনাকে তা কষে ধরতে বলে উঠতে শুরু করলেন। তিনি দু-একবার পিছলে পড়লেন, পায়ের বেড়ির জন্যে বাধা হতে লাগল। কসটিলিন তাঁকে সাহায্য করলেন। শেষে তিনি মাথার ওপর এসে হাজির হলেন। দীনা ওর ছোট ছোট হাত দিয়ে সিলিনের কামিজ ধরে হাসতে হাসতে তাঁকে সর্বশক্তি দিয়ে টেনে ধরেছিল।

সিলিন বাঁশটি তুলে নিয়ে বললেন, দীনা, এটা যেখানে ছিল, সেখানে আবার রেখে দিয়ে এস। নাহলে ওরা জানতে পেরে তোমায় মারধোর করবে।

দীনা বাঁশটি টানতে টানতে নিয়ে গেল। সিলিন পাহাড়ের নীচের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি খাড়াই-এর নীচে উপস্থিত হয়ে এক টুকরো ধারাল পাথর তুলে নিয়ে তাঁর বেড়ির তালা ভাঙবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তালাটা বেশ শক্ত ছিল। তা ভাঙতে পারলেন না। তারপর তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন পাহাড় থেকে নীচের দিকে লাফাতে লাফাতে দৌড়ে আসছে। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই দীনা আবার আসছে।

দীনা এসে উপস্থিত হল। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বললে, দেখি, আমি চেষ্টা করি। সে হাঁটু গেড়ে বসে তালাটা ভাঙবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর ছোট ছোট হাতদুটি ছিল পল্লবের মত কোমল; তাছাড়া, প্রয়োজনমত ওর শক্তিও ছিল না। সে পাথরটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে লাগল। তখন সিলিন তালাটা নিয়ে আবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীনা তার কাঁধে হাত রেখে পাশে বসে রইল।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সিলিনের চোখে পড়ল, পাহাড়ের পেছনে বাঁদিকে একটা লাল আলো। আকাশে চাঁদ ওঠবার আভাস দেখা দিয়েছিল। তিনি ভাবলেন, আঃ, চাঁদ উঠে পড়বার আগেই আমাকে এই উপত্যকা পার

হয়ে বনের ভেতরে ঢুকতে হবে। তাই তিনি উঠে পড়ে পাথরটা ফেলে দিলেন। দেরি থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁকে এগিয়ে যেতে হবেই।

তিনি বললেন, বিদায়, দীনা, বিদায়। আমি তোমাকে কখনও ভুলব না।

দীনা কয়েক টুকরো পনির এনেছিল। সেগুলো সিলিনকে দেবার উদ্দেশে তাঁকে ধরে হাত দিয়ে তাঁর হাত খুঁজছিল। তিনি দীনার কাছ থেকে সেগুলো নিলেন। তারপর ওর মাথায় একটা টোকা মেরে বললেন, সোনার খুকু, ধন্যবাদ। আমি চলে গেলে কে তোমাকে পুতুল গড়ে দেবে?

দীনা হাত দিয়ে ওর মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। তারপর ও ছাগলছানার মত দৌড়তে দৌড়তে পাহাড়ের ওপরে পালাল। ওর চুলে-বাঁধা টাকাগুলো পিঠের ওপর পড়ে বাজছিল।

সিলিন ভগবানের নাম স্মরণ করলেন। যাতে শব্দ না হয়, তার জন্যে তাঁর পায়ে-বাঁধা বেড়ির তালাটা হাতে তুলে নিলেন। তারপর রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলেন। বেড়ি-বাঁধা পাটা তাঁকে টানতে টানতে হাঁটতে হচ্ছিল। আকাশের কোন্‌খানে চাঁদ উঠছিল, সেদিকে তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন। এবারে তাঁর পথ জানা ছিল। যদি তিনি সোজা যান তাঁকে অন্ততঃ ছ মাইল হাঁটতে হবে। চাঁদ পুরোপুরি ওঠার আগেই যদি তিনি বনের ধারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন, তবেই রক্ষে! তিনি নদী পার হলেন। পাহাড়ের পেছনে আকাশের আলো ক্রমেই সাদা হয়ে উঠছিল, সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি উপত্যকার পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তখনো চাঁদ পুরোপুরি দেখা যায়নি।

আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উপত্যকার একদিকটা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। আর পাহাড়ের পাদদেশটায় ঘনছায়া গড়িয়ে পড়ছিল।

সিলিন ছায়ায় ছায়ায় গা ঢেকে হাঁটছিলেন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলছিলেন, কিন্তু চাঁদ আকাশে উঠে পড়ছিল আরো তাড়াতাড়ি। ইতিমধ্যে ডানদিকের পাহাড়গুলির মাথায়-মাথায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছিল। সিলিন বনের ধারে আসতেই পাহাড়ের পেছন থেকে আলোয় ঝকমকে চাঁদের উদয় হল। চারিদিক দিনের মত আলোয় ভরে গেল। গাছে-গাছে পাতাগুলি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের ওপরটা আলোয় উজ্জ্বল কিন্তু নিঝুম, নিস্তব্ধ। নদীর কলকল ধ্বনি ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না।

সিলিন বনে উপস্থিত হয়ে একটি ছায়াছন্ন জায়গায় বিশ্রাম নেবার উদ্দেশে বসে পড়লেন।

তিনি খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে এক টুকরো পনির খেলেন। তারপর একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর বেড়ির তালা ভাঙার জন্যে পুনরায় চেষ্টা করতে লাগলেন। পাথর দিয়ে ঘা মেরে মেরে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে গেল। তবু তালা ভাঙল না। তিনি উঠে আবার পথ চলতে শুরু করলেন। প্রায় আধ-মাইলের কিছু বেশী দূর যাবার পর তিনি ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, পা ব্যথায় টনটন করতে লাগল। তাই তিনি প্রতি দশ পা এগিয়ে গিয়ে থামতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন, কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ শক্তি থাকবে, একে টেনে টেনে এগিয়ে যেতে হবে। যদি একবার বসে পড়ি, তাহলে আর উঠতে পারব না। দুর্গে পৌঁছনো অবশ্য হবে না। ভোর হলে বনের ভেতর শুয়ে থাকব। সারাদিন সেখানেই কাটিয়ে রাতের বেলা আবার হাঁটতে আরম্ভ করব।

সিলিন সারারাত এগিয়ে চললেন। ইতিমধ্যে একসময় দুজন ঘোড়সওয়ার তাতারী পথ দিয়ে চলে গেল। তিনি অনেক দূর থেকে তাদের আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

চাঁদ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হতে শুরু করলে, কুয়াশা জমতে লাগল। ভোর হয়ে আসছে। সিলিন তখনও বনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি ভাবলেন, আরো ত্রিশ পা গিয়ে গাছের সারির মধ্যে ঢুকে বসে পড়ব।

কিন্তু আরো ত্রিশ পা যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন, বনের প্রান্তে এসে হাজির হয়েছেন। তারপর মনের জোরে শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। তখন ভোরের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সামনেই দেখা গেল সমতলভূমি আর দুর্গ। বাঁদিকে পাহাড়ের নীচে যেন একটা নিভে-যাওয়া আগুন থেকে ধোঁয়া এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই আগুনের চারপাশে যেন কতকগুলি মানুষ জমায়েত হয়ে বসেছিল।

তিনি আরো একাগ্র হয়ে তাকাতে লাগলেন, তাঁর চোখে পড়ল, তাদের বন্দুক চকচক করছে। আরে, ওরা যে সেনাদল,—কশাক সেনাদল!

চকিতে সিলিনের মন আনন্দে ভরে উঠল। তিনি প্রাণপণে নীচেয় যাবার জন্যে এগোতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, দোহাই ভগবান, কোনো তাতারী যেন এ সময় আমাকে দেখতে না পায়। এত কাছে এসেও তাহলে আর আমি পৌঁছতে পারব না। তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমি যে দয়াময়, তুমি যে করুণাময়।

কথা বলা শেষ করার আগেই তাঁর চোখে পড়ল, প্রায় দুশ গজ দূরে বাঁদিকের পাহাড়ে তিনজন তাতারী রয়েছে।

তাতারীরাও তাঁকে দেখতে পেলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। সিলিনের মন হতাশায় ভরে গেল। তিনি হাত দুটি তুলে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলেন, ভাই সব, ও ভাই সব, আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!

কশাকেরা তাঁর চিৎকার শুনতে পেল। ঘোড়সওয়ার একদল তখনই মাঝপথে তাতারীদের বাধা দেবার জন্যে ছুটল। কশাকেরা দূরে ছিল, তাতারীরা ছিল কাছে। কিন্তু সিলিন শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লেন না। বেড়ির শিকলগুলো হাতে তুলে নিয়ে তিনি কশাকদের দিকে দৌড়তে লাগলেন। কি যে করছেন, সে চেতনা তাঁর ছিল না। মুখে কেবলই চিৎকার করছিলেন, ভাইসব, ভাইসব, ও ভাইসব!

কশাকেরা সংখ্যায় ছিল প্রায় পনের। তাতারীরা ভয় পেয়ে গেছল, সিলিনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবার আগে থেমে পড়ল। সিলিন তখনও হতভম্বের মত পড়িমরি করে কশাকদের দিকে ছুটছিলেন।

কশাকেরা তাকে ঘিরে ফেলে জিজ্ঞাসা কবতে লাগল, কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন? কি করেন?

কিন্তু সিলিন সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বারবার বলতে লাগলেন, ভাইসব, ও ভাইসব।

তখন অন্যান্য সৈন্যেরা ছুটে তাঁব কাছে এসে ভিড় কবে দাঁড়াল। কেউ তাঁকে রুটি খেতে দিল, কেউ অন্য কিছু, কেউ বা ভডকা।

একজন তাঁর গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে দিলে।

আর-একজন তাঁর পায়েব বেড়ি ভেঙে ফেললে।

অফিসারেবা তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন, ঘোড়ায় চেপে তাঁকে নিয়ে দুর্গে ফিরে এলেন। সেখানকার সৈন্যরা তাঁকে ফিরে পেয়ে খুশী হল। পুবোতন বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে ভিড় করলেন। কি কি ঘটেছিল? বন্ধুদের কাছে সিলিন সব গল্প করলেন। শেষে বললেন, এইভাবে বাড়ি গিয়ে বিয়ে করে এসেছি, জানলে? না, না, এ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, অদৃষ্ট আমার বিয়ের বিরুদ্ধে।

তারপর তিনি ককেশাস অঞ্চলের সেনাবিভাগেই কাজ করতে লাগলেন। এদিকে একমাস পরে পাঁচ হাজার রুবল পণ দিয়ে কসটিলিন মুক্তি পেয়েছিলেন। যখন ওরা তাঁকে ফিরিয়ে আনলে, তখন তাঁর মুমূর্ষু অবস্থা।

॥ শেষ ॥

॥ অনুযোজন । এক ॥

॥ লেখকের অনুবেদন ॥

বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প যথার্থভাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করব—এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে বইখানি রচনার কাজ শুরু করি। কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন দেশের কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্পের অনুবাদ শেষ হলে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত একটি বিষয়ে মন আকৃষ্ট হল। দেখা গেল, এদের মধ্যে সাত আটটি কাহিনীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বেশ একটি মিল রয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু ঘনীভূত হয়েছে এক-একজন কিশোরীকে কেন্দ্র করে। প্লটগুলির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে কিশোরী হৃদয়ের বিচিত্র রূপের রঙিন আলপনা। "আপেল গাছটি", "ছোট্ট জলকুমারী", "ভাল্লুকশিকারীর মেয়ে" এবং "ককেশাসের বন্দী" এই চারটি গল্প ত প্রত্যক্ষভাবে কিশোরী-নারীর প্রথম প্রেমের কড়চা। কিশোরী চিত্তের আর-একটি ভিন্ন স্তরের রূপ হচ্ছে অমেয় ভক্তি এবং নিবিড় মমতা। এ কথা ত আমাদের অজানা নয় যে, যৌবনকাল থেকে শেষের দিন পর্যন্ত নারী-জীবন প্রবাহিত হয় প্রধান দুটি আবেগকে আশ্রয় করে—প্রেম ও বাৎসল্য। নারীর প্রকৃত রূপ হচ্ছে সে একদিকে প্রিয়া আর একদিকে মা। স্বভাবতঃ কৈশোরই এই দুটি আবেগের উন্মেষ-ঋতু।

"বারলিনের অবরোধ" গল্পটিকে রসে-বসে সার্থক করে তুলেছে বৃদ্ধ ঠাকুরদা-মশাই-এর প্রতি প্রাণোজ্জ্বল একজন কিশোরী কন্যার ভক্তিপূর্ণ মমতা। বৈষ্ণব সাহিত্যে মানবহৃদয়ের যে চরম আর্তিকে কৃষ্ণপ্রেম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই কষ্টিপাথরে বিচার করে এ ইঙ্গিত করা যেতে পারে যে, এই ঠাকুরদামশাই এর নাতনীর হৃদয়ের স্বভাবজাত সুনিবিড় আকর্ষণ হচ্ছে প্রেমেরই আর-এক স্তরের রূপান্তর। আর "মরুর দেশে মোহিনী মায়া" কাহিনীর নায়িকা কিশোরী-বাঘিনীর যে ছবি বালজাক এঁকেছেন, তা যে পুরোপুরি মানুষের প্রেমের সমগোত্রীয়—এ কথা ত প্লটের অগ্রগতির নানা সুযোগে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু 'সাকী'র লেখা "খোলা জানালা"র নায়িকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। এর মধ্যে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই। আছে কিশোরী হৃদয়ের সম্পূর্ণ অন্যজাতের আর-এক আত্মপ্রকাশ। যে পদ্মকুঁড়িটির মধ্যে সবেমাত্র

জীবনের পাপড়ি উন্মোচন আরম্ভ হয়েছে, নব-চেতনার বন্যায় উচ্ছল সেই সত্তার কৈশোর-লীলার এক অতি আকর্ষণীয় চটুলতার ছবি।

আলোচ্য গল্পগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারের ফলে বইখানির মূল উদ্দেশের বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তন ঘটল,—নতুন পরিকল্পনায় এর পরিধি সীমাবদ্ধ করা হল শুধু সাতটি কিশোরী উপকথা দিয়ে।

সাধারণতঃ, আমাদের ধারণা, মানুষের জীবনে যৌবনই শ্রেষ্ঠ কাল। পরমের অনুভূতিতে শ্রেষ্ঠ, লক্ষের অভিমুখে পথচলার আকুতিতেও শ্রেষ্ঠ। ভোগের বাসনায় শ্রেষ্ঠ, ত্যাগের প্রেরণায়ও শ্রেষ্ঠ। বিচিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, গভীরতায়ও শ্রেষ্ঠ। সম্ভাবনাময়তায় শ্রেষ্ঠ, উদ্যোগের উদ্যমেও শ্রেষ্ঠ।

এমনতর যৌবনের উন্মেষ লগ্নটি হচ্ছে কৈশোর। যেন দিনের উদয়ক্ষণ,—যেন চরম-আশ্চর্যের নতুন আলোর আভাসে প্রচ্ছন্ন ভোরবেলা। তাই বিশ্বের দেশে দেশে মানুষের চির-আদরের ধন বলে গণ্য হয়ে আসছে কৈশোর-কাল।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ডেনমারক, পোলাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের এক-একজন শ্রেষ্ঠ কথাকার হচ্ছেন গলস্‌ওয়ারদি, বালজাক, দদে, টলস্টয় এবং অ্যানডারসন। পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তার দিক থেকে য়ুনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা-প্রবাসী কথাকার, রোমানিয়া-জাত কনর‍্যাড বারকোভিচিও এঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই কৈশোরকে দেখেছেন দুর্লভ-বিস্ময়ে-উজ্জ্বল চোখের আলোয়। কৈশোরের রূপে এঁরা মুগ্ধ, এর গুণে বিভোর। দুদিক থেকেই পেয়েছেন সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দীপন। এঁদের রচিত গল্পের মধ্যে মনোরম ছবির পর ছবির বুকে ফুটে উঠেছে কৈশোর হৃদয়ের সাত-রঙা লীলাখেলা।

ইদানিংকালে বিদেশে আন্তর্জাতিক তুলনামূলক-সাহিত্য আলোচনা লোক-সমাজের মন আকৃষ্ট করেছে। তুলনামূলক-সাহিত্য পাঠক্রম এদেশেও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই ধরনের সাহিত্য বিচার ক্রমশঃ আরো ব্যাপক হলে তা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। হয়ত আবিষ্কৃত হবে সামগ্রিকভাবে বিশাল ও বিপুল বৈচিত্র্যভরা মানবসমাজের সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও বিরহ, আদর্শ ও আচার-আচরণ, ক্ষমা ও মাৎসর্য, স্নেহ ও নিষ্ঠুরতা, আনন্দ ও বিষাদ, আকুতি ও প্রেরণা প্রভৃতির অনুভব-রীতিতে এবং প্রকাশ-ভঙ্গীতে রয়েছে গভীর সাদৃশ্য অথবা একটা মৌলিক ঐক্যসূত্র। হয়ত এই বিশ্বাস দৃঢ় হবে যে, আদি-স্তরে মানবসত্তার সমষ্টিগত সত্যিকার রূপটি একই ছাঁচে গড়া। স্বামী-স্ত্রী, বাপ-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন, প্রেমিক-প্রেমিকা, শিক্ষক-

ছাত্র, শত্রু-মিত্র, মনিব-শ্রমিক—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এদের চরিত্রের গভীরতম কেন্দ্রে অন্ততঃ যত ভেদ আছে, তার চেয়ে বেশী আছে অভেদ।

আগেই বলেছি, আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে প্রথম প্রেমের চারটি কাহিনী পড়তে পড়তে আমার চোখ পড়ে এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি। প্রধান চরিত্র হিসাবে যে চারজন কিশোরীকে আমরা পাই, তারা এক দেশের মেয়ে নয়—ইংল্যাণ্ড, ডেনমারক, পোলাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মেয়ে। তাদের চরিত্র আঁকা হয়েছে বিভিন্ন জাতির মহাশিল্পীদের তুলির সাহায্যে। তবু চরম বিশ্লেষণে মনে হয়, তারা যেন সকলে মূলতঃ একই ধরনের সত্তার অধিকারিণী। অবশ্য, পরস্পরের মধ্যে বয়সের কিছু তারতম্য আছে, ভালবাসা প্রকাশের ভঙ্গীতে এবং আচরণে বেশ কিছু জাতিগত এবং শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে। তবু এদের চরিত্রে ফুটে উঠেছে ভালবাসার আদিতম যে রূপ, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা সন্দেহ।

বিশেষভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, এই কিশোরী কন্যাগুলির হৃদয়ে আছে একটা সাংসারিকতাহীন সরলতা। সে সরলতা কিন্তু বোধশূন্য অবুঝের সারল্য নয়। বাস্তবের প্রতি এদের চেতনা বেশ তীক্ষ্ণ অথচ এরা নিজেদের অজ্ঞাতে পরমের স্বপ্নে বিভোর। কৈশোরের আবির্ভাবে এদের জীবনের ভেতরে বাইরে ঘটল ঋতুবদল। এরা হয়ে পড়ল যেন "অকারণে চঞ্চল"। অবচেতন মনে এল স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের অনুভব। তেমনি এদের প্রথম প্রেম নিবেদনের মধ্যে নেই কোন প্রচ্ছন্ন কৃত্রিম ছলাকলার খেলা। দেখা যায়, পল্লীবাসিনী কিসান কন্যা মেগান, লণ্ডন শহরে প্রতিপালিতা স্টেলা আর জিপসী-কিশোরী সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতাহীন, স্থূল-পরিবেশে লালিতা মার্গারিটার চরিত্রে কৈশোর রহস্যের এক মৌলিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। প্রত্যেকেই নিঃশেষে নিজেকে দিতে চায় কিন্তু এদের নেবার আগ্রহে প্রখরতা নেই। এরা সকলেই ত্যাগে যত উন্মত, প্রাপ্তির জন্যে তত লালায়িত নয়। মেগানকে যখন অ্যাসহার্স্ট বললে, 'মেগান, আমি তোমাকে বিয়ে করব', মেগান তখন যা উত্তর দিয়েছিল তার মর্ম হচ্ছে, সে শুধু অ্যাসহার্স্টের কাছে থাকতে চায়, তার বেশি কিছু নয়। কাছে থাকতে না পেলে ও যে মারা যাবে! এই ওর সবচেয়ে বড় ভয়।

জলকুমারীর রূপকে মানবসমাজের একজন কিশোরীর ভালবাসাই প্রচ্ছন্নভাবে আঁকা হয়েছে। অ্যানডারসনের জলকুমারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর সমূলে ডাইনীকে উপহার দিয়ে ও লাভ করেছিল মানুষের দুটি পা—

যাতে ও রাজকুমারের সঙ্গলাভ করতে পারে। তারপর পায়ের দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করেও রাজকুমারের সঙ্গলাভে যেটুকু চরম স্তরের পরিতৃপ্তি পেয়েছিল, তাতে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল।

"ককেশাসের বন্দী" গল্পের নায়িকা তাতারী-কিশোরী দীনা ভালবাসার পাত্রকে কেবলই দিয়েছে। পরিস্থিতি, স্থান ও কালের কথা মনে রাখলে নিশ্চয়ই বলা যায় যে, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সেই দানগুলো ক্ষুদ্র এবং সামান্য ছিল না। দীনা প্রেমাস্পদের কাছ থেকে কখনো কিছু চায় নি, হয়ত কিছু পাবার জন্যে দুঃসহ কোনো প্রত্যাশাও ওর হয় নি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, এইসব কিশোরীদের মহিমা-ভরা-প্রেম কাহিনী পড়তে পড়তে আমার মনে জেগে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের চির-কিশোরী অভাগী রতনের কথা। বোধ হয়েছিল, অন্তরের অন্তস্তলে সে যে এদেরই সমগোত্রীয়। তার গভীর আকর্ষণে, তার পরম সারল্যে, অকুণ্ঠিত সেবার মধ্যে দিয়ে তার বেহিসেবী আত্মনিবেদনের আগ্রহে। মেগানের মত সেও তার কলকাতায় ফিরতি-মুখী মনিব পোস্টমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?" তার এই প্রশ্নের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল এই কামনা যে, সে তার দাদাবাবুর কাছে থাকতে চায় আর সেবা করতে চায়। মাত্র এইটুকুই তার চাওয়া, এই চাওয়ার মধ্যে বেশি কিছু দুরাশা ছিল না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের মত রবীন্দ্রনাথও কিশোরী হৃদয়ের রসঘন মহিমায় বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারেন নি, তাই বাংলাভাষী পাঠকদের আনন্দ বর্ধনের আশায় আমার স্বদেশী ভাষায় রচিত একটি গল্প এই বিদেশী ভাষায় রচিত ছোটগল্পের বইখানির পরিশিষ্টে যোগ না করে থাকতে পারলুম না,—যদিও জানি বইখানির মূল পরিকল্পনার সঙ্গে এরূপ যোজনা কোন ক্রমেই প্রাসঙ্গিক হতে পারে না।

আরো একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা এখানে নিবেদন করি। আগেই বলেছি, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণা মানুষের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য-সন্ধানে খুব দরকার। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতেরও এ বিষয়ে আরো বেশী উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের নিজস্ব ক্ষেত্রে এই জাতীয় আর-একটি উদ্যোগের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে—এ কথা স্মরণ করার দিন এসেছে।

ভারতবর্ষীয় বিচিত্র জাতির নানাভাষায় রচনা-করা সাহিত্যসম্পদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণার কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত। এই

পাঠক্রম আমাদের প্রতি স্টেটের বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য গবেষণার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলে একদিন হয়ত আমরা জানতে পারব অপূর্ব বিস্ময়কর সব তথ্য। বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে যাদের বাস, সেই অসংখ্য খণ্ডজাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে আর্য, অনার্য, শক, হুনদল, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা সংস্কৃতি ও সমাজ পদ্ধতির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে পলিমাটির বিচিত্র স্তর। সুদূরকাল থেকে সেই প্রভাব ধীরে ধীরে রচনা করে এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান রূপাবলী। তাদের মধ্যে বিপুল সাদৃশ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। দূর-ভবিষ্যতে একদিন হয়ত কোন মহাপ্রতিভাধর সাহিত্য-বিচারকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে এক চরম বিস্ময়কর সংহতিমূলক ঐক্য। সত্যের আলোকে সার্থক হবে অতুলপ্রসাদের বাণীর ঝঙ্কার, "বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"।

আমার মত সাধারণ একজন সাহিত্যিকের ক্ষীণ কণ্ঠের আবেদন ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ বা যুনিভারসিটি গ্রাণ্ট কমিশন অথবা সাহিত্য একাদেমীর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছবে কি না, সন্দেহ। তবে এটি সর্বভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সমস্যা। বাংলাভাষায় লেখা আমার প্রস্তাবটি ভারতীয় রাজ্যগুলির অধিবাসী সুধীসমাজের চোখে পড়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই। নানাভাষী আমাদের সহৃদয় সাংবাদিকেরা যদি তাঁদের কাছে এই প্রস্তাবটি আলোচনাসহ পেশ করার চেষ্টা করেন, তাহলে আশানুরূপ ফললাভ ... হয়ত অসম্ভব হবে না। সর্বভারতীয় সাংবাদিক দরবারের উদ্দেশে রইল আমার বিনীত আবেদন।

আমার শেষ নিবেদন হচ্ছে, আমার অনুবাদ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এ বিষয়ে প্রথম বক্তব্য এই যে, আলোচ্য গল্পগুলিতে যতদূর সাধ্য প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। এক-একটি পুরো বাক্যকে বা প্যারাগ্রাফকে প্রকাশের ইউনিট হিসাবে ধরে ভাব-অনুবাদ করিনি।

আমার ধারণা, আমার নির্বাচিত লেখকেরা সকলেই অতি উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। তাঁদের রচনার মধ্যে প্রায় প্রতিটি শব্দ প্রয়োজনীয়। শুনতে পাই, ফরাসী ছোট-গল্প শিল্পী গী দ মোপাসাঁর লেখা ত এতই ঠাস-বুনানিতে বদ্ধ যে, এদের কোন একটি শব্দ ছাড়লে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে প্লট উন্মোচনের গ্রন্থিতে টান পড়েছে। এ কথা মানি, শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে সব বড় লেখকদের সচেতনতা মোপাসাঁর মত তত তীক্ষ্ণ নয়। তবে তাঁদের সকলের লেখায় শব্দই যে ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন অনুবাদকদের এ কথা মনে রাখা একান্ত কর্তব্য।

অন্য দেশের সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থকে বাংলাভাষায় সঠিকভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে কোনো কোনো সময়ে গুরু সমস্যাব সম্মুখীন হতে হয়েছে। সাধারণতঃ, শব্দের অর্থ দুরকম হতে পারে। প্রথমতঃ, তার আভিধানিক অর্থ। দ্বিতীয়তঃ, তার তাৎপর্যগত অর্থ। প্রথমটি কতকটা মেকানিক্যাল, নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ। লেখকেরা আপন ইচ্ছা-অনুযায়ী এই অর্থের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত অথবা মহত্তর করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের মনের মাধুরীর স্পর্শে রসাত্মক ব্যবহারের দ্বারা শব্দের তাৎপর্যকে আভিধানিক সীমার বাইরে টেনে নিয়ে যাবার অধিকার তাঁদের আছে। তাঁরা পুরাতনের মধ্যে সাময়িকভাবে নূতনকে সৃষ্টি করে তুলতে পারেন। আমি কোন শব্দ অনুবাদ করতে গিয়ে এর প্রকৃত অর্থ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করেছি। আদি লেখক তাঁর রচনার মধ্যে যে শব্দটি নির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাকে সেইভাবে ভাষান্তর করেছি। আবার যে শব্দটি তিনি তাৎপর্যগতভাবে ব্যবহার করেছেন, তার রূপান্তর ঘটিয়েছি তাৎপর্যের সংকেত অনুসরণ করে। অবশ্য, যতদূর সাধ্য অভিধানকে উপেক্ষা না করেই এ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আমার আদর্শ ছিল, অভিধানের অনুশাসন এবং আদি লেখকের রসানুভূতি—এই দুয়ের মধ্যে একটা যথাযোগ্য সমন্বয় সাধন করা। আদি লেখকের নির্দিষ্ট পথে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে পদক্ষেপ করেই এগিয়ে গেছি আমার অনুবাদ কাজে।

মনে হয়, এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় আলোচনা করার যোগ্য। ছোটগল্প বা কথাসাহিত্যের ভাষা আর প্রবন্ধের ভাষা এক নয়। প্রবন্ধ রচনায় ব্যবহৃত শব্দ প্রধানতঃ যুক্তিবাহী, ছোটগল্পের শব্দ প্রধানতঃ রসাত্মক বা আবেগবাহী। বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ ক্ষেত্রে আমার পূর্বাচার্যেরা কেউ কেউ এই কথাটি মনে রাখেন নি। তাই তাঁদের অনুবাদে ব্যবহৃত শব্দসম্ভার সাধারণতঃ সঠিক হয়েছে, সুস্পষ্ট হয়েছে কিন্তু অনেকক্ষেত্রে হয় নি রসের মাধুর্যে সমৃদ্ধ। বহু পুরাতন একটি উদাহরণের কথা উল্লেখ করা যায়। গল্প আছে, সামনে একটি মরাগাছ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই শুকনো গাছের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুজন কবিকে কবিতা রচনা করতে অনুরোধ করা হল। প্রথম কবি বললেন, 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে'। অপর কবি বললেন, 'নীরস তরুবর পুরতঃ ভাতি'। প্রথম কবির রচনায় সব কথাই ঠিক-ঠিক বর্ণনা করা হয়েছে,—তবে রসহীন, সঠিক অর্থপূর্ণ যুক্তির ভাষায়। দ্বিতীয় কবির সৃষ্টি সঠিক অথচ রসপূর্ণ এবং আবেগের সূক্ষ্ম সংস্পর্শে সুমধুর। তাই সবিনয়ে নিবেদন করি, ছোটগল্প ভাষান্তর করতে

গিয়ে শুধু সঠিকতাকেই অনুবাদকের একমাত্র লক্ষ করলে চলবে না—তাঁদের সৃষ্টি নির্বাচিত শব্দের গুণে যেন মধুর হয়ে ওঠে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে গোড়া থেকেই স্বাভাবিকভাবে প্রবন্ধের শব্দাবলী ও বক্তব্য-উপস্থাপনারীতি কথাশিল্পের থেকে পৃথক হয়ে আসছে। বঙ্কিমের প্রবন্ধ ও উপন্যাসের শব্দসম্ভার এক নয়। কথাশিল্পী বঙ্কিম ঘোর রোমান্টিক, প্রাবন্ধিক বঙ্কিম ঘোর ক্লাসিক্যাল। তাঁর প্রবন্ধে আছে ভাষার স্বল্পতা, অর্থের সুস্পষ্টতা এবং যুক্তির খরতা ও সুসংবদ্ধতা। আর-একদিকে তাঁর উপন্যাসে দেখা যায়, লেখার স্টাইল হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক-জাতের। খাঁটি সোনার রং আর গিনি সোনার রং এক নয়—তবু দুইই এক ধাতু।

অবশ্য উপন্যাসের ভাষায় প্রবন্ধ লেখা যায় না—একথা পুরোপুরি সত্য নয়। শরৎচন্দ্রের লেখা প্রবন্ধ পড়তে পড়তে বোঝা যায়, সে ভাষা ত একেবারেই তাঁর উপন্যাসের ভাষা। যুক্তিকে তিনি প্রধানতঃ আবেগবাহী শব্দসম্ভারের সাহায্যে রূপ দিতেন। শুধু প্রবন্ধ লেখায় নয়, কোনো বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে কথা-বার্তাতেও। এ ছিল তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে মোটামুটি দুটি পৃথক শ্রেণীর শিল্পী-সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি যুক্তি-প্রধান, আর একটি আবেগ-প্রধান। শরৎচন্দ্রের ছিল "that order of minds to whom the analysing, logical, discoursing intellect tells little or nothing; sense, passion and imagination are the avenues by which such minds attain to truth." মনে পড়ছে, অনেক বছর আগে পরম শ্রদ্ধেয় এই কথাশিল্পীর শিল্পীমানসের পরিচিতি আলোচনা করতে গিয়ে উদ্ধৃতিটির সাহায্য গ্রহণ করেছিলুম।

এবার ফিরে যাই "সপ্ত কিশোরী" প্রসঙ্গে। আলোচ্য ছোট গল্পগুলি পড়ে মনে হয়েছে, প্রত্যেকটি গল্পের সৃষ্টিকর্তার অন্তরে প্রথমে জেগেছিল সাধারণভাবে কোনো অভিজ্ঞতার আঘাত-জাত এক টুকরো আবেগ। মননের সহায়তায় তা ক্রমশঃ একটি থিমকে আশ্রয় করে সৃজনমুখী গতিলাভ করে। শেষে গড়ে ওঠে প্লটের পরিকল্পনা—হয় আংশিকভাবে না হয় পুরোপুরি। এই ঘটনাধারার কোন একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—এরা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত হয়ে শেষে পরিণতি লাভ করেছে এক সামগ্রিকতায়। প্রত্যেকটি গল্পের অনুবাদ শুরু করার আগে আমি মননের দ্বারা এই সামগ্রিক রূপটিকে অনুভবে ধরবার চেষ্টা করেছি। এর ফলে, অন্ততঃ আংশিকভাবে মিলেছে সেই আদি প্রেরণার প্রথম

মুহূর্তের দুর্লভ স্পর্শ, যা মূল রচনা শুরু করার আগে আদি লেখকের শিল্পী-সত্তাকে উদ্ভাসিত করেছিল। মনে হয়, পুরাতন অনুভূতিকে অনুবাদকের মনে নতুন করে লাভ করতে না পারলে ভাষান্তরিত রচনায় জাগে না মর্মস্পর্শী সজীবতা। অনুবাদ নিছক অনুসরণ নয়—অনুরচন। এর মূলে থাকা চাই সৃজনশীলতা। এ শুধু ভাষান্তরিত ফটোস্ট্যাট কপি মাত্র নয়। বলা যায়, অনুবাদ হচ্ছে একরকম পুরাতনের পুনর্রূপায়ণ। তাই আমার বইখানির পরিচয়ে একে অনুবাদ গ্রন্থ না বলে বলেছি ভাষান্তরিত অনুরচন।

সন্দেহ নেই, যে কয়জন মহাশিল্পীর সেরা রচনা বইখানিতে সংকলিত হয়েছে, তাঁরা সাহিত্যরসিক বিশ্বমানুষের অন্তরের তৃষ্ণাকে পরম পরিতৃপ্তিতে ভরিয়ে দেবার উদ্দেশেই এই সৃষ্টি কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আজ ভক্তি-ভরে তাঁদের স্মরণ করে বারবার প্রণাম জানাই। আর, যে কয়জন শক্তিশালী অনুবাদক ইংরেজী ভাষায় বিদেশী সাহিত্যের গল্পগুলিকে ভাষান্তরিত করে সার্থক হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

বিশ্বভারতী এবং অন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করা সময়াভাবে সম্ভব হয় নি, সেই ত্রুটির জন্যে সকলের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

॥ স্বাঃ কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় ॥

॥ অনুযোজন । দুই ॥

॥ পোস্টমাস্টার ॥

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর লেখা ॥

[সন্দেহ নেই, লেখকের মনে প্রথম যখন এই ছোটগল্পের প্লট অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, তখন এর একমাত্র প্রধান চরিত্র ছিল পোস্টমাস্টার। থিম ছিল শহরবাসী তরুণের চিত্ততলে পল্লীপ্রবাসজনিত, দুঃসহ নিঃসঙ্গতার বেদনা। আর শহরে ফিরে যাবার জন্যে তীব্র ব্যাকুলতা।

শেষ পর্যন্ত প্লট ও তার পরিণতি মূলতঃ পোস্টমাস্টারকেই কেন্দ্র করে অটুট সাফল্যে রসঘন হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মহাপ্রতিভাধর লেখক ছিলেন যে "বিচিত্রের দূত"। সারা-জীবন তিনি বৈচিত্র্যের সাধনা করে গেছেন। শিল্পী হিসাবে তার দৃষ্টিপাতও হত প্রায়ই কোন বিষয়বস্তুর ওপর একই সঙ্গে বিচিত্র দিক থেকে। আমরা বুঝতে পারি, পোস্টমাস্টারের চরিত্রকে বাস্তববৎ পরিবেশে রঙেরসে পরিপূর্ণ করে তোলার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল রতন। সেই রতনকে যদি প্লটের স্বাভাবিক উন্মোচনের সহায়িকা হিসাবে শুধু একটি সাধারণ পার্শ্ব-চরিত্র রূপে আবছায়া রঙে ও রেখায় আঁকা হত, তাহলে কাহিনীর সামগ্রিক দিক থেকে শিল্পরসের কোনও ক্ষতি হত না। কিন্তু বাস্তবের প্রতি তীক্ষ্ণতম সচেতনতায় ভরা ছিল যে মিস্টিক মহাশিল্পীর মন, তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি অভাগী রতনকে। তার মুখ দিয়ে সামান্য কয়েকটি অপরূপ কথোপকথন বাস্তব ভঙ্গীতে স্বাভাবিক ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। ফলে, ঘটেছে যত অপ্রত্যাশিত অঘটন। শিল্পীর তুলির জাদুস্পর্শে কথাগুলোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় শুধু শব্দার্থ নয়—সেই নিজেকে হারিয়ে-ফেলা কিসান-কন্যার উদ্ভাসিত মনের সুনিবিড় প্রতিচ্ছবি। সেখানে সামান্যের বুকে গোপনে জেগেছিল 'অসামান্য'।

কিশোরী রতন জানত না তার অবচেতন মনের গোপন রহস্যের কথা। পোস্টমাস্টারও প্রথম দিকে এ বিষয়ে আদৌ সচেতন ছিলেন না। শুধু একজনের কাছে কিছুই অজানা ছিল না—তিনি হচ্ছেন স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ। তবু তিনি এ-ব্যাপারে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি। করলে, নির্দিষ্ট থিম হত দ্বিধাবিভক্ত, ছোটগল্পের টেকনিকের দিক থেকে কাহিনীটি হত পুরোপুরি ত্রুটিপূর্ণ।

আগেই বলেছি, অভাবী কিসান ঘরের মেয়ে রতন। বাপ-মা-মরা, অনাথিনী। "আপেল গাছটি"র মেগানও গরিব কিসান ঘরের মেয়ে। আর-একদিকে পোস্টমাস্টার খাস কলকাতার ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ছেলে। অ্যাসহারস্টও লণ্ডন-নিবাসী, উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সন্তান।

শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান উচ্চশ্রেণীর পাত্রের সঙ্গে অশিক্ষিতা, সাধারণ-শ্রেণীর পাত্রীর মিলনমূলক সমস্যা আধুনিক জগতের একটি অতি-জটিল সামাজিক প্রশ্ন। "আপেল গাছটি"-র কাহিনীতে গলস্ওয়ারদি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিস্তৃত চালচিত্রে প্লটকে নানা রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সে চেষ্টা করেন নি।

মনে হয়, এর কারণ একাধিক। গলস্ওয়ারদির সমকালীন ইংরেজী-ভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে এই সামাজিক অসম আকর্ষণের আলোচনা মোটেই নিষিদ্ধ ছিল না। যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ "পোস্টমাস্টার" রচনা করেন, তখন আমাদের সমাজে এরূপ আলোচনা পুরোপুরি অসহ্য ছিল —এ কথা বললে কি অত্যুক্তি করা হবে? তাছাড়া, হিন্দুর জীবনে এ প্রশ্নের বিচার ত ছিল অপরদেশের চেয়ে জটিলতর। আমাদের মধ্যে আছে যে আবার জাত-বেজাতের জটপাকানো সংস্কার।

আরো একটি কথা। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টি ছিল মূলতঃ মানবিকতার লীলারস সন্ধানী। গলস্ওয়ারদি ছিলেন সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি অতি-সচেতন শিল্পী। এই সব সমস্যা তাঁর লেখা বহু নাটক ও ছোটগল্পের বিখ্যাত থিম সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি "আপেল গাছটি" গল্পে যে কথা একটি দুরূহ সামাজিক সমস্যারূপে গণ্য করে রসাত্মক ছবির পর ছবি এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে সেই বিষয়ের দিকে শুধু ইঙ্গিতে বিশ্ব-মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করেছেন।]

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে

হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক যোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষতঃ, কলিকাতার ছেলে ভাল করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না।

অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো কখনো দুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড় সুখে কাটিয়া যায়।

কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোন দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন, রতন।

রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, কি গা বাবু, কেন ডাকছ?

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস?

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের— ।

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে ত।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে? সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প-অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মত অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটভাই ছিল—বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল। অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশী উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশী রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত। তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোটভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত, তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয়, অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিঃশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ

সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল। পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি! ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোট পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, রতন। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল,—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দাদাবাবু, ডাকছ?

পোস্টমাস্টার বলিলেন, তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।

বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নেই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ, নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু অন্যদিনের মত যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন। বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল, 'রতন'।

তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?

পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না, দেখ্ ত আমার কপালে হাত দিয়ে।

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘন বর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে

পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন—এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভাল বোধ হচ্ছে কি?

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?

পোস্টমাস্টার বলিলেন, রতন, কালই আমি যাচ্ছি।

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু? পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে? পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে, তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন।

অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মত তেমন চটপট হইল না।

বোধ করি, মধ্যে-মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, সে কি করে হবে?

ব্যাপারটা যে কি কি কারণে অসম্ভব, তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্ট-মাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কি করে হবে?'

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে, কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কি কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয়, এইজন্য রতন অত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল।

প্রভু কহিলেন, রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন, তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না। এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে! রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, না না, তোমায় কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক হলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চাজ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, রতন, তোকে আমি কখনও কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না—।

এই বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।***

*** ॥ লেখকের টীকা ॥

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে তাঁর সাহিত্যকর্মে সাহায্য করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। "গল্পগুচ্ছ"-এর গল্পগুলি বেশির ভাগ তাঁর জীবনের প্রথম ও মধ্যভাগে রচিত। স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে সেকালে প্রচলিত সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। শেষ বয়সে তাঁর ধারণা হয়েছিল, ভবিষ্যতের বাংলা গদ্যে সাধুভাষার ক্রিয়াপদ একেবারে পরিত্যাজ্য হবে। তাই তিনি গল্পগুলিকে যথাসম্ভব সংস্কার করতে অথবা কিছু-কিছু নতুন করে লেখার জন্যে মনস্থ করেছিলেন। অবশ্য, নানা ব্যস্ততার মধ্যে শেষ পর্যন্ত এ কাজে হাত দিতে পারেন নি। তবে মাঝে-মাঝে সুযোগ ঘটলে কোনো কোনো গল্পের ভাষা বা প্লটের কিছু কিছু পরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাকে জানাতেন। মনে আছে, "পোস্টমাস্টার" ছোটগল্পটির শেষ দুই প্যারাগ্রাফ পুরোপুরি বর্জন করাই ছিল তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত। বলেছিলেন, ছোট-গল্পের টেকনিকের দিক থেকে প্লটের পরিণতি ঘটেছে পোস্টমাস্টারের কলকাতা যাত্রাতেই। তার পর আর যা কিছু লেখা হয়েছে, তার সবটুকুই সাহিত্যশিল্প হিসাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অতএব পরিত্যাজ্য।

আমি তাঁর ইচ্ছার কথা স্মরণ করে উপরে-ছাপা লেখনের মধ্যে মূল পাঠের শেষ দুটি প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়েছি।

Title of the book : Videshi Katha-Sahitye—Sapta Kishori.

Author : Kanonbehary Mukhopadhyay.